

37

6/8-8

2/16

25
—
101
5
—
05
101

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM.

Bhadaini, Varanasi-I

No. 2/16.....

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

9.26

12.5.78

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

চতুর্থ ভাগ

শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবী

প্রকাশক :—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

৪১৭, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ হইতে

ব্রহ্মচারী কুম্ভকুমার কঙ্কর প্রকাশিত ।

মুদ্রাকর—

শ্রীগোপাল চন্দ্র আঢ়া

ফ্যালকন্ প্রেস

২, চাচ্চ'লেন, কলিকাতা

প্রাতিষ্ঠান :

- ১। ব্রহ্মচারী কুসুমকুমার,
আনন্দময়ী আশ্রম, ২১৩৪ ভদৈনৌ, বেনারস।
- ২। শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য আনন্দময়ী মন্দির,
৪১৪, একডালিয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
- ৩। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সেন
কুইন্সওয়ে, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, নিউ দিল্লী।
- ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য
'রুবীলজ', রিসলদারবাগ, লক্ষ্ণৌ।
- ৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
"দেবালয়", ২৮ ডি, এ, ডি কলেজ রোড, দেৱাহুন।

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫২

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩৫৫

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য তিন টাকা মাত্র

নিবেদন

শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ আশীর্বাদে চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগ হইতে তৃতীয়-ভাগ পর্যন্ত পৃষ্ঠাঙ্কের ও অধ্যায়ের সংখ্যা একই ধারাবাহিক ক্রমে দেওয়া হইয়াছিল। চতুর্থ ভাগে পৃষ্ঠাঙ্কের ও অধ্যায়ের সংখ্যা এক হইতে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ১৩৪৫এর বৈশাখ হইতে ১৩৪৬এর চৈত্রমাস পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল—মোট ৬৫ অধ্যায় ও ৮৯৭ পৃষ্ঠা ও চতুর্থ ভাগে ১৯ অধ্যায় ও ৩২৬ পৃষ্ঠা, সর্বসমেত ৮৪ অধ্যায় ও ১২২৩ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইল। কাগজের অপ্রাপ্যতা হেতু এই ৬ বৎসর প্রকাশের কোন কার্য করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীশ্রীমার ইচ্ছা হইলে আরও অনেক কথা প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২।

}

নিবেদিকা—
শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

চতুর্থভাগের প্রথম মুদ্রণ বহুদিন হয় নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও কাগজের
দুস্ত্রাপ্যতা হেতু এতদিন উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ছাপা,
প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই যথাসাধ্য সুন্দর করিবার প্রয়াস করিয়াছি ও
আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগিবে। কাগজও
মুদ্রণের দুর্মূল্যের কারণ পুস্তকের মূল্য-বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ঝুলন-পূর্ণিমা,
ভাদ্র—১৩৫৫,
আনন্দময়ী আশ্রম,
বেনারস।

নিবেদক—
প্রকাশক।

চতুর্থ ভাগ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সাতাকুণ্ডে আগমন	...
	১

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরৈকোড়া আগমন	...	২৭
পরৈকোড়ায় ভ্রমণ ও কীর্তন	...	২৯
অষ্টগ্রামে কীর্তনে মার প্রথম ভাবাবেশ	...	৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

মা ও জ্যোতির্বিদ	...	৪০
জটু কৃত আরতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা	...	৪২

চতুর্থ অধ্যায়

পটিয়ায় মুসলমান মুসেফের সহিত কথাবার্তা	...	৪৪
---	-----	----

পঞ্চম অধ্যায়

কল্লবাজারে আগমন	...	৫১
কল্লবাজারে ভক্ত-সঙ্গে সমুদ্র-স্নান	...	৬৯

১/১০/১৬ ২/১৬

১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রামকুট গমন	৭৭
রামকুটের পথের বিশেষ ঘটনা	৮০
নিশীথ বাক্তিতে নাম কীর্তন	৮১
কল্পবাজারে প্রত্যাবর্তন, পথের দৃশ্য	৮৩
সমাদির প্রকার ভেদ ও শরীরের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া...	৮৪
জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রকূলে কীর্তন	৯০
জমাট কীর্তনে, আনন্দের ছড়াছড়ি	৯৩
রামকুট দলের কীর্তন	৯৫
শিষ্যদের নিয়ে সচ্চিদানন্দ খেলা	৯৮

সপ্তম অধ্যায়

রাসু আগমন ও তথায় পঞ্চবটী স্থাপন	১১৮
----------------------------------	-----

অষ্টম অধ্যায়

কল্পবাজার ত্যাগ	১২৫
চট্টগ্রাম আগমন	১২৭
পরৈকোড়ার গমন	১২৮
পরৈকোড়া ত্যাগ	১২৯
নির্মলা মাকে নিয়া কীর্তন	১৩০
মাকে বিদায় দিবার করুণ দৃশ্য	১৩৫
কলিকাতা যাওয়ার পথে চাঁদপুর আগমন	১৩৭
চাঁদপুর হইতে কলিকাতা যাত্রা	১৪০

১/০

নবম অধ্যায়

রাত্রিতে কলিকাতায় আগমন	...	১৪২
৮কাশী আগমন ; অহোরাত্র কীর্তন	...	১৪৫
দিল্লীর পথে এলাহাবাদে ভক্তদের মাকে দর্শন	...	১৪৮

দশম অধ্যায়

দিল্লী আগমন	...	১৫০
দোল পূর্বিমার উৎসব	...	১৫২

একাদশ অধ্যায়

বেরিলী যাত্রা	...	১৭৩
বেরিলী ধর্মশালায় কীর্তন	...	১৭২
মায় নিকট কীর্তন	...	১৮৫
ভক্তসহ নৌকা-ভ্রমণ	...	১২১
নৈনিতাল যাত্রা	...	১২৪

দ্বাদশ অধ্যায়

নৈনিতাল আগমন	...	১২৭
--------------	-----	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নৈনিতালে থাকিয়া কৃষ্ণনগরের ভক্তদের নিবেদন অনুভব	...	২০৫
ভাবের নানা স্তরের অবস্থার বিবরণ	...	২১২
নয়না-দেবীর মন্দিরের সম্মুখে পণ্ডিতদের যজ্ঞ	...	২১৬

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নৈনিতাল হইতে আলমোড়া গমন	... ২২৩
জড়-সমাধি	... ২২৬
আত্মজ্ঞানী	... ২৩১
মা—সর্ব অবস্থায়ই সমাধিতে আছেন	... ২৩৮
কালীমঠে গমন ও প্রত্যাবর্তন	... ২৪০
কৈলাস যাওয়ার অঙ্গীকার	... ২৪৪
নৈনিতাল যাত্রা	... ২৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

বেরিলী গমন	... ২৫২
তথায় মার লীলার বিবরণ	... ২৫৪

ষোড়শ অধ্যায়

জামসেদপুর যাত্রাপথে লক্ষ্মী ও কাশী	... ২৬০
হাওড়া ষ্টেশন হইয়া জামসেদপুর আগমন	... ২৬২
জামসেদপুর হইতে কলিকাতায় আগমন	... ২৬৬

সপ্তদশ অধ্যায়

কলিকাতার জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন ও লীলার বিবরণ	... ২৬৮
---	---------

১।/০

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কলিকাতা হইতে বাইশারী ও বরিশাল যাত্রা	২৮২
বরিশালে আগমন	২৯২
চাঁদপুর আসিয়া কসবা হইয়া খেওড়া যাত্রা	২৯৪

উনবিংশ অধ্যায়

জন্মস্থান খেওড়ায় আগমন ও বাল্য-জীবনের স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতি	২৯৫
খেওড়া হইতে চাঁদপুর হইয়া ঢাকা যাত্রা	৩১১
ঢাকা আগমন	৩০৩
উৎসবে কীর্তন ও আনন্দ	৩০৫
ঢাকা হইতে কলিকাতা যাত্রা	৩১৭
কৈলাস যাত্রার পথে কলিকাতা আগমন	৩২০

—: (*):—



श्रीश्रीमा आनन्दमयी ।



2/16
1/10E

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ।

চতুর্থ ভাগ ।

প্রথম অধ্যায় ।

—ooo—

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ ।

আজ মাকে প্রাতে শশীবাবু নিয়া গিয়া ফটো তুলিলেন । পরে মাকে কালীবাড়ী নিয়া যাওয়া হইল । কাল জ্যোতিষদাদা ট্রেন ফেল করায় আজ আসিয়া পৌঁছাইলেন না অথচ প্রথম হইতে কথা ছিল জ্যোতিষদাদা আজ আসিলেই আমরা আজই আদিনাথ রওনা হইব । মা আজই চলিয়া যাইতে চাইলেন ।

ভোলানাথ ও ভক্তেরা বাধা দেওয়ায় মা সীতাকুণ্ডে আগমন । বলিলেন, “আমার যখন আজ যাওয়ার খেয়াল হইয়াছে এখন আজ সীতাকুণ্ডে চল” ।

সেই অনুসারে আজ ১১টার গাড়ীতে আমরা সীতাকুণ্ডে আসিয়াছি । শশীবাবু সঙ্গে আসিয়া মাকে শঙ্কর মঠে উঠাইয়াছেন । শঙ্কর মঠে যে সন্ন্যাসী আছেন, তিনি মাকে দেখিয়াই খুব যত্ন করিয়া গ্রহণ করিলেন । পাহাড়ের উপরে সুন্দর

একখানা ঘরে আমাদের জায়গা দিলেন। নীরব নির্ভ্রন অত্যন্ত সুন্দর স্থান।

৯ই মাঘ, শুক্রবার।

আজ প্রাতে মা পাহাড়ে বেড়াইয়া আসিলেন। পরে ঘরে আসিয়া বসিলে কথা হইতেছিল। আমি বলিলাম, “মা, তুমি সেদিন বলিয়াছিলে সেই এক বই পড়িলে আর কিছুই অজানা থাকে না।” মা বলিলেন, “ঠিকইত, সেই এক বই পড়িলে আর কোন ভাবা কেন, কোন বিষয়ই অজানা থাকে না; ধরোনা যেমন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সর্ব্বাংশে উপমা হয় না, বুঝে নিবে।” আজ চট্টগ্রাম হইতে অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। জ্যোতিষদাদাও আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আসিয়াই শুনিলেন তাহার একমাত্র মেয়েটি মারা গিয়াছে। কিন্তু মার কুপায় তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেন কিছুই হয় নাই, বাহিরে এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। মার আজ খাওয়ার দিন, মঠের স্বামিণীও আজ মার খাওয়ার জন্য রুটি তরকারী পাঠাইয়াছেন। একটি আশ্চর্যের বিষয় এতদিন বিশেষ লক্ষ্যও করি নাই, কিন্তু আজই বিশেষভাবে মা এইদিকে লক্ষ্য করাইয়া দিলেন। কথাটী এই—মায়ের গায়ের জামা যতই তৈয়ারী করি, কখনও দেখি জামাগুলি বেশ গায়ে লাগিল, আবার দু-একদিনের মধ্যেই জামাগুলি গায়ে লাগে না। ছোট হইয়া গেল, মা হাসিয়া বলেন, “আমি মোটা হইয়াছি।” লেংটীও তাই। এখন এই ঘটনা এত ঘন ঘন হইতে লাগিল,

যে আমি বলিলাম, “মা একি হয় ? ২১ দিনেই তুমি মোটা হইয়া যাও ; জামা গায় লাগে না। আবার, দু-একদিন পরে সেই জামাই বেশ গায় লাগে। এত শীঘ্র শীঘ্র শরীরের এত পরি-বর্তন কি সম্ভব ?” তখন মা হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা তোমরাই ত পরাইতেছ ; দেখিতেছ, একবার গায়ে লাগিতেছে, আবার ছোট হইয়া যাইতেছে ; কোন জামা, কোন লেংটিই সব সময় ঠিক লাগিতেছে না, এর কারণ কি ?” মার এই কথায় ও হাসিটুকুতে যেন আমার এ’দিকটায় খেয়াল পড়িল। তাই ত এ’ কি করিয়া হয় ? অথচ এই ঘটনা পুনঃ পুনঃ হওয়া সত্ত্বেও খেয়াল করি নাই।

ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রম হইতে একটি ব্রহ্মচারী আসিয়া মাকে তাহাদের আশ্রমে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আজ বৈকালেও অনেকে আসিয়াছেন। মা

নানা কথা বলিতেছেন। কথায় কথায়

গুরুতে শ্রদ্ধা।

ধৈর্য, সাধনার অঙ্গ।

বলিতেছেন “যে বাস্তবিক গুরুকে শ্রদ্ধা করে

সে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারে না ; যদি কাহাকেও ঘৃণা করা হয়, তবে গুরুকেই ঘৃণা করা হইল। কারণ গুরু যে মহান, তিনি যে সকলের মধ্যেই আছেন ; এ বিশ্বাস থাকা দরকার। আর ধৈর্য্যই হইল সাধনার অঙ্গ।”

ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের ব্রহ্মচারীটি গীতার কথা উঠাইয়াছেন, “আচ্ছা মা, গীতায় যে বলা হইয়াছে ‘সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য’ ইত্যাদি। কৃষ্ণকে আশ্রয় করিতে বলিতেছে ?

দেবকী নন্দন কৃষ্ণ ?” মা বলিলেন, “বাহিরের দিক দিয়া এই মেয়েটাকে ত গীতা পড়াও নাই বাবা।” তবে এই যে শ্লোকটা যে যখন পড়িবে তখনই ত সে বলিবে “আমাকে ভজনা কর, এই আমি কে ?—পরমাত্মা। তবেই হইল কৃষ্ণ কে ? না পরমাত্মা।” আবার কথা হইতেছে—

“স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াভহঃ।”

মা বলিতেছেন, “ধর্ম্ম মানে কি ? যে ধারণা স্ব-ধর্ম্ম কি ! করিয়াছে। চোর চুরি বিটাই ধরিয়াছে ;

কিন্তু আবার দেখা যায় সেই চোরই সাধু হইয়া যায়। তবেই চুরিটা তাহার স্বধর্ম্ম নয়, যাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম তাহা কখনও পরিবর্তন হয় না। যাহা পরিবর্তন হয়, তাহা ধর্ম্ম নয়—অধর্ম্ম। তোমার স্বভাব হচ্ছে ধর্ম্ম ; তাহা ছাড়িয়া অপর যে সব পরধর্ম্ম (অধর্ম্ম) নেওয়া, সর্বদাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। আবার জগতে যেমন আগুনের ধর্ম্ম, জলের ধর্ম্ম, সেইরূপ সংস্কার অনুযায়ী যার যার যে স্বভাবটি প্রকাশ থাকে, গুরুশক্তি দ্বারা তাহার ভিতর দিয়াও তদমুখী করাইয়া নেন।”

জানিনা কোথা হইতে খবর পাইয়া ক্রমে ক্রমে আজ অনেক স্থানীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীটি প্রশ্ন করিতেছেন “আচ্ছা মা, এই যে বলা হয়, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এর অর্থ কি ?” মা হাসিয়া বলিলেন, “অনেক দিন পূর্বের মননার কালীবাড়ী হইতে যাইতে ৩টা গৈরিক বেশ ধারিণীর

সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একজন হঠাৎ আমাকে

ডাকিয়া নানা কথা প্রসঙ্গে বলিতেছে, ‘দেখুন,
“ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।” তখন আমি
মিথ্যার”তাৎপর্যার্থ।

বলিলাম, জগৎ মিথ্যা কি করিয়া বলি,
জগতের ভিতরেই সকলের জন্ম; জন্মিয়াই এই জগৎ দেখিতেছ;
বাস্তবিক যখন সেই জ্ঞান হইবে তখন বলা চলে জগৎ মিথ্যা।
এই কথায় তিন সন্ন্যাসিনীর ভিতর ঝগড়া লাগিল, “এক সাদা
কাপড় পরা ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোকের কাছে আবার কি কথা
বলিতে গিয়াছিলে, সে কি বলিবে? ইত্যাদি।” এই বলিয়া
মা হাসিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মচারীটি বলিলেন “মা কেহ
কেহ বলেন, ব্রহ্মই বিবর্তিত হইয়া জগৎ হইয়াছেন, কাজেই
জগৎও সত্য আমিও সত্য।” মা বলিলেন, “এক হিসাবে
তাহাও ঠিকই। জগতের যে গতাগতি, তাহারও আদি অন্ত
নাই, সেই হিসাবে জগৎও সত্য। আর এক কথা,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তবিক তত্ত্ব না বুঝা যায়, ততক্ষণ
পর্য্যন্ত জগৎও সত্য মানিয়া নিতে হইবে। তবে এসব
কথা শুনিয়া লাভ কি! এক কান দিয়া শুনিবে আর এক
কান দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। শোনা তখনই হয়, যখন
কৰ্ম্মতে প্রকাশ পায়। কাজেই প্রকৃত শোনাও হয় না।”
এইরূপ নানা কথা হইল, রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইলেন।
মেয়েরা ঘাঁহারা চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, সকলেই মার ঘরে
শুইবার জন্য একটু কষ্ট করিয়া একঘরে শুইলেন।

১০ই মাঘ, শনিবার।

আজ মা ভোরে উঠিয়াই উপরে পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদা, অখণ্ডানন্দগিরি সঙ্গে গেলেন। পরে ধীরে ধীরে আরও অনেকে মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মা সেখানে মুক্ত স্থানে এক গাছতলায় কবুল বিছাইয়া বসিলেন। স্থানীয় লোকেরা, এক মাতা আসিয়াছেন খবর পাইয়া একে একে দর্শন করিতে আসিতেছেন। আজ মা খাইবেন না, আমি গিয়া একটু সামান্য দুধ খাওয়াইয়া আসিলাম। মা গাছতলায়ই বসিয়া আছেন। বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। দুপুরবেলা মা নামিয়া আসিলেন। বৈকালে মাকে একটু ফল খাওয়ান হইল। সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলিয়া মার কাছে কীর্তন করিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ও সজ্জন হইয়া দাঁড়াইল। চট্টগ্রাম হইতে প্রায়ই লোক যাওয়া আসা করিতেছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, “বই পড়া বিছা যেমন টাইম-টেবল দেখিয়া রাস্তা চলা। টাইম-টেবলে যাহা থাকে, তাহা ছাড়া রাস্তায় আরও কত কি আছে। যাহা বিশেষ, যতটা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে তাহাই টাইম-টেবলে থাকে, তাহা ধরিয়া ধরিয়া সেই রাস্তায় চলিলে দেখা যায় আরও কত দেখিবার ও জানিবার বিষয় শাস্ত্রের নির্দেশ আছে। টাইম-টেবলে কি আর সব লিখিতে মত চলায় পারে? সেইরূপ শাস্ত্রেও কি আর সব সত্যাত্ত্বভব হয়। লিখিতে পারে? যাহারা সেই পথে চলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য,

তাহা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখিতে পারে? প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কত কি দেখেন, জানেন। তবে যেমন টাইম-টেবল দেখিয়াই ট্রেনের পথ চলিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলিতে হয়। তবেই শাস্ত্রীয় কথা র ভিতরেও অনন্ত ভাব নিহিত থাকে কিন্তু।”

আজ জ্যোৎস্না রাত্রি, মা অনেকক্ষণ বাহিরে বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা ও সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মার মধুর কথা শুনিতেছেন। রাত্রি প্রায় এগারোটায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১১ই মাঘ, রবিবার।

আজও সকালে উঠিয়া মা পাহাড়ে গেলেন। সঙ্গে ২৪ জন গেলেন। অনেকক্ষণ তথায় থাকিয়া মা নীচে নামিয়া আসিলেন। পরে মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইয়া মা মুড়ি-দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১টায় ভোগ হইল। আজও বহু লোক মার দর্শনে আসিয়াছেন। ঘরে জায়গা হয় না, মা বাহিরে আসিয়া বসিলেন। এই মঠের মোহন্ত ব্রহ্মচারীটি মাকে খুবই যত্ন করেন। রোজই মার জন্ম নিজের রান্না হইতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন। বৈকালে ব্রহ্মচারীটি আসিয়াছেন, মার সহিত কথা হইতেছে। আরও অনেক লোক আসিয়াছেন মা এই আশ্রমের মালিক ব্রহ্মচারীটিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “বাবা তুমি আসিয়াছ; এদের কিছু বল। আমি ত’ তোমার মেয়ে, আমি ত’ কিছুই জানি না।” ব্রহ্মচারীটি

১০ই মাঘ, শনিবার ।

আজ মা ভোরে উঠিয়াই উপরে পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন । জ্যোতিষদাদা, অখণ্ডানন্দগিরি সঙ্গে গেলেন । পরে ধীরে ধীরে আরও অনেকে মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন । মা সেখানে মুক্ত স্থানে এক গাছতলায় কঞ্চল বিছাইয়া বসিলেন । স্থানীয় লোকেরা, এক মাতা আসিয়াছেন খবর পাইয়া একে একে দর্শন করিতে আসিতেছেন । আজ মা খাইবেন না, আমি গিয়া একটু সামান্য দুধ খাওয়াইয়া আসিলাম । মা গাছতলায়ই বসিয়া আছেন । বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে । দুপুরবেলা মা নামিয়া আসিলেন । বৈকালে মাকে একটু ফল খাওয়ান হইল । সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলিয়া মার কাছে কীর্তন করিল । এই নির্জন পাহাড়ও সজন হইয়া দাঁড়াইল । চট্টগ্রাম হইতে প্রায়ই লোক যাওয়া আসা করিতেছেন । কথায় কথায় মা বলিতেছেন, “বই পড়া বিড়া যেমন টাইম-টেবল দেখিয়া রাস্তা চলা । টাইম-টেবলে যাহা থাকে, তাহা ছাড়া রাস্তার আরও কত কি আছে। যাহা বিশেষ, যতটা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে তাহাই টাইম-টেবলে থাকে, তাহা ধরিয়া ধরিয়া সেই রাস্তার চলিলে দেখা যায় আরও কত দেখিবার ও জানিবার বিষয় আছে । টাইম-টেবলে কি আর সব লিখিতে পারেন ? সেইরূপ শাস্ত্রেও কি আর সব সত্যাত্মক হয় । লিখিতে পারে ? যাহারা সেই পথে চলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য,

তাহা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখিতে পারে? প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কত কি দেখেন, জানেন। তবে যেমন টাইম-টেবেল দেখিয়াই ট্রেনের পথ চলিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলিতে হয়। তবেই শাস্ত্রীয় কথার ভিতরেও অনন্ত ভাব নিহিত থাকে কিন্তু।”

আজ জ্যোৎস্না রাত্রি, মা অনেকক্ষণ বাহিরে বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা ও সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মার মধুর কথা শুনিতেছেন। রাত্রি প্রায় এগারোটায় সকলে বিদ্রাম করিতে গেলেন।

১১ই মাঘ, রবিবার।

আজও সকালে উঠিয়া মা পাহাড়ে গেলেন। সঙ্গে ২৪ জন গেলেন। অনেকক্ষণ তথায় থাকিয়া মা নীচে নামিয়া আসিলেন। পরে মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইয়া মা মুড়ি-দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১টার ভোগ হইল। আজও বহু লোক মার দর্শনে আসিয়াছেন। ঘরে জায়গা হয় না, মা বাহিরে আসিয়া বসিলেন। এই মঠের মোহন্ত ব্রহ্মচারীটি মাকে খুবই যত্ন করেন। রোজই মার জন্ম নিজের রান্না হইতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন। বৈকালে ব্রহ্মচারীটি আসিয়াছেন, মার সহিত কথা হইতেছে। আরও অনেক লোক আসিয়াছেন মা এই আশ্রমের মালিক ব্রহ্মচারীটিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “বাবা তুমি আসিয়াছ; এদের কিছু বল। আমি ত’ তোমার মেয়ে, আমি ত’ কিছুই জানি না।” ব্রহ্মচারীটি

বলিলেন, “তুমি ত’ বল মেয়ে, আমি ত জানি মা ; তুমি ত কিছুই জান না ; কিন্তু এই যে আজ ক’দিন যাবত এত লোক আসিতেছে, তোমার মধুর কথা শুনিবার জন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—কই আমি ত আজ ১৭১৮ বৎসর যাবত এই জায়গায় বসিয়া আছি, এত লোক ত একত্র করিতে পারি নাই । আসল কথা, ইহারা তোমার মধ্যে যে আনন্দ দেখিতেছে, সেই আনন্দটা নিজেরা পায় না বলিয়াই তোমার কাছে আসে । তোমার মধুর বাণী শুনিবার জন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ।” মা হাসিয়া বলিলেন, “তা যদি বল বাবা, তবে বলিতে হয় মধুর আশ্বাদ ইহারা জানে । তাই ত আমি বলি সবই নিজের মধ্যেই আছে । খণ্ড আনন্দে প্রাণটা তৃপ্ত

হইতেছে না তাই মানুষ অখণ্ড আনন্দ পাই-
মানুষ খণ্ড আনন্দে
তৃপ্ত নয়, তাই বার জন্ম অখণ্ডের সন্ধান করিতেছে । শান্তি
অখণ্ড আনন্দের ও আনন্দই সকলে চায় । আবার এই
খোঁজ করে । জাগতিক শান্তি ও আনন্দে মানুষ তৃপ্ত

হইতেছে না, পূর্ণ শান্তি ও আনন্দের খোঁজ
করিতেছে ! তবেই বুঝিতে হইবে সেই পূর্ণ আনন্দের অনুভব
তাহার আছে, তাহিত মানুষ এই খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত হইতেছে না ।
সেই জন্মই সাধনার দরকার । ধর সকলকেই সমুদ্রে যাইতে
হইবে, কিন্তু যাওয়ার পথ অনেক আছে । তোমরা এ মেয়ের
আবদার একটু রক্ষা করিও, সকলে সেইদিকে যাইবার জন্য
একটু একটু সময় দিও । বাসায় ত ছেলেমেয়েদের কত

আবদারই রক্ষা করিতে হয়, এ মেয়েটার এ আবদারও একটু রক্ষা করিও।”

একজন বলিলেন, “মা, যখন দেখিতে পাই মানুষ ইচ্ছা করিলেই কিছু হয় না, ডাক্তার রুগীকে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টাই না করে, কিন্তু বাঁচাইতে পারে না। উকিল মোকদ্দমা জিতিবার জন্য কত ইচ্ছা কত চেষ্টাই না করে; কিন্তু তবুও হারিয়া যায়। চাষা কত পরিশ্রম করে, আশা করে ক্ষেতে ভাল ফসল যেন হয়; কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় না। মানুষের যখন কিছুই শক্তি নাই, তখন তিনি যেমন করাইবেন সেইরূপই হইবে; সেই দিকেও যদি তিনি নেন, যাইতে পারিব, নতুবা আমাদের চেষ্টায় কি হইবে।” মা বলিলেন, “দেখ, এই কথা বলিবার আমরা অধিকারী নই। কারণ এই যে ‘তিনি’ বলিতেছি ইহা মুখের কথা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের তাঁর সহিত কোন পরিচয়ই হয় নাই। বাস্তবিকই, সাধন ভজন করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মানুষ বুঝিতে পারে আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, তিনি যেমন করাইতেছেন আমি তেমনই করিতেছি। এখন যে

সাধন-ভজন জন্য
চেষ্টা করা দরকার।

তোমাদের চেষ্টা করিতে বলিতেছি, সে হইল যতটুকু তোমরা পার ততটুকু তোমরা কর, অর্থাৎ যতটুকু শক্তি কাজে লাগাও। তারপর তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে—এ অতি সত্য কথা। কিন্তু সে অনুভূতি কোথায়? বাস্তবিক এই অনুভূতি হইলে ত দুঃখ কষ্ট কিছুই

করিবার নাই। তোমরা যে অহং বুদ্ধি দ্বারা লেখাপড়া, কাজ কর্ম সব কিছু করিতেছ, সেইরূপ ঐ দিকে যাইবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করিও। সব আমরা করিতে পারি আর ধর্ম কাজের কথা হইলেই ‘তিনি না করাইলে কি করিয়া করিব?’ এ কথা বলা চলে না।” একজন বলিল, “মা, গীতার আছে—মা বলিলেন, “সেই অবস্থা স্থায়ী হইবার জন্যই ঐদিকের একটু কর্ম করিতে বলা হইতেছে। আমি ত কিছু বলি না, তোমরা যাহা বলাইতেছ তাই বলা হইতেছে।” ষ্টেশন মাষ্টারেরা আসিয়াছেন। মা বলিলেন, “সব দিকের মাষ্টারীটি করা চাই।” কথার কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল, সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সন্ধ্যার

মন্ত্র শিখিলে মন্ত্রের
শক্তি দেখা যায়।

পর আবার দু-চারজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন

একজন কবিরাজ বলিতেছেন, “আচ্ছা মা,

সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায় কেমন

মন্ত্র-শক্তি, ওঝারা ভূত ঝাড়িবার মন্ত্র শিখিয়া ভূত ঝাড়ে, এইসব। কিন্তু ভবসাগর পার হওয়ার জন্য জপাদি ত কত লোকে করিতেছে কিন্তু মন্ত্র-শক্তি ত কিছুই দেখিতেছি না।” মা বলিলেন, “মন্ত্র শিখিয়া কি বলিয়াছ; বাবা! কথা হইল এই, এই সব জাগতিক মন্ত্র শিখা সহজ, ঐ পথের মন্ত্রও যদি শিখিতে পার, তবে নিশ্চয়ই মন্ত্র শক্তিও দেখিতে পার—কিন্তু ঐদিকের মন্ত্রই যে শিখা হয় নাই। তবে যত টুকু শিখ ততটুকু ফল হয় বই কি। গুরু শক্তির ক্রিয়া ত নিশ্চয়ই আছে।” সেই লোকটি বলিল, “কিন্তু জপাদিত

সকলেই করিতেছে।” মা বলিলেন, “উহা যাদ এতই সহজ হইত, তবে আর দুর্লভ বস্তু বলিয়া কথা হইত না। কত ঋষি মুনিরা যুগ-যুগান্তর কত সাধনা করিয়া গিয়াছেন—একথাও থাকিত না।” কথাবার্তার পর সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

১২ই মাঘ, সোমবার।

আজ প্রাতে উঠিয়া মা আর পাহাড়ে গেলেন না। সকাল বেলার গাড়িতে চট্টগ্রাম হইতে শুরেন ঘোষাল, দ্বিজেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়েরা সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপেন্দ্র পাল মহাশয়ের স্ত্রীও আসিয়াছেন। যশোদা ঘোষাল ও চন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী পূর্বেই আসিয়াছেন। তাহারা আসিয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে গেলেন। বেলা প্রায় ১০।১১ টায় মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা ১১।০ টায় সকলে চন্দ্রনাথ হইতে ফিরিলেন। মা উঠিলে সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিতেছেন। মা কথায় কথায় শচীদাদার বোন মনোরমাদেবীর পাতভক্তি ও সকলের সেবার ভাবের প্রশংসা করিতেছেন। বলিতেছেন, “এই ভাবটা বড় দেখা যায় না। একদিন আমি তাহার চুলগুলি নিয়া খেলা করিলাম। অপর একদিন চুলগুলি আমার গলার ঝড়াইয়া বলিলাম, ‘আমার মাফলার। ও যদি মরিয়া যায় তবে আমার মাফলার ও চলিয়া যাইবে, তোমরা এইগুলি একটু কাটিয়া রাখিয়া দিও।’ শুনিলাম বিধবা হওয়ার পর তাহার মা তাহাকে চুল কাটিতে দেয় নাই। শেষে শুনিলাম, তাহার স্বামী তাহার

চুলগুলির অতি যত্ন করিয়াছে। সেও চুল বিছাইয়া স্বামীকে তাহার উপর শোওয়াইয়াছে। আমি ত আর এসব কথা পূর্বে তাহাদের কাছে শুনি নাই। তারপর একদিন মনোরমা আমাকে একা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'মা, তুমি আমার চুলগুলি নিয়া এত খেলা কেন করিলে? তখন আমি বলিলাম, 'দেখ, হয়ত তোমার স্বামীর স্মৃতি তোমার ভালবাসার তীব্র ইচ্ছা তাহা উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়া চুলগুলি রাখিয়া দিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক আমি ত বলি—আমি কিছুই বলি না তোমারাই বলাইয়া নিও। আরও ত কত লোকের চুল সুন্দর থাকে, কিন্তু তোমার চুলগুলি নিয়া এ সব হইল কেন?' মার কথায় সত্যই শচীবাবু তাহার দিদির এক গোছা চুল কাটিয়া আয়না দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। আর মনোরমাদিদিও নিজের চুল দিয়া মার পায়ের জুতা ও মাফ্লার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। মনোরমা দিদির কথা বলিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা পুরুষ কে?" অনেক পুরুষরা কাছেই ছিল। তাহারা হাসিতে লাগিল। মা হাসিয়া মেয়েদের বলিতেছেন, "দেখ, তোমরা ও যেমন পতির মুখের দিকে চাহিয়া থাক, কিছু চাও, পুরুষরাও কিন্তু আবার আর একজনকে চাহিতেছে কাজেই তাহারা ও স্ত্রীলোক। পুরুষ যে হইবে তাহার কোন রকম ইচ্ছা চাওয়া বা অভাব থাকিবে না। সে স্থির, ধীর। কাজেই সকলে সেই পরম পতিকে চাহিতেছি। তাই সকলেই স্ত্রীলোক।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় চট্রগ্রামের দল

তিনি বলিলেন, “আমার পা একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল, মোটেই হাঁটিতে পারিতাম না। একদিন স্বপ্নে দেখি আনন্দময়ীমার কাছে যাওয়ায় আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার বাবা ঢাকা থাকেন, তাই বাবার কাছে গেলাম। অনেক চিকিৎসার পর একটু ভাল হইলাম—এর মধ্যেই মা ৭ দিনের জন্ম ঢাকা গেলেন, সংবাদ পাইয়াই বাবা আমাকে নিয়া মার আশ্রমে গেলেন। মা তখন মাঠে বটগাছের তলায় বাসিয়া ছিলেন, পরে মা যখন উঠিয়া আশ্রমে গেলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে যাইতে পারিলাম। সেই হইতেই আমি ধীরে ধীরে ভাল হইয়া গেলাম।

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার।

আজ মা সকালে প্রায় ৭টায় উঠিলেন। মুখ ধুইয়া একটু দুধ খাইলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বেলা প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা ২টায় মার ভোগ হইল। আজও মা করতাল নিয়া বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিলেন।

“জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে

এ নাম বল বদনে শুনাও কাণে বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে” বৈকালে অনেকে মার দর্শনে আসিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারবাবু রোজই বৈকালে আসেন। যে সকল ভক্ত চট্টগ্রাম হইতে সকালে আসিয়া সন্ধ্যায় পুনরায় ফিরিয়া যান, তাহারা ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার পূর্বে নামিয়া যান। মা হাসিয়া বলেন, “তুমিত পারের কর্তা, কর্তার পেছনে পেছনে থাকিলে

পারের চিন্তা থাকে না।” মাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আমরা সংসারী-জীব, আমাদের উপায় কি?” মা বলিলেন, “শুধু নাম, আমি জানি নামেই সব হয়। যত বেশী সময় পার তাঁর জন্ত দাও, নাম বেশী নিতে না পার তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা কর নতুবা নাম সংকীৰ্ত্তন বা সৎ পুস্তকাদি পাঠ কর—যে করিয়াই হোক বেশী সময় তাঁর দিকে মনটা রাখিতে চেষ্টা কর।” সন্ধ্যার পরে জ্যোতিষ দাদা ‘মা’ গাইয়া দিলেন, সকলে মিলিয়া সেই সঙ্গে যোগ দিল। অনেকক্ষণ নাম হইল রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু মার ভাবটা যেন কেমন হইতেছে। যেন কেমন গাছাড়া, নিস্তব্ধ রাত্রিতেও কেবল এপাশ ওপাশ করেন। জানিনা কি হইবে।

১৪ই মাঘ, বুধবার।

আজও মা প্রাতে উঠিয়াই পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। প্রায় ৮টার সময় পাহাড় হইতে নামিয়া মুখ ধুইয়াই বলিলেন, “চল আমরা একটু বেড়াইয়া আসি।” এই বলিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি, জ্যোতিষদাদা ও অখণ্ডানন্দ স্বামী চলিলাম। নীচে নামিয়াই ভোলানাথকে গিয়া বলিলেন, “চল, আমরা সকলে শম্ভুনাথের বাড়ী যাই।” তখনই সকলে চলিল। মা বলিলেন, “সেখানেই খাওয়া দাওয়া হইবে।” শুনিয়া জটু প্রভৃতি ছেলের দল মহানন্দে জিনিষ-পত্র নিয়া রওনা হইল। মা তখনই রওনা হইয়া গেলেন। আজ চন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রীর নাম

সামবেদ, বিনোদবাবুর স্ত্রীর নাম যজুর্বেদ, যশোদাবাবুর স্ত্রীর নাম ঋক্বেদ এবং যশোদাবাবুর ভগ্নীর নাম অথর্ববেদ রাখিলেন। ইহারা ৪জন আজ কয়দিন যাবতই মার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। পথে যাইতে যাইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের বাড়ী কোন দেশে?” মা উত্তর দিলেন, “নাই দেশে।” “কোন জিলা?” “ব্রহ্ম জিলা।” সকলে এই কথায় আনন্দ করিতে করিতে চলিল। আবার অন্য একজন এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, “বাড়ী কোথায়?” উত্তরে “ব্রহ্ম-নগর।” “তোমার কে আছে,” উত্তরে মা বলিলেন “আত্মা-নন্দ।” সে ভাবিয়া লইল সত্যই বুঝি তাই। একেবারে শম্ভুনাথের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেই শম্ভুনাথের ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ পাইবেন স্থির হইল। মার আজ খওয়া নাই। আমি নিজে ভাতে ভাত পাক করিয়া নিলাম। কারণ কাহারও হাতে খওয়া নিষেধ। মার নিয়ম আবার এক এক সময় এমনই কঠিন যে, আমাকে নিষ্ঠামত থাকিতে বলিয়াছেন, তাই মার প্রসাদও কেহ ছুঁইলে বা মিষ্টি মিঠাই ছোঁয়া গেলে আমাকে নিতে নিষেধ করিয়াছেন। মা বলেন, “সব কাজই ঠিক ঠিক মত করা দরকার।” সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে “সব কাজই ঠিক ঠিক কাটিয়া গেল। পাণ্ডারা মার কাছে মত করা দরকার।” প্রার্থনা জানাইল, “ভক্তদের নিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া আরতি দেখিয়া গেলে আমরা খুব আনন্দিত হই।” তাহাই হইল। পাণ্ডারা শম্ভু

নাথের আরতির পর মাকে আসিয়া আরতি করিল। সন্ধ্যা বেলায় তাহারা পুনরায় নানা রকম ভোগ দিয়া ভক্তদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। মা সন্ধ্যা বেলায় সকলকে স্থিরভাবে বসিতে বলিয়া নাম ধরিলেন—“জয় শিব শঙ্কর, বম্ বম্ হর হর।”

সকলে স্থিরভাবে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাম ধরিলেন। ঐ নির্জন পাহাড়ে মা স্থিরভাবে বসিয়া নাম করাইতেছেন, ভক্তেরা ও চারিদিকে বসিয়া ঐ নাম করিতেছেন—কেমন একটা নিস্তব্ধ ভাবে সকলের প্রাণ ভরিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৯টার পাণ্ডারা প্রচুর পরিমাণ ভক্তদের জলযোগ করাইলেন। মাও একটু জল খাইলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার আমরা মার সঙ্গে মঠে রওনা হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—ভক্তেরা ‘মা’, ‘মা’ কীর্তন করিতে করিতে মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাও হাততালি দিয়া ভক্তদের উৎসাহ দিতেছেন। কি আনন্দ তাহা ভাবায়’ ব্যক্ত করা যায় না। মঠে আসিয়াই মা কেমন একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। শুইয়া পড়িলেন, আর শব্দ নাই। সকলে মার এই ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজও মা পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও চুপ মার চুপ ভাবে করিয়া বসিয়া আছেন। মার যে ভাব, অবস্থিতি। দেখিলে কথা বলিতে ভয় হয় আজ সেই ভাব। কেমন যেন একটা ভাব। কোন দিকেই আজ আর লক্ষ্য নাই। মা যখন আমাদের মত হইয়া খেলা করেন তখনই

আমরা মার সহিত মিশিবার সাহস পাই। কিন্তু মার এই অবস্থায় কেমন ভয় হয়। মার নিস্তরুতা ভঙ্গ করিতে সাহস হয় না। আমি পাহাড়ের উপর বাইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। সামান্য একটু খাইয়াই নিষেধ করিলেন—আর খাইবেন না; অনুরোধ করিতে সাহস হইল না। মধ্যাহ্নে ও প্রায় কিছু খাইলেন না। পায়খানাও আশ্চর্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে—বলেন, বাহা খান রং একটু পরিবর্তন হইয়া ঠিক তাহাই পায়খানা হয়। খাওয়া দাওয়ার পর ও পড়িয়া রহিলেন। ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের ব্রহ্মচারিটি (দশরথ) মাকে তাহাদের আশ্রমে নিবার জন্ম বড়ই অনুরোধ করিতে ছিলেন; স্থির হইয়াছে আজ বৈকালে মা তথায় যাইবেন। বৈকালে ৩টার সময়েই তাহারা কীৰ্ত্তন নিয়া আসিয়া মাকে নীচে নামাইয়া নিয়া গেলেন। মঠের মোহন্ত ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দকে মা নিজে গিয়া ডাকিয়া সঙ্গে নিলেন। চলিবার সময় বলিতেছেন, “বাবা আগে যাইবে, মেয়ে পিছে পিছে যাইবে।” এমনই মার বিধান, কোন ভঙ্গেরই ক্রটি নাই। এই ব্যবহারের জন্মই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকেরা ও মার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত। আশ্রমে গিয়া সকলে বসিলেন। মার জন্ম তাহারা উচ্চাসন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মা গিয়া নীচে সকলের সঙ্গেই বসিয়া পড়িলেন। একটু কীৰ্ত্তন হইল। পরে দশরথ ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া বলিলে, “সীতাকুণ্ডবাসী ধন্য হইল, না আজ ৭ দিন হয় এখানে আসিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছেন,

ইত্যাদি।” সেখানে কৃষ্ণ বড় না শিব বড় এই নিয়া তর্ক উপস্থিত হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, “সবই ঠিক, যে যেখান হইতে যাহা বলিতেছে ঠিকই বলিতেছে” নানা কথার পর ব্রহ্মচারীরা নিজেদের গুরু গিরিমহারাজের আরতি করিয়া আসিয়া মাকেও সেই ভাবে আরতি করিল। পরে দশরথ ব্রহ্মচারী নিজ হাতে মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। ভক্তদেরও খুব যত্নের সহিত খাওয়াইলেন। আজও রাত্রি প্রায় ১০টার শঙ্কর মঠে ফিরিয়া যাওয়া হইল। শুইতে যাওয়ার পূর্বে মাকে একটু জল খাওয়াইতে বসিয়াছি। খাওয়ার পর ও মা বসিয়া কথা বলিতেছেন—কিন্তু ঐ রকম ভাব। একটা কথায় ভোলানাথ যেমন বলিলেন, “ইহা হইল কেন?” হঠাৎ মা ভোলানাথের এই ভাবের কথার উত্তরে বলিলেন, “যাহা হইবার হইবেই। যাহা আছে লেখা, তার সঙ্গে হবে দেখা।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার কথা উঠিয়াছে—শাহবাগে কীৰ্ত্তনে ধূপের গন্ধ পাইয়াছিল, অথচ ধূপ দেওয়া হয়ই নাই। এই কথায় মা বলিলেন, “সূক্ষ্ম শরীর-ধারীরা ও তোমাদের কাজের সাহায্য করে। যে যে ভাবের সে সেই ভাবের কাজে সাহায্য করিতে আসে—সর্বদাই ইহা করিতেছে। তোমরা দেখিতে পাওনা এইমাত্র।” অনেক রাত্রিতে মা বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু আজও মার সেই ভাব—একটুও চুপ করিয়া যেন থাকিতেছেন না। কথা বলিতেও যেন ভয় হয়। কেমন একটা ভাবে আছেন। বলিলেন, “হাতে

হাত লাগিয়া গিয়াছে খুলিতে পারা যায় না।” আমি তাড়াতাড়ি
 গিয়া খুলিয়া দিতেই, মা একটু মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন,
 “এতে কিছু হয় না, সেইদিন আর নাই। এই ভাবে কয়দিন
 শরীর টিকিবে ৪০ বৎসর ত প্রায় হইয়া গেল।” এই কথায়
 মনটা আমার দমিয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই মা ঐ ভাবেই
 গিয়া শুইয়া পড়িলেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

—:০:—

১৬ই মাস, শুক্রবার।

আজ চট্টগ্রাম ফিরিবার কথা। বৈকালে ৩টার গাড়ীতে যাইতে হইবে। মা তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিতে বলিলেন। সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করা হইল। মা চলিয়া যাইবেন, সীতাকুণ্ড বাসীরা সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আশ্রমের মোহন্ত ব্রহ্মচারী স্বরূপা-নন্দও খুবই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বেলা প্রায় ২টার মা সকলকে নিয়া রওনা হইলেন। পথে পথে লোক দাঁড়াইয়া মাকে দর্শন করিতেছে, প্রণাম করিতেছে, কেহ কেহ কাঁদিতেছে। শুনলাম, আমি যখন নীচে পাক করিতেছিলাম, তখন মেহার কালীবাড়ীর একটি সাধু ও সেই সঙ্গে ডাক্তার অতুলবাবু মার কাছে আসিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে ভোলা-গিরির আশ্রমে দেখা হইয়াছিল। অতুলবাবু মাকে দার্জিলিং দেখাইয়াছিলেন, পুনরায় অযাচিতভাবে মাকে এখানে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা,—বলিলেন, “মা, দার্জিলিংও ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছিলে—আবার এখানে তোমাকে দেখিলাম।”

আজ নাকি মঠে আসিয়া দেখিলেন, মা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন, তিনি নীচে বসিয়া মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মাও হঠাৎ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। মাকে দেখিয়া তিনি আনন্দে দুই হাত দিয়া মার চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। পরে অনেকক্ষণ মার কাছে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া বিদায় নিলেন। যাক্ মা ধীরে ধীরে গিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইলেন। অনেক লোক আসিয়াছেন। ষ্টেশন মাষ্টারও আসিয়াছেন। গাড়ী আসিবার একটু দেরী আছে। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, “মা, কিছুইত হয়না।” মা

নামও কর ও ঝাঁর নাম
কর, তাঁর উপর নির্ভর
কর, যেমন রোগী
বৈজ্ঞের উপর করে।

বলিলেন, “নামও করিতে হয়, আবার
সেই নামে রুচি হইবার জন্য আহা-
বিহারও নিয়মমত করা দরকার। যেমন
ঔষধ খাইলে পথ্যও ঠিকমত করা দরকার।

নতুবা ব্যাধি মুক্ত হওয়া যায় না। তোমরা একেবারে রুগী হইয়া থাক, সেই বৈজ্ঞের উপরে ভার দিয়া বসিয়া থাক, যেমন রুগীরা ডাক্তারের কথামত ঔষধ ত খায়—আবার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা পর্য্যন্ত সবই ডাক্তারের কথামত করিতে হয়—তবেই ফল পাওয়া যায়।” এই সব কথায় কথায় গাড়ী আসিয়া পড়িল। স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীও ষ্টেশনে আসিয়াছেন। আজ ১৮ বৎসর যাবত এইভাবে একই স্থানে আছেন—তবুও আজ তাহার প্রাণটা মার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, “হবেই ত—মেয়েটার জন্য বাবার

মন খারাপ ত হবেই”। এই বলিয়া “বাবা, বাবা” বলিয়া ডাকিতেছেন—তাহাতে বাবাটির অবস্থা আরও খারাপ হইতেছে। রাস্তায় যাহারা প্রণাম করিতেছিল, অনেকেই গরীব গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোক। মা সকলকেই, “মা তবে এখন আসি” বলিয়া একটু হাসিয়া হাত দুইখানি জোড় করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া তাহাদের ব্যাকুলতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। কেহ কেহ মাকে ধরিয়া কাঁদিয়াই দিল। সীতাকুণ্ড-বাসীরা সকলেই বলিতেছে,—“মা আবার কবে দেখা পাব?” মা বলিলে, “তোমারাত রোজ বৈকালে মঠে যাইতে, এখন হইতে সেই সময়তে যাহার যে নাম ভাল লাগে তাহাই একটু করিও, আমার যদি খেয়াল হয়, আমিও ঐ সময়তে তোমাদের কথা খেয়াল করিব।” এইভাবে সকলের নিকট বিদায় নিয়া মা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই মা শুইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় ৫টায় চট্টগ্রামে পৌঁছলাম। ঘোষালবাবুরা অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্র পাল মহাশয়ের মোটরে মা কালীবাড়ী আসিলেন। গতবার কালীবাড়ীর মোহন মাকে এবিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়া দিয়াছিলেন। আজও তিনি ষ্টেশনে গিয়া মাকে নিয়া আসিলেন। শশীবাবু প্রভৃতি অনেকেই ষ্টেশনে ছিলেন। আসিবার সময় দ্বিগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রবাবুর অনুরোধে মা তাহাদের বাসা হইয়া আসিলেন। মা সন্ধ্যার পরে যশোদাবাবুর বাসায় একটু জল খাইয়া আসি-

লেন। বহুলোক দর্শন করিতে আসিয়াছে। রাধা-মাধব কুটীরের সুরেনবাবুরা আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। গত-বারও ইহাদের কীর্তনে সকলেই খুব আনন্দ পাইয়াছিলেন মা বসিয়া আছেন। মেয়ে পুরুষে সব মাকে ঘেরিয়া আছে। পঁটিয়ার আশ্রমের হেমবাবু আসিয়া মার চরণ বন্দনা করিলেন। ইনি শাহবাগে মার কাছে খুব যাইতেন। বহু বৎসর মার সহিত দেখা নাই, কিন্তু মা ইহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “কেমন আছ? এই বলিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, “ঠিক ধরিয়াছিত?” উনি বলিলেন, ঠিকই ধরিয়াছ মা? কীর্তন চলিতে লাগিল। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সীতাকুণ্ডে গিরি মহারাজের আশ্রমে একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, “মা আমি যদি হরি হরি বোলি তবেই হয়—আবার দীক্ষার দরকার কি? আর এমন যদি হয়, আমি সারাজীবন হরি হরি করিলাম, আর আমার ৫০ বৎসরের সময় কুলগুরু আসিয়া আমাকে শক্তিমন্ত্র দিল, তখন উপায় কি? মা বলিলেন, তুমি ত বোঝনা কি নামে তোমার কাজ হইবে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও গুরু তোমার ভাব বুঝিয়া মন্ত্র দিবে। কিছুদিন সাধন করিলে বুঝিবে যে ঐ নামই তোমার দরকার ছিল কিন্তু তুমি বোঝ নাই। দেখ, বাস্তবিক যদি তুমি তাঁকে চাও, তবে তোমার কোন গোলমালই হইতে পারে না। আর তুমি যদি ঠিক ধরিয়া থাকিতে পার যে, হরি হরি বলিতেছি, এই নামেই আমার হইবে—আমার দীক্ষার দরকার নাই—তবে

তাহাতেই তোমার কাজ হইবে। কেমন জান, যেমন তোমার ভাল নাম আমি জানি না, তবুও তোমাকে যদি আমি তোমার সাধারণ নামেই ডাকি, তবুও তুমি আমার কাছে আসিবে। আসিয়া আবার হয়ত তুমিই বলিবে, ‘আমার ভাল নাম কিন্তু এই,’ যেমন দেখ টুন্টু, মিন্টু ডাক নাম থাকে আবার স্কুলে কি চাকুরী করিবার সময় রেজেষ্ট্রী খাতায় তোমরা আবার নিজেদের ভাল নাম লিখাও, তেমন আর কি”—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন আচ্ছা, “আমি জানি না কুলগুরু আমার কি পথ দেখাইবে। যে নিজেই পথ জানে না। কিন্তু যদি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে নেই, তবে দেশের লোক গালাগালি করিবে যে দেখ কুলগুরু ত্যাগ করিল।” মা বলিলেন, “দেখ এক ত আছে যাহার কাছে প্রাণে ভক্তি আসিবে তাহার কাছেই দীক্ষা নিবে। কারণ মনে মনে বিরক্ত ভাব নিয়া নিয়ম রক্ষার মত দীক্ষা নিলাম, তাহাতে কাজ হয় না। আবার আছে, যদি কুলগুরু ত্যাগ করিলাম বলিয়া মনে একটা সংশয় থাকে তবে বলিতেছি—একটি শিশু তোমাকে একটি বীজ দিল, তুমিও জান না কি সেই বীজ শিশুও জানে না; কিন্তু তুমি যদি তাহা মাটিতে পুঁতিয়া যত্ন কর; কিছুদিন পর গাছ ও ফল হইবেই। তুমি জানিতে পারিবে কিসের বীজ ছিল। তোমার বা শিশুর যে বীজ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান ছিল না তাহাতে গাছ বা ফল হইবার কোন বাধা নাই। আসল কথা কাজ চাই। কাজ কর,

সময় দাও, বাস্তবিক তাঁকে চাও—দেখিবে সব ঠিক মিলিয়া যাইবে। কারণ তিনি যে স্বয়ং প্রকাশ।” অনেকেই বলিলেন, “তাঁর কৃপা হইলে চাইতে পারিব।” মা বলিলেন, “এই যে তিনি বলিতেছ, এখনও ত তাঁর সহিত পরিচয় হয় নাই। শুধু মুখেই বল তাঁর

তাঁর ইচ্ছা না হইলে কিছুই হয়না ইহা সত্য কথা, কিন্তু ইহা বাস্তবিক বলার অধিকারী সকলে নয়; কাজ করা দরকার।

ইচ্ছা। তোমরা পড়াশুনা করিয়া পাশ কর, সংসার কর, কত কাজ কর্ম কর এই যে তোমাদের নিজেদের শক্তি আছে বলিয়া মনে কর—ইহা দ্বারাই তাঁকেও

একটু ডাক। সেই সময় তাঁর ইচ্ছা বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? তাঁর ইচ্ছা না হইলে 'কিছুই হয় না—ইহা অতি সত্য কথা; বাস্তবিক বলিবার আমরা অধিকারী নই।’ রাত্রি প্রায় ২টায় মা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

১৭ই মাঘ, শনিবার।

আজ বেলা ১২টায় পরেকোড়া জ্যোতিবদাদাদের বাড়ী রওনা হইবার কথা, সেই বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মা সকালে উঠিয়াছেন। ঘোষাল পরিবারের অনেকেই আসিয়াছেন। ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথের কন্যা, উপেন্দ্র পালের স্ত্রী মার জন্ম খাবার করিয়া নিয়া আসিয়াছেন, আজ মার খাবার দিন। মাকে মুখ ধোওয়াইয়া একটু জল খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আরও ২১ বাসায় মাকে একটু পদধূলি দিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ

করিয়া নিয়া গেল। বেলা প্রায় ১টার সময় মার সঙ্গে ভক্তবৃন্দ সকলে পরৈকোড়া রওনা হইলেন। তিনবেদ ও অগ্ন্যগ্ন অনেকের সঙ্গে ছিলেন, ফটো-গ্রাফার শশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীও এই গ্রামে—তিনিও মার পুরাতন ভক্ত। কত ভাবে তিনি এবারও মার ফটো তুলিয়াছেন। শশীবাবুও সঙ্গে আসিয়াছেন। তার উৎসাহে জ্যোতিষদাদার মুখে মার করুণার ২৩টি ঘটনা শুনিলাম। রাত্রিতে মা জ্যোতিষদাদার মেয়েটির কথায় বলিতেছেন, এই মেয়ের বিবাহের সময়—জ্যোতিষ বলিয়াছিল, মেয়েটির বৈধব্য যোগ আছে। একদিন রাত্রিতে ছোট্ট একটা সোণার রেকাবি করিয়া একখানা অমৃতি নিয়া আসিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। পরে সেই রেকাবীর সোণা দিয়াই মেয়ের বিবাহের সব গহনা গড়াইয়া দিল। মেয়েটি যে সধবা মরিতে পারিয়াছে ইহাত ভালই হইয়াছে,” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রায় বেলা ৩৪টার সময় পরৈকোড়ার ঘাটে পৌঁছাইলাম। জ্যোতিষদাদার ভাইপো কীর্ত্তনের দল নিয়া ও পালকী নিয়া ঘাটে মাকে আনিতে পরৈকোড়া আগমন গিয়াছে। শশীবাবুরই এইসব উৎসাহ।

মা ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত একটু পালকীতে উঠিয়াই নামিয়া পড়িলেন। করুণাময়ী হাঁটিয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন চলিতেছে, বহু ভক্ত—এইভাবে জ্যোতিষদাদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও অনেকক্ষণ কীর্ত্তন চলিল। পরে তাহাদের মাধব ও মনসার মন্দিরের মধ্যের

কোঠায়—যেখানে দুর্গাপূজা হয় মা আমাদের নিয়া সেই ঘরে
 বিশ্রাম করিতে গেলেন। পঠৈকোড়ায় মাকে অনেকের বাড়ীতে
 নিল। সকলের বিশ্বাস মার পদখুলি পড়িলেই গৃহের মঙ্গল
 হইবে। গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ীতে তাহার ভাই সুরেনবাবু নিয়া
 গেলেন। তাদের ঠাকুর মন্দিরের দরজাতেই পঞ্চবটীতলা।
 সুরেনবাবু মাকে দেখাইয়া বলিলেন,—“মা, আমার বাবা এখানে
 বসিয়া সাধন করিতেন।” মা বলিলেন, তোমরা এই স্থানটা
 একটু আমার বসিবার জন্ত বাঁধাইয়া পরিস্কার করিয়া রাখিও।
 এই বলিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন—বৃক্ষটি স্পর্শ করিলেন।
 পঠৈকোড়া সেনদের বাড়ীতে যখন নিল—তখন একটি রুগ্ন
 অতি-বৃদ্ধকে ধরাধরি করিয়া মাকে দর্শন করাইবার জন্ত নিয়া
 আসিল। পরে গুণিলাম মাকে দর্শন করিবার পূর্বদিন পর্য্যন্ত
 সেই বৃদ্ধ বাঁচিবার জন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিল—কি
 করিয়া ভাল হয় তাই বলিত। কিন্তু দেখা হইবার পরেই
 বলিতে লাগিল, “এখন যাইতে পারিলে হয়।” কি করিয়া ঐ
 রুগ্ন বৃদ্ধের মার দর্শনের পর হইতেই এইরূপ ভাবের পরিবর্তন
 হইল মাই জানেন। মার ঘুরিয়া বেড়ানোর এই সবই কারণ
 কিনা মা বলিতে পারেন। কত স্থানেই এইরূপ দেখা যাইতেছে
 যে মাকে দেখে নাই কিন্তু দেখিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা—
 মাও গিয়া তথায় উপস্থিত হইতেছেন। আবার হয়ত কেহ স্বপ্নে
 বা ছায়াক্রমে দেখিতেছে—পরে মা সশরীরে গিয়া তথায়
 উপস্থিত হইতেছেন।

১৮ই মাঘ, রবিবার।

আজ বেলা প্রায় ৭টায় মা উঠিয়াছেন। সিন্দুরে মার মুখ কপাল সব ভরিয়া আছে। আমি সব পরিষ্কার করিয়া দিলাম। জমিদার যোগেশবাবুর ছেলেরা মার দর্শনে আসিয়াছেন, আরও কয়েকজন আসিয়াছেন। যোগেশবাবুর ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওঁ’এর রূপ কি? কি ভাবে সাধন করিতে হয়? মা বলিলেন, “সব বিষয় সব সময় বলা হয় না, গুরু বলে দেন। আর এ সব অনুভবের জিনিষ, ইত্যাদি।” আজ মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। ২৫ পদ দিয়া ভোলানাথের ভোগ দেওয়া হইল। যোগেশবাবুর ছেলেরা মাকে তাঁহাদের বাড়ী একবার পদধূলি দিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন। ভোগের পর বেলা প্রায় ৩টায় যোগেশবাবুর নাতিটি মাকে নিতে আসিল। প্রায় ৪টায় মা সকলকে নিয়া যোগেশবাবুর বাড়ী গেলেন। দশভুজার মন্দিরে গিয়া বসিলেন। পরে মেয়েরা

মাকে ভিতরের উঠানে নিয়া গেলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ভ্রমণ ও কীৰ্ত্তন।

মাকে নিয়া গ্রাম ঘুরিবার জন্ত কীৰ্ত্তনের দল গিয়া অনেকেই তথায় উপস্থিত হইলেন সেই বাড়ী হইতেই বহুলোক মার সঙ্গে সঙ্গে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় জ্যোতিষদাদার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পথে অবনী শর্ম্মার বাড়ীও যাওয়া হইল। অবনীবাবু তাহার ভাইকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন মাকে যেন একবার তাহাদের বাস্তুভিটায়

নেওয়া হয়। তিনি কোন কার্যবশতঃ আসিতে পারিলেন না। আর একটি পণ্ডিত মহাশয় মাকে নিজের বাড়ীর নিকট নিয়া যাইবার জন্ত বিশেষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের মত না হওয়ায় সেই রাস্তায় না নিয়া মাকে অপর রাস্তায় নিয়া আসা হইল। পণ্ডিত মহাশয় মার কাছে খুব দুঃখ করিতে করিতে চলিলেন, “আমার বাড়ীর নিকট দিয়া গেলে একবার স্ত্রীলোকদের ও নাতিটিকে মার চরণতলে দিতে পারিতাম।” তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল পণ্ডিত মহাশয়ের নাতিটি রাস্তায়ই আছে— বাড়ীর মেয়েরাও মা যে রাস্তায় চলিয়াছেন সেই রাস্তারই এক-ধারে আসিয়া মাকে দেখিবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের মহা আনন্দ। তখনই নাতিটিকে মার চরণে প্রণাম করাইলেন এবং বলিলেন, “মা এই নাতিটির জন্তই আমি তোমাকে ঐ রাস্তায় নিতে চাহিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। পথে ক্ষিরোদবাবু (জমিদার) মাকে প্রণাম করিলেন। এইমাত্র তিনি গ্রামে পৌঁছাইলেন। সন্ধ্যার পর ক্ষিরোদবাবু মাকে নিজের বাড়ীর করুণাময়ীর মন্দিরে নিয়া গেলেন। ভক্তেরা কীর্তন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তথায় খুব কীর্তন করিলেন। ভোলানাথও খুব শ্রুতিয়া উঠিলেন। ৪৫ জন লোক কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবস্থায় পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া মা চলিয়া আসিলেন। আজ প্রফেসার গিরিজাবাবু ছেলের নিয়া আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছেন। ২ দিনের ছুটি পাইয়াছেন। সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতেছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥ মাকে জল খাওয়াইতে বসিয়াছি, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই মা হাততালি দিতে আরম্ভ করিলেন—“জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে, ও নাম বল বদনে শুনাও কাণে বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে”। মার মুখে এই নাম শুনিয়া সকলে এই নামেই কীর্তন আরম্ভ করিল। প্রকাণ্ড উঠান লোকে প্রায় ভরিয়া গিয়াছে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে কীর্তন করিতেছে! এখানেও ২৩ জন কীর্তনে পড়িয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা এবং সকলেই বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১৯শে মাঘ, সোমবার।

আজ জ্যোতিষদাদা মাকে ১০০ পদ দিয়া ভোগ দিবেন। শশীদাদা সব বন্দোবস্ত করিতেছেন। দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিনি সকলের সেবা করিতেছেন। প্রায় ১৫০ পদের আয়োজন করিয়াছেন। সকালে বিছানায় থাকিতেই গিরিজাবাবু মার সহিত কি কথা বলিতেছিলেন। মা বিছানায় বসিয়াই উত্তর দিতেছেন। গিরিজাবাবুর সহিত কীর্তনিয়া জ্যোতিষরুদ্ৰ আসিয়াছেন। কথা বলিতে বলিতে মা গান ধরিলেন—

- ১। মা আমারে দয়া কর।
- ২। উঠলরে রব মধুমাখা।
- ৩। এসব দেবতা তেত্রিশকোটি।

৪। কিবা চল চল রূপ।

৫। কি জাতি কি নাম।

৬। কে রে নূতন যোগী।

এই কয়েকটা গান করিয়া মা নাম উঠাইলেন—জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। সকলে যোগ দিল, খোল করতাল আসিল—খুব কীর্তন চলিল। মা বসিয়া বসিয়া ছলিয়া ছলিয়া হাত ছুলাইয়া নাম করিতেছেন, করাইতেছেন—চক্ষু জলে ভরা সে অপূর্ব রূপের দিকে চাহিয়া সকলেই মুগ্ধ। এর মধ্যে কিছু খাবার আসিল, মা সকলকে নিজ হাতে লুটাইয়া দিলেন। পরে জ্যোতিষদাদা আসিয়া মাকে বাড়ীর মধ্যের উঠানে নিয়া গেলেন। সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল। পরে মা চুপ করিয়া দাঁড়াইলে ভোলানাথ খুব মাতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল ও খুব মাতিয়া উঠিল খুব কীর্তন হইল। পরে একটি পণ্ডিত মার কাছে গীতাপাঠ করিতে চাহিলেন। গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। একাদশ অধ্যায় পাঠ হইল। পাঠের পরে পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, “মা আপনি যে অল্পগ্রহ করিয়া আমাদের দর্শন দিয়াছেন—ইহাতে গ্রাম ও পবিত্র হইল, আমরা ও পবিত্র হইলাম। আমাদের খুবই সৌভাগ্য।” মা হাতটী জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাবা মেয়েকে এই রকম বলিতে নাই, আমি যে তোমাদের মেয়ে।” তিনি বলিলেন, “মা, তুমি যে মা ও মেয়ে সবই তুমি, কোনটা তুমি নও? তবে আমরা যে তোমাকে মাতৃরূপেই দেখিতেছি।”

এই ভাবে কথা বার্তার পর কালী বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আসিয়া মাকে একবার কালী বাড়ী নিয়া যাওয়ার প্রার্থনা জানাইলেন, ভোলানাথ রাজি হইয়াছেন। বেলা প্রায় ১১টা বাজে মার মুখ পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নাই। পাঠের পর মার মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া হইল এবং একটু দুধ খাওয়াইয়া সকলে মাকে কালী বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখানে কিছু সময় বসিয়া মা বলিলেন, “বেশ সুন্দর সাধনার স্থান।” ঘণ্টের কাছে একটু অপরিষ্কার ছিল, মা তাহাও লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইহা কিসের মাটি?” তাহারা বলিলেন, “ইছুরের মাটি।” মা বলিলেন, “রোজ পরিষ্কার করিতে হয়। মা রোজ তোমাদের সেবা চাহিতেছেন। যাক্, মা সেখান হইতে উঠিলে, আরও বাসায় নিয়া গেলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সর্বদাই কথা উঠিলেই বলেন, “তোমরা

অথও ভাবে চিন্তা
না করিলে অথওকে
পাওয়া যায় না।

যতটুকু পার তাঁর জন্ম সময় দাও। অথও
ভাবে চিন্তা না করিলে অথওকে পাওয়া
যায় না।” কাল রাত্রিতে শুইবার পূর্বে

গিরিজাবাবু আবার ১৯২৪ সনে যখন মাকে তিনি প্রথম দেখিয়া ছিলেন, তখন একদিন যে সকলেই মার একটা শক্তির আভাষ পাইয়াছিলেন, সেই গল্প করিলেন। ইহার বাড়ী অষ্টগ্রাম—তাই অষ্টগ্রামের কথা ও উঠিল। এই অষ্টগ্রামেই মার প্রথম কীর্তনে ভাবের প্রকাশ হয়। ভোলানাথ সেই গল্প করিলেন। গিরিজা বাবু ও বলিলেন,

“আমি ত এসব কথা গ্রামে শুনিয়াছি।” ভোলানাথ বলিলেন একবার পাড়াপ্রতিবাসীর কথায় তিনি নিজের বাসায় কীর্তন দিয়াছিলেন—সকলে ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা বেলা কীর্তন আরম্ভ করিল। উঠানে চৌকীর উপর মেয়েরা ও মা বসিয়াছেন। কীর্তন আরম্ভ হইবার একটু পরেই চৌকির উপরেই মা পড়িয়া যান। অর্ধেক শরীর প্রায় চৌকীর বাহিরে ছিল। অনেক পরে ভোলানাথ খবর পাইয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে নিয়া শোয়াইয়া রাখেন। সারারাত কীর্তন চলিল। ভোরে সকলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া আবার কীর্তন আরম্ভ করিল কারণ মা এক ভাবেই পড়িয়া আছেন। মা বেলা প্রায় ৪টায় উঠিলেন। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করিতে লাগিলেন। এই প্রথম; দ্বিতীয় বারও ভোলানাথ সকলকে নিয়া বাসায় কীর্তন করিতেছিলেন এর মধ্যে গ্রামের একদল লোক কীর্তন করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া যোগ দিল। তাহাদের হাতে ধূপতি ছিল। ঘরের মধ্যে মা ভাবাবস্থায় পড়িয়া গেলেন—কিছুক্ষণ পরেই সেভাব কাটিয়া গেল। এরপর কীর্তনে যে ভাব হইত তাহা খুবই গোপন করা হইত। সকলে জানিতই না। আর একটি ঘটনা ভোলানাথ বলিলেন, যখন বাজ্রিতপুর হইতে ঢাকা আসেন তখন ঠাটারীবাজার ভোলানাথের ভাই সুরেনবাবুর বাসার নিকটে একটি আখড়া আছে। ভোলানাথ মাকে নিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় বাইতেন। একদিন মা মন্দিরের ভিতরে যাওয়ায় আখড়ার একটি লোক

মাকে বাহিরে আসিবার জন্য বলিতে গেল ; মা দরজায়
 অষ্টগ্রামে কীৰ্ত্তনে বসিয়া ছিলেন সেই লোকটি গিয়া দাঁড়াতেই
 প্রথম মার মা তাহার দিকে চাহিবা মাত্রই নাকি লোকটা
 ভাবাবেশ। “বাপরে বাপ আমি ইহাকে বাহিরে আসিতে
 বলিতে পারিব না” এই বলিয়া সভয়ে পিছাইয়া গেল। মা
 সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

কালী বাড়ী হইতে আসিয়া মা বিছানায় বসিলেন, কখনও
 কথা বলিতেছেন কখনও শুইয়া পড়িতেছেন। একটু পরেই
 তিনি মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায়
 দুইটায় উঠিয়া সকলের সহিত কথাবর্তা বলিতে লাগিলেন।
 ভোগ ও প্রস্তুত। মা ও ভোলানাথ উঠানের মধ্যস্থানে ভোগে
 বসিলেন। চারিদিকে ভক্তবৃন্দেরা প্রসাদ নিতে বসিয়া গেল।
 মা অনেককেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন “তুমি কোন
 জিনিষটি বেশী ভালবাস ?” যে যে জিনিষটার নাম করি-
 তেছে মা একটু নিজের থালায় রাখিতে বলিয়া তাহাকে সেই
 পাত্র সমেত দিয়া দিতে বলিলেন। সকলে আরম্ভ করিলে মা
 ভোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শশীবাবু ফটো তুলি-
 লেন—সকলেই খুব আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু দেখিতেছি
 মার খাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ভাবটাও যেন
 কেমন দেখিয়া ভয় হয়। কেমন যেন সবটাতেই বাহিরের
 ভাবে ও উদাস। খাওয়াইতে বসাইলে ও অতৃদিকেই চাহিয়া
 থাকেন, কি হইবে জানি না। খাওয়া দাওয়ার পর ভক্তরা

মাকে নিয়া বসিলেন। মা মধুর বাণীতে সকলকেই তৃপ্ত করিতেছেন। অনেক মেয়েলোকেরাই বলিতেছে, “কি করিব ঘরে যেন থাকিতে পারিতেছি না। তাই মার আর্কষণী-শক্তি। ছুটিয়া আসি।” ভদ্রলোকেরা কেহ কেহ বলিতেছেন, “এমন মূর্তি যেন আর দেখি নাই। কত লোকে ঔষধপত্র দেয়—তাই সাধুর কাছে কত লোক আসে—আর ইনিত কিছুই দেননা—তবু ও যেন শুধু হাসি ও কথায় এত মিষ্ট যে ছাড়িয়া যাইতে পারা যায় না।” দলে দলে আসিয়া কীর্তন করিতেছে—দিন রাত্রি আনন্দ চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায় :

—:০:—

২০শে মাঘ মঙ্গলবার।

আজও মা সকালে উঠিয়াছেন। আজ ছপুর্নে স্কুলের মাষ্টাররা সব ছাত্রদের নিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের প্রসাদ দেওয়া হইবে। মা সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। একটি মাষ্টার দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মা দয়া করিয়া আমাদের দর্শন দিয়াছেন। এখন আমরা মার প্রসাদ—মার হাতের প্রসাদ পাঠিতে চাই।” এত লোক কাজেই মার হাত ছোঁয়াইয়া ব্রাহ্মণেরা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। উঠানে সব ছেলেরা (প্রায় ১৫০) মাষ্টারেরা সব বসিয়াছে। মার সহিত তাহাদের ফটো তোলা হইল। সকলের পাতায় খিচুড়ী তরকারী দিতেই করুণাময়ী মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “সব বালক গোপালরা বসিয়াছে”— এই বলিয়া পাতা হইতে উঠাইয়া উঠাইয়া ছেলেদের নিজের হাতে মুখে দিয়া দিতে লাগিলেন। সকলে মহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সব ছেলেদের ও মাষ্টারদের মুখে দিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে লীলা করিয়া মা শেষে যেখানে মাষ্টারেরা খাটতে বসিয়াছেন সেখানে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। হাসিয়া হাসিয়া মাষ্টারদের বলিতেছেন

“তোমরা ছেলেদের মাষ্টার, একবার নিজের মনের মাষ্টারীটা কর।” একজন মাষ্টার বলিলেন, “মা সেটা যে পৃথিবী জয় করা অপেক্ষা ও কঠিন।” মা বলিলেন, “তবুও অভ্যাসেই সব হইয়া থাকে। যেমন আজ এই শিশুরা অবোধ অজ্ঞান কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করিতে করিতে ইহারাও একদিন জ্ঞানবান হইয়া যাইবে। তবেই প্রমাণ হইল চেষ্টা করিলে এই চঞ্চল মনের অজ্ঞানতাও দূর করা যায়।

যেমন ভিতরে অজ্ঞানের পর্দা আছে তেমন মনের চঞ্চলতা জ্ঞানের দরজা ও আছে।” একজন বলিল, অভ্যাসে দূর হয়।

“কিন্তু মা কিছুতেই সেই কাজ করিতে ইচ্ছা করে না।” মা বলিলেন, “ইচ্ছা না করিলেও তোমরা নিত্য নিয়মিত ভাবে কতকটা সময় তাঁহাকে দিও। আজ যেমন শিশুদের জোর কয়িয়া পড়িতে বসাইতে হয়—কিন্তু ক্রমশঃ যতই সে শিক্ষা লাভ করিবে ততই পড়ার দিকে তাহার আকর্ষণ বাড়িবে; শেষে এমন সময় আসিবে যখন সে নিজেই পড়া ফেলিয়া উঠিতে চাহিবে না। পরিক্ষায় পাশ করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তাহাকে আর বলিয়া বসাইতে হয় না। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার, আজ তোমরা অজ্ঞানের মধ্যে থাকিলেও নিত্য নিয়মিত চেষ্টার ফলে একদিন জ্ঞানবান হইতে পার।” এইভাবে কথাবার্তার পর মা গিয়া আবার পূজার মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। মাষ্টাররা প্রত্যেক ছেলেদের মার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন, নিজেরাও

দেবীভাবে মাকে প্রণাম করিলেন। কেহ কেহ দেবীর স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া মাকে প্রণাম করিতেছেন। একে একে সকলে বিদায় নিলেন। মা ছেলেদেরও বলিয়া দিলেন, “তোমরা একটু একটু ভগবানের নাম করিও।”

সেন পাড়ার মেয়েরাও আসিয়া সেইদিন প্রাতে মাকে নিজেদের বাড়ী নিয়া গেল। প্রায় ৮-১০টি সেই বাড়ীরই; তাহারা মাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইল। একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা মার কাছে ছুটিয়া আসে। সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। আজ প্রাতে সেন-বাড়ী হইতে আসিবার পর জ্যোতিষদাদা সেই বাড়ীরই একটি ভদ্রলোককে মার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, “ইনি বিলাত ফেরত খুব ভাল জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন।” সকলে মিলিয়া মার হাত দেখাইতে বসিল। সেই ভদ্রলোক মাকে প্রণাম করিয়া মার আদেশ নিয়া মার হাত দেখিতে বসিলেন, “এমন হাত জীবনে দেখি নাই। আমি হয়ত ১০১২ হাজার কুষ্টি করিয়াছি—হাত তো দেখিয়াছি ঠিকই নাই—কিন্তু এষে চতুঃসাগরী যোগ হাতে, আর ইহার ফলে কি না হইতে পারে? আমি কিছু জানি না, গুরুর ইচ্ছায় একটু কিছু কিছু বলি মাত্র। আমি দেখিতেছি মার চারটি গ্রহের যে যোগ আছে তার একটি গ্রহের কাজ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। চারি আনা মাত্র কাজ হইয়াছে, এখনও কিছুই না। সমস্ত ডুবাইয়াও জল উপরে উঠিবে। জ্যোতিষদাদা বলিলেন—“মার সাধন

ভজন কি দেখিলেন জগতের কোন উপকার হইবে কিনা ?
 তিনি বলিলেন, “সাধন ভজন কি বলিব ? ইনি তাহার অতীত।” জ্যোতিষদাদা বলিলেন, “লোকে বলে ইনি কালী সাধক”। জ্যোতিষী অবিনাশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, “কালীই আসিবে এঁর সাধন করিতে। আর জগতের উপকার এই মাত্র বলিতে পারি চৈতন্যদেব প্রভৃতিরও কিছু কষ্ট করিয়া জগতের উপকার করিতে হইয়াছিল, এঁর দেখিতেছি সে কন্সট্রিকুও করিতে হইবে না। এঁর সবই আপনা আপনি হইয়া যাইবে। যাকে বলে উপর থেকে পড়া। আমি জীবনে আর একটি মাত্র হাত এই রকম প্রায় দেখিয়াছি। তিনি মানস সরোবরে ঝুঁকেন। বয়স তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন ৩৫০ বৎসর তাঁর বিশিষ্ট এই যে তিনি যোগী, যোগ করিতে হইয়াছে। মার দেখিতেছি তাহাও এক বিচক্ষণ জ্যোতি-
 ষীদের মতে মা নাই। আমি কেতাবে যে সব চিহ্নের
 অদৃষ্টের উপরে সাক্ষাৎ কথা পড়িয়াছি মাত্র কাহারও হাতে
 ব্রহ্মবিজ্ঞা। দেখি নাই। আজ মার হাতে তাহা
 দেখিলাম। আমার গুরু বলিয়াছেন—“এই সব রেখা যাহার হাতে থাকিবে তিনি অদৃষ্টের উপরে,” এই ভাবে নানা কথা বলিয়া অন্যান্য সকলের হাত সামান্য দেখিয়াই অদৃষ্টের কথা বলিলেন। ঠিক জ্যোতিষীদের মত নয়, কেমন একটা ভাবে থাকিয়া সব বলেন। কিন্তু বলেন প্রায় ঠিক ঠিক। সকলের ভাবের কথাই বলিলেন, প্রায় মিলিয়া গেল। ইনিও খুব

সাধন করেন। গুনিলাম, বিলাতেও নিজের, শিব নিয়া গিয়াছিলেন ও রোজ পূজা করিয়াছেন। পরে আমাকে একান্তে নিয়া বলিলেন, “দেখুন, আমি মার কাছে এতদিন আসি নাই। গতকল্য আমি পূজা করিতে বসিয়া মাকে দেখিয়াছিলাম। আমি এমন জিনিষ আর দেখি নাই! এঁর হাতে যে সব রেখা আমি বুঝিতেছি ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞ। এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। তবে আমার এই ভয় হইয়াছে যে ইনি এই শরীর বেশীদিন রাখিবেন কি না। আপনাদের সকলের মাথার উপরেই সেই বিপদের চিহ্ন দেখিতেছি। তবে আজ মার শরীর রক্ষার জন্য আমারও চিন্তা, কাজেই আমি মাকেও এই কথা বলিয়া আলোচনা করিব।” সত্যই তিনি এক সময় একান্তে মার কাছে এ সব বলিলেন এবং মার শরীর রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মা বলিলেন, “যাহা হইবার হইবেই, তোমরা রাখিতে পার রাখ আমার ত সবই ভাল।” অবিনাশবাবু বলিলেন, “একটা সংঘর্ষই এই দেহ নষ্ট করিতেছে, তার পরিবর্তন না হইলে দেহরক্ষা কষ্টকর হইবে। আমরা উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “আমি ও মার কাছে যাইব, তখন আমার বিচারে যাহা হয় বলিব ও মার শরীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিব। অবশ্য আমাদের কি শক্তি, মার কাছে বসিয়া একথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র; তবুও মার অনুমতি নিয়াই মার হাত দেখিতে সাহসী হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।”

দিনদিনই বহুদূর হইতে মাকে দেখিতে লোক আসিতেছে। সন্ধ্যা-বেলায় কীর্তন ও খুব জমিয়া রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত চলিল। আজ জুট ১০।১২টা ধূপতি দিয়া মার আরতি করিল। সেই আরতিও দেখিবার জিনিষ। আরতি করিতে করিতে জুট যেন কেমন হইয়া যায়। আগুনের মধ্যে খেলা করে—কাপড় নিয়া একবার গলার ফাঁসি দিতেছে—একবার হাত বাঁধিতেছে—একবার নিজের সম্মুখে পর্দা দিতেছে—আবার সব উঠাইয়া কাপড় মাথায় দিয়া নাচিতেছে। মার কাছে আমি বসিয়াছিলাম—মা ধীরে ধীরে বলিলেন, “এই যে খেলা ইহারও অর্থ আছে—দেখ, প্রথম ধূপতি লইয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আরতি করিয়া স্তব্ধ হওয়ায় জ্ঞানের বাতি জ্বলিল—বাতি দিয়া আরতি করিল,

জুট কৃত আরতি
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

তখন ফুলের মত হইয়া সুগন্ধ বিলাইল, ফুল
দিয়া আরতি করিল। তখনও প্রারব্ধের
খেলা চলে—জীবন্মুক্ত অবস্থাই ধর না।

তখন বন্ধনে পর্দা নিয়া ইচ্ছামত খেলিতেছে। পর্দা টানান আছে, কিন্তু আলোও দেখা যায়। শেষে ঐ পর্দা নিয়া একবার নিজকে ফাঁসি দিতেছে, একবার হাত বাঁধিতেছে—কোমরে জড়াইতেছে। সর্ব্বশেষে সব পর্দা উঠাইয়া মাথায় দিয়া নাচিতেছে। মুক্ত হইল”! মা আরও বলিলেন, “এসব একদিকের সাধারণ ভাবে কথা বলা হইল”। আরতির এই গভীর অর্থ জুটকে শুনাইতে আমার ইচ্ছা হইল, কারণ জুট আরতি করিয়া খুব আনন্দ পায়। সকলেই তাহাকে আরতি

করিবার জন্ত আগ্রহ করিয়া নিয়া যায়। এজন্য মেডেলও পাইয়াছে, কিন্তু আজ আর জটুকে কিছু বলা হইল না। পরে চট্টগ্রাম গিয়া যশোদাবাবুর বাসায় বসিয়া জটুর সামনে এইসব কথা উঠিল—তখন মা সকলের কাছেই আরতির এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। যাক্ আজ রাত্রি প্রায় ১টায় মা বিশ্রাম করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভক্তেরাও বিশ্রাম করিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

—:০:—

২১শে মাঘ, বুধবার।

আজ চট্টগ্রাম ফিরিবার কথা। পটিয়া হইতে নিরঞ্জনবাবুর ভাই কৌশকীবাবু আসিয়াছিলেন, তিনি পটিয়া হইয়া চট্টগ্রাম যাইবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, তাই স্থির হইয়াছে। সকলে বেলা ১টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া মার সহিত সামপানে পটিয়া রওনা হইল। পঠৈকোড়ায় অনেকে চোখের জল ফেলিতেছেন। অনেকেই মাকে পুনরায় দর্শনের প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রামের লোক সকলে মাকে বিদায় দিতে একত্র হইয়াছে। গ্রাম অন্ধকার করিয়া মা পটিয়া রওনা হইলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পটিয়া পৌঁছিলেন। ঘাটেই মোটর ছিল, মার সহিত সকলে কৌশকীবাবুর বাসায় গেলেন। সেখানে উঠানে মার ও ভক্তদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে; ধীরে ধীরে অনেকেই মার দর্শনে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। একটি মুসলমান মুন্সেফ মার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছেন, “ভগবান পাওয়ার উপায় তাঁর নাম করা, কিন্তু যদি কাহারও তাঁর নামে রুচি না থাকে সে কি করিবে?” মা বলিতেছেন, “শিশুর মত অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাস করিতে করিতে অজ্ঞান শিশু যেমন

পণ্ডিত জ্ঞানবান হইতে পারে, তেমন তোমাদেরও অভ্যাসের ফলে জ্ঞানের পর্দা খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাবা প্রথম অন্ধ বিশ্বাস চাই, বিশ্বাসের কিন্তু চক্ষু নাই।” মুন্সেফবাবু বলিলেন, “কিন্তু যার বিশ্বাসও নাই ভক্তিও নাই—নাম করিবার রুচিও নাই—কিছুই নাই তাহার উপায় কি,” মা হাসিয়া বলিলেন, “বাবা যার মনে উপায় কি এই কথা জাগিয়াছে, তাহার কিছু আছে বলিতেই হইবে।” এই কথা বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।

নাম করিতে ইচ্ছা মুন্সেফবাবুও মার এই কথা মানিয়া লইলেন।
 না করিলেও বুদ্ধি তাহারপর কথা হইতেছে—তিনি বলিলেন,
 যেন মা ও অহঙ্কার “মা, আমিও কিছুই করিতে পারি না এ
 যেন বাবা—এই কাজও ত’ তিনি করাইলে করিতে পারিব।”
 দুইয়ের সাহায্যে মা বলিলেন, “দেখ, যতটুকু শক্তি দিয়া
 নাম করার চেষ্টা দরকার। তোমরা সব কাজ কর, সেই শক্তি টুকু দিয়াই
 তাঁর নাম টুকুও করিতে চেষ্টা করিও। আমি বলি কি বাবা”
 —এই বলিয়া আবার হাতখানি জোড় করিয়া বলিতেছেন,
 “আমি ত কিছু বলিতে পারি না, তোমরা যাহা বলাইতেছ তাই
 বলিতেছি। বুদ্ধি যেন মা, অহঙ্কার যেন বাবা, এই মা বাবার
 সাহায্যে তোমরা সব কাজ করিতেছ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই
 দুইটার খেলা তোমার মধ্যে চলিতেছে, ততক্ষণ এই দুটির
 সাহায্যেই তোমার তাঁর নামও করিতে হইবে। ঐদিকে
 যাওয়ার একটু চেষ্টাও করিতে হইবে। দেখ আমার পাগলের
 মত উল্টাপাল্টা কথা—আমি বলি কি এই যে ইচ্ছা করে না

তবুও তাঁর নাম, তাঁর দিকে যাইবার সহায়ক কৰ্ম্মাদি করিতে হইবে এর জন্ত একটা তাপ হয়, এই তাপ সহ্য করার নামই তপস্যা ; তপ+সহাঃ=তপস্যা। আর সাধন অর্থ হইল স্ব+ধন ; যে ধন আর ক্ষয় হয় না—তাকে পাওয়ার যে চেষ্টা।”

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মুন্সেফবাবুও মার কথা শুনিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, “আচ্ছা, তাঁর দয়ায়ই সব হয়, কি আমার কৰ্ম্মফলে সব হয়।” মা বলিলেন, “দয়া ও কৰ্ম্ম কি রকম জান, (একটি ফুল হাতে নিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন) যেমন এই ফুলটি আমি তোমাকে দিতে গেলাম আর, তুমি হাত বাড়াইয়া ফুলটি নিলে। এই ভাবেই দয়া ও কৰ্ম্ম মিলিয়া একটি কাজ হইল। এই রকম আর কি।” আবার মনের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন,

“মন যেমন চঞ্চল, আবার তেমনি সাধক। দেখনা সে শুধু আনন্দ চাহিতেছে তাহা না পাইয়াই সে দয়া ও কৰ্ম্মফলের সমাধানের সহজ উদাহরণ। ছুটাছুটি করিতেছে। আবার সে যে আরও অখণ্ড আনন্দের স্বাদ জানে তার প্রমাণ সে অখণ্ড আনন্দই চাহিতেছে ;

কত ভাবে সে খণ্ড আনন্দ পাইতেছে কিন্তু তাহাতে তাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, সে তৃপ্ত হইতেছে না। সে চায় অখণ্ড আনন্দ তবেই দেখ মহা সাধক ও বটে।” মার এই কথা শুনিয়া হাকিমবা খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নীরোজবাবু ডাক্তার কালীবাড়ীতে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেখান হইতে মাকে নেওয়ার জন্য লোক আসিল। মার কথা কেহ শুনিতো পাইবে না বলিয়া মাকে যাইতে দেওয়া হইল না। কিন্তু করুণাময়ী মা কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই একটু পরেই যখন মাকে জল খাওয়াইবার জন্য উঠাইয়া আনা হইল, তখন বলিলেন, “দ্রুণ কটায়?” কৌশকীবাবু বলিলেন, ‘৭টায়’। মা বলিলেন, “যদি সময় থাকে চল একটু কালীবাড়ী হইয়া আসি”। তখনই মোটরে করে ভোলানাথ, মা, আমি, জ্যোতিষদাদা ও কৌশকীবাবু কালীবাড়ী গেলাম। আর সকলেই রহিলেন।

মা এককে নিয়া অল্প সময় পাঠের কাছে গিয়া মা বসিলেন,—
আছেন তাই পাঠক কৃষ্ণানন্দজী তখন বলিতেছেন, তাঁর
আনন্দময়ী।

মুখী হইয়া থাকিলেই আনন্দ, এই দেখ তার
প্রমান এই আনন্দময়ী মা, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তাঁর মধ্যে
কোন অভাব নাই—তাই তিনি আনন্দময়ী। হাজার হাজার
লোক তাঁর কাছে গেলেও আনন্দ পাইতেছেন—কারণ তিনি যে
আনন্দময় হইয়া গিয়াছেন। ‘এক’কে নিয়া আছেন—তাই এক
হইয়া গিয়াছেন। দুইয়েতেই অভাব কষ্ট। একে আর কোন
অভাব নাই ইত্যাদি ইত্যাদি”।

পাঁচ সাত মিনিট থাকিয়া মাকে নিয়া আবার কৌশকীবাবুর
বাসায় আসা হইল। মা বসিয়া আছেন। হঠাৎ দুইটি মেয়ে
আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তার মধ্যে একটি মেয়ে

আসিয়াই কোলে গুইয়া মাকে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, “আমাকে আপনার মেয়ে করিয়া নিলেন না? এমন ভাবে আসিয়া মেয়েটি মাকে ধরিল যেন কতদিনের পরিচয়। মেয়েটির বয়স ১৫ বৎসর। পরিচয়ে জানিলাম, মেয়েটি ওখানকার পোষ্ট-মাষ্টারের মেয়ে,—সাধন ভজন করে। তার বাপ, মা কেহই মাকে দেখিতে আসে নাই—মেয়েটিই ছুটিয়া আসিয়াছে। কাঁদিয়া আকুল। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম “নিরু”। মা বলিলেন, “যাইবে আমার সঙ্গে, চল”। মেয়েটি বলিল, “মা, বাবা যাইতে দিবেন না”। মা কৌশকীবাবুকে বলিলেন—“ওর বাবাকে বলিও যদি ইচ্ছা হয় ওকে নিয়ে যেন কক্সবাজার একবার যায়।” আমাদের কাছে, পরে বলিলেন, “এইসব মেয়ে যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে বেশ সুন্দর একটা ভাব প্রকাশ পায়। মেয়েটির ভাব খুব ভাল। আর ইহাও দেখা যায়, যাহারা উন্নত হয়, ছোটবেলা হইতেই তাহাদের একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ পায়। একবার সংসারে ঢুকিলে পরে

ছাড়াইতে মুশ্কিল হয়। আর সংসারে
 সংসারে শান্তি
 পাওয়ার আশা ভুল।
 শান্তি পাওয়ার আশাও ভুল, ক্ষণিক একটু
 আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে মাত্র।”

যাক্ মার রওনা হইবার সময় হইল। মা ষ্টেশনে যাইবার পথে আবার মুন্সেফবাবু আসিয়া মিলিলেন। মাকে বলিলেন, “আমাকে কিছু একটা বলিয়া যান। যেন আমি চিরদিন মনে রাখিতে পারি! বাণী কিছু বলুন”। মা

বলিলেন, “তুমি মনে করিও আমার মঙ্গল হইবে।” মার এই কথায় তিনি আনন্দ পাইলেন ও মার চরণধূলি নিয়া রাস্তা হইতেই বিদায় নিলেন। মা মোটরে ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। একটু পরেই দেখি মুন্সেফবাবু বিদায় নিতে পারেন নাই—গাবার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গাড়ী আসিল—মা গাড়ীতে উঠিলেন। এর মধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চিন্তাহরণ সমাদ্বারের (মার পুরান ভক্ত) মেয়ে আসিয়া উপস্থিত। মার খবর পাইয়া সে দৌড়াইয়া মার দর্শনে আসিয়াছে—তাহার একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। পরৈকোড়ায় গঙ্গা-চরণবাবুর ভাই সুরেনবাবুর মুখে মার আগমন বার্তা পাইয়া অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাংকে কালীবাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। খবর পাইয়া অনেকেই আসিয়াছিলেন। কথা হইল, আগামী কল্যাই ৮টায় ষ্টীমারে কক্সবাজার যাওয়া হইবে। আজও রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িলেন। আমরা সকলে শুইয়া পড়িলাম।

পঞ্চম অধ্যায় :

—:0:—

২২শে মাঘ, বৃহস্পতিবার ।

আজ প্রাতে মাকে একবাসায় নিয়া গেল । মা কিরিয়া আসিয়াছেন—ভক্তেরা সব আহাৰ করিতে বসিয়াছেন, অনেকেই দর্শন করিতে আসিয়াছেন । প্রায় ৮টায় উপেন্দ্র পালের মোটরে মা কক্সবাজার রওনা হইলেন । অনেকেই সঙ্গে আসিয়া মাকে ষ্টীমারে ভুলিয়া দিয়া গেল । গণেশ, রমেশ, হীৰু প্রভৃতি ছেলেরা সঙ্গে আসিতে পারিবে না—সীতাকুণ্ডে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ছিল । হীৰু বলিতেছে—“মা, আমাদের মনে রাখিও ।” একজন বলিল, ‘মা কখনও ছেলেদের ভোলে না ।’ রমেশ বলিল, “কখনও কখনও ভুলিয়া যায়, নতুবা ডাকিতে হয় কেন ? মা হাসিয়া বলিলেন,—“সেটাও কৰ্ম্মক্ষয় করাইবার জ্ঞান । আর দেখ, যদি এই কাঁদাকাটি না থাকিত, তবে এই কান্নার ভাবটাই বা প্রকাশ হইত কি করিয়া ? কান্নার অবস্থাটাও ত প্রকাশ হওয়া দরকার । সেও মানুষের একটা প্রকৃতি আছে । আর মনের ভাবটা এক এক সময় এমন থাকে যে কান্নাও আসে না—অথচ একটু কাঁদিলেই বুকেটা হালকা হয় । একটু হালকা না হইলে চোখে জল ও আসে না । কাজেই সবটাই

দরকার। তবে আমার কথাতো জানই। শরীরটার কথা
ও খেয়াল থাকে না।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কক্সবাজারে অষ্টমী বেলা প্রায় ৫টায় আমরা কক্সবাজারে
তিথিতে আগমন; পৌঁছলাম। ষ্ট্রিমার হইতে নামিয়া
পূর্বেই মা ‘অষ্টমী
অষ্টমী’ বলিয়াছেন। সাম্পানে ক্লান্তিকটা বাইতে হয়। বন্ধিন

বাবু সাম্পান নিয়া আসিয়াছেন। সাম্পা-
নের মধ্যে বসিয়া মা বলিতেছেন, “আজ কি তিথি?” সকলেই
বলিলেন, “অষ্টমী।” মা হাসিয়া বলিলেন, “কয়দিন যাবতই
অষ্টমী, অষ্টমী বাহির হইতেছিল। সেই অষ্টমীতেই আসা
হইল।” তখন আমাদের মনে পড়িল সত্যিই যখন কক্সবাজার
কবে যাওয়া হয় ঠিক নাই—নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি
চলিতেছে—সেই সময়টাতে মার মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে অষ্টমী,
অষ্টমী শব্দটা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বেশী খেয়াল
করি নাই কারণ এমন কত কথাই মার মুখ হইতে বাহির
হয় বাহার অর্থ আমরা কিছুই ধরিতে পারি না। এখন
অষ্টমীর অর্থ বাহির হইল। একটু পরেই আমার দিকে
চাহিয়া বলিলেন, “১৫দিন।” কি ১৫দিন বুঝিলাম না।
ঘাটে পৌঁছিয়া দেখি বন্ধিমবাবুর বন্দোবস্তে ২টি হাতী ও
কৌর্গনের দল মাকে নিবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে। দীনবন্ধুবাবু
(উকিল) এবং মুন্সেফবাবু এবং আরও অনেক ভদ্রলোকেরা
দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়া হাতী দিয়া মাহুত মাকে
সেলাম দেওয়াইল। মা চলিলেন। আগে আগে হাতী

২টি ও কীৰ্তনের দল, মধ্যস্থানে মা, পিছনে ভক্তের দল চলিয়াছে। দীনবন্ধুবাবুর বাসার কালী দর্শন করিয়া মাকে নিয়া সমুদ্রের ধারে ইন্দু দত্তের খালি বাড়ীটায় যাওয়া হইল। সেখানে বঙ্কিমবাবু মার জন্ত তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছেন। মা গিয়া তাঁবুতে বসিলেন। অনেকক্ষণ কীৰ্তন হইল। তারপর মা একটু জল খাইলেন, অত্যাশ্র সকলের খাওয়া দাওয়া হইল। বঙ্কিমবাবু, নাজিরবাবু প্রভৃতি সকলেই মার সঙ্গী লোকদের যথেষ্ট বস্ত্র করিতে লাগিলেন। সকলের খাওয়া দাওয়া হইল। মা ও অত্যাশ্র সকলেই তাঁবুতে শুইয়া পড়িলেন। জটু ও আরও কয়েকটি ছেলে সঙ্গে আছে।

২৫শে মাঘ, শুক্রবার।

আজ ভোরে উঠিয়াই মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলেন। বতদূর দৃষ্টি চলে খোলা জায়গা! সঙ্গে জ্যোতিষদাদা, অখাণ্ডানন্দ, রণ প্রভৃতি কয়েকজন আছেন, (রণ জ্যোতিষদাদার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক মাস আছেন।) মা কিরিয়া আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া শুইয়া পড়িলেন। নানা কথার পর মা চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। দুপুরবেলা মা উঠিলেন। অনেক মেয়েরা মায়ের দর্শনে আসিয়াছেন। মা তাহাদের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া নানা কথা বলিতেছেন। কখনও ছুটানী ও করিতেছেন! সকলেই মুগ্ধ। যোগেনবাবু উকিলের স্ত্রী, বিপিনবাবু, রায়বাহাদুরের স্ত্রী সবাই আসিয়াছেন। যোগেনবাবুর স্ত্রী, পুত্রের জন্ত বড়ই ব্যাকুলা—তার বড় পুত্রটি জেলে

আছে। তিনি বলিতেছেন, “মার কাছে এই দুঃখের কথা বলিব বলিয়া বাড়ী হইতে ভাবিয়া আসি, কিন্তু মার তাঁবু যখন দেখা যায়, তখন হইতেই বুকটা যেন ঠাণ্ডা হইয়া যায় : আর কোন কথাই মাকে বলিতে পারি না। আবার যখন বাসায় ফিরিয়া যাই, রাত্তা হইতেই আবার পুত্রের জন্য বুকের মধ্যে কেমন করিতে থাকে—আমি বুঝি না কেন এমন হয়।” বৈকালে মা সকলকে নিয়া আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। কীৰ্ত্তন হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিদায় নিলেন।

২৪শে মাঘ, শনিবার।

আজ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। গতকালের মত আজও দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। আজও রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। আজ ও কীৰ্ত্তন হইল। মুসলমান ভদ্রলোকেরাও সব মার কাছে আসিতেছেন। মার কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানাইতেছেন এবং মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন।

২৫শে মাঘ, রবিবার।

আজ মা ভোরে সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিয়া মুখ ধুইয়া একটু দুধ খাইয়া আবার জ্যোতিষদাদাকে নিয়া বাহির হইয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গেলেন। তথা হইতে রামবাবুর বাসা ও বঙ্কিমবাবুর বাসা, সরস্বতী-মন্দির হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কথা হইল আজ সন্ধ্যায় রামবাবুর (ফরেষ্ট

অফিসার) বাসায় সন্ধ্যায় কীৰ্ত্তনে মাকে তথায় নিবেন। তাঁর স্ত্রী রোজই প্রায় মার কাছে আসিতেছেন। দিনে মা একটু শুইয়াছিলেন, সন্ধ্যা হইতেই সকলে মাকে নিয়া রামবাবুর বাসায় গেলেন। সামিয়ানার নীচে মাকে বসাইয়া কীৰ্ত্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১০টায়ে কীৰ্ত্তন শেষ হইলে সকলে মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় ১২টার মা শুইয়া পড়িলেন। মার ভাবের পরিবর্তন চলিতেছে। আজ দুপুরে কি খাইবার কথা গিয়া আমি বলিতেই, মা বলিয়া উঠিলেন, “খাইব না, খাওয়া আরও কমিয়া যাইবে, সব ওলট-পালট হইবে।” এমন হঠাৎ কথাটা বলিলেন যে আমি ভয় পাইয়া গেলাম। আবার বলিয়া উঠিলেন, “পরি-রুক্সবাজারে অবস্থিতি; বর্তনের সময় আসিতেছে”। কি ভাবের পরিবর্তন। হইবে জানি না। বাস্তবিকই দেখিতেছি আহাৰ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ভাবটাও কেমন যেন ছাড়া ছাড়া—কখনও এমন চুপ থাকেন অথবা ২৪টি কথা কখনও বলেন, তাহাতেও যেন মনে হয়, কথাগুলি একেবারেই বাহিরে, তিনি যেন কোথায় আছেন। যদিও এ ভাব তাঁর স্বাভাবিক, তবুও এখন যেন ব্যবহারের ভিতর বেশী ফুটিতেছে। যাক্—তাঁর ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া বাতুলতা। ২৬শে মার্চ, সোমবার।

আজও সকালে মা জ্যোতিষদাদাকে নিয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। আজ ফিরিতে অনেক-

বেলা হইল। যোগেনবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় ৯টায় মা ফিরিলেন। সকালে একটু দুখ খাইলেন—আজ বলিতেছেন কিছুই খাইবেন না। যোগেনবাবুর সহিত নানা কথা হইতেছে। শঙ্করানন্দ স্বামী, জ্যোতিষদাদা বসিয়া আছেন। পরৈকোড়া হইতে অবিনাশ সেন মহাশয় ও আসিয়াছেন। আসিয়া বলিতেছেন, “২১ দিনের পরিচয় মার সঙ্গে কিন্তু কিছুতেই বাড়ী থাকিতে পারিলাম না—চলিয়া আসিয়াছি।” গুনিয়াছি ইনি বড় চাকুরী করিতেন, এখন সব ছাড়িয়া ধর্ম কন্মেই জীবন কাটাইতেছেন। বিলাতেও নাকি শিবটি নিয়া গিয়াছিলেন; রোজই শিব পূজা করিয়াছেন। সি, আর, দাসের পরিবারে (রাখাল দাসের মেয়ে) বিবাহ করিয়াছেন। যাক্ অবিনাশবাবুকে পাইয়া সকলেই ভবিষ্যত গণাইতেছেন। বেশ বলিতে পারেন। তিনিও বসিয়া আছেন। যোগেনবাবু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী; তিনি বলিতেছেন, “আমাদের উপায় কি?” ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথার পরে মা বলিতেছেন, “তোমার ভেতরেই যে সব আছে। দেখ, তুমি খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত হইতে পারিতেছ না। অখণ্ড আনন্দের স্তম্ভ ছুটাইয়া দিতেছ।” যোগেনবাবু বলিতেছেন, “কেন, আমরা কখনও কখনও সাংসারিক ব্যাপারেও আনন্দ পাই।” মা বলিলেন, “তাহা খণ্ড আনন্দ। তবে খণ্ডের ভিতরে ও আনন্দ আছে। গাছের ছায়া দেখিলেই বুঝিতে হইবে গাছ আছেই। দেখ, আনন্দ ও কেমন সুন্দর ভাবে থাকে, কখন ও আনন্দ ছাড়া হয় না।”

আনন্দ কখনও ছাড়িয়া কখনও থাকে স্মৃতির উপর, কখন যায় না, স্মৃতি রূপেই বা আনন্দের স্বরূপেই। যখন নিরানন্দ সত্য রূপেই হউক। বোধ হয় তখনও স্মৃতির মধ্যে আনন্দ থাকে, তাই তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হও। তবেই দেখ কখন ও আনন্দ ছাড়িয়া যায় না ছায়ারূপেই ভাস্কর্য্য কি সত্যরূপেই থাকুক। আবার দেখ অনন্ত সমুদ্রের ঢেউ অতন্ত, সমুদ্রের ভিতরে অচল, অটল—সেই অচল অটলের উপর আবার তরঙ্গ স্থির না হইলে তার উপর খেলা হইতে পারে না।” উকিলবাবু বলিলেন, “আচ্ছা উকিলদের উপায় কি? আমরা ত সবদাই মিথ্যা দিয়া সত্যকে ঢাকিয়া ফেলি।” মা হাসিয়া বলিলেন, “মোটাই মিথ্যা নয়। আজ হয়ত মিথ্যা মোকদ্দমায় একজন একজনের একটা বাড়ী নিয়া গেল; বুঝিতে হইবে একসময়তে সেও তাহার কিছু করিয়াছিল—তাহারই ফলে ইহা হইল। অথবা যাহা করিল, তাহার ফল ভবিষ্যতে হইবে। কাজেই এই মিথ্যার মধ্যেও সত্য নিহিত আছে। মুন্সিল হইতেছে, আমরা মনে করি মিথ্যা এবং পাপ ইত্যাদি। সত্য মিথ্যা বোধেই হচ্ছে পাপ পুণ্য। কিন্তু বাস্তবিক যখন এ বোধ চলিয়া যাইবে, তখন আর সত্য মিথ্যা কিছু করিতে পারিবেনা। একুল ওকুল দুকুলই যাইবে।” এই বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন,—“বাবা, এতদিন ত এত মোকদ্দমা করিলে, এখন একবার নিজের এতবড় মোকদ্দমাটির কিছু ব্যবস্থা করত! কাঁচা চুলতো পাকা হইল—দন্ত ত বেদন্ত

হইল”। এই বলিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আবার বলিতেছেন, “টাকা পরস্য ত কতই রোজ্জকার করিয়াছ—ধন বলিলেই নিধনও আছে। যাহা হারায় না তাহাই স্বধন। সাধন মানেই স্বধন।” উকিলবাবু বলিলেন, “আমার ত মনে হয় সেই ধন আমি হারাইয়াছি।” মা বলিলেন, “এই যে হারাইয়াছি’ এই ভাবটি আছে, তাহাতেই বুঝিতে হইবে হারায় নাই, আছে। অথও ভাবটি কখনও যাইতে পারেনা—তাই খণ্ডে স্থায়ী আনন্দ পাইনা—অথও চাহিতেছি। ‘স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভরাবহঃ,—এ কথাটি কিনা, যে ধর্মে অভাব জাগায় তাহাই পরধর্ম—তাহা ত্যাগ কর, আর স্বধর্মে নিধনও ভাল অর্থাৎ এই দিকে আসিয়া নিধন হওয়াও শ্রেয়ঃ। যাহার কাছে হয় ভার দেও, এখন আর সময় ত নাই।” উকিলবাবু বলিলেন “অহঙ্কার যে বাধা দেয়। কাহার কাছে দিব ঠিকও পাই না, দিতেও পারি না।” মা বলিলেন, “যদি একজনই সব হয়, তবে যাহার কাছে দেও—তাহাকেই দেওয়া হইবে।” তিনি বলিলেন, “সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন আর হিসাব নিকাশ হইবে না।” মা বলিয়া উঠিলেন, “কেন হবে না? তোমরা নিরাশ হও কেন? কোন্ মুহূর্তে কাহার কি হয় কে জানে? এইক্ষণ কেন বলনা—‘এই ধরিলাম;’ ‘কাহারও উপর ভার ছাড়িলাম’ বলিও না। একটা কিছু ধর; দেও বন্ধন ছিঁড়িয়া তবেই দেখিবে এই ভাবে বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে।”

যাইবে”—এই বলিতে বলিতে নিজের

গায়ের নূতন জামাটি টান দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। উকিলবাবু তখনই এক টুকরা ছেঁড়া জামা নিয়া বলিলেন, “আজ কিছু চাহিতে ছিলাম—এই আমি পাইলাম।” অনেকেই এক এক টুকরা জামা নিলেন। মা আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “খুকুনী দেখ্, জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।” সকলের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “ও সব গুছাইয়া রাখে আমি ত এমন পাগলামী করি,।” আবার বলিতেছেন, “যে দিন যায়, সে দিন আর আসে না; তিলে তিলে শেষ হইতেছে।” এইরূপ নানা কথার পর যোগেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন। মা শোঁচে গিয়াছেন, আজ খাওয়ার দিন নয়। আমি বলিলাম, “মা, হরিমোহন (চাকর) ভাল রুটি করিতে জানে।” মা বলিয়া উঠিলেন, “তাই নাকি, আমি আজ রুটি খাইব, আর কিছুই এখন খাইব না।” প্রায় ২১০ কি ৩ বৎসর পর আজ মা একদিন পর পর খাওয়া ভাঙ্গিয়া রুটি খাইলেন। খাইতে বসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, “২ বৎসর পর রাজার হাতে খাইয়া একদিন পর পর খাওয়া কিছু ভাঙ্গিয়া ছিলাম, ফল দুখ খাইতাম। আজ চাকরের হাতে সেইটাও ভাঙ্গিয়া ৩ বৎসর পর রুটি খাইলাম।” খাওয়া দিনদিনই কমিয়া যাইতেছে। খাওয়া দাওয়া করিয়া মা একটু শুইলেন। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছে—বেলা প্রায় ৩টায় মা মুখের কাপড় ফেলিয়া বলিলেন, “খুকুনী কই?” আমি নিকটে গেলাম,—বলিলেন, “শরীরটা যেন কেমন হইয়া যাইতেছে”—এই বলিতে বলিতেই

বাবাকে দেখিয়া দুঃখীমণী করিয়া বলিতেছেন, “নাড়িটা দেখ তো!” বাবা নাড়ী দেখিয়া বলিলেন “ভালই।” মা বলিলেন, “সত্যি?” বাবা হাসিয়া বলিলেন, “ডাক্তার কি সত্য বলে?”—একটু পরেই বলিলেন, “খুব দুর্বল চলিতেছে।” দেখিতে দেখিতে মা কেমন হইয়া পড়িলেন। সমস্ত শরীর যেন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার চোখে জল আসিল। সকলে কাছে আসিলেন। অসাড় ভাবে মা পড়িয়া আছেন। আজ বিরাজবাবুর বাসায় কীর্তনে যাওয়ার কথা, ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়ার কথা ছিল। মার অবস্থা দেখিয়া কীর্তনের দল নিয়া তাঁবুতে আসিল। রাত্রিতে মা একটু উঠিয়া বসিলেন। কীর্তন হইল। মা স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। সকলে কথা বলানোর চেষ্টা করিতেছেন। আধ আধ ভাবায় বলিলেন, “শরীরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল আর কিছুই নয়।” জ্যোতিষদাদা সকলকে নিয়া কিছুক্ষণ হরিনাম করিলেন। রাত্রিতে মা জলটুকু ও খাইলেন না পড়িয়া রহিলেন সমস্ত রাত্রিটাই কেমন একটা অবস্থায় কাটিয়া গেল।

২৭শে মাঘ, মঙ্গলবার।

আজও বেলা প্রায় ১০টা পর্যন্ত মা শুইয়া ছিলেন। পরে উঠিয়াছেন, কিন্তু কিছুই প্রায় খাইতে চাহিতেছেন না। খাওয়া প্রায় বন্ধ। কোন প্রকারে একটু কিছু খাওয়ান হইতেছে। গতকল্য ২১০ বছর পর একদিন পর একদিন খাওয়ার নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আরও খাওয়া কমিয়া গেল। আজ সারাদিন

কিছুই প্রায় খাইলেন না। সন্ধ্যার পর সামান্য একটু খাইলেন। অতি ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন। আজ দুপুরে মেয়েরা আসিয়া বলিল, “মার কাল কি হইয়াছিল?” মা হাসিয়া বলিতেছেন, “কিছুই নয়, শরীরটা একটু ঘুমাইয়াছিল মাত্র। হাত পা গুলি ছাড়িয়া গিয়াছিল মাত্র, আর কিছুই নয়। আমিও কিছুই বলি না, খুকুনীই সকলকে ডাকিয়া একটা গোলমাল বাঁধাইয়াছে।” এই বলিয়া হাসিতেছেন,— কিন্তু সবই যেন কেমন ধীর, স্থীর। রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন, “গিরিজার কীৰ্তনে শরীরটা দেখ কেমন হয়। সে বলে ‘কিছুই নয়, চামড়ার উপর দিয়া যায়’—আমার তেমনই শরীরে কিছু আঘাত পাইলে “যেন চামড়ার উপর দিয়া যায়।” আজও রাত্রি প্রায় ১১টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

২৮শে মাঘ, বুধবার।

আজও মা অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। কিছুই খাইবেন না বলিতেছেন। খাইতে বসিলেই বলেন, “ভিতরে যায় না।” অপর দিকে পা মেলিয়া বসিয়া ছেলেমানুষের মত একটা কিছু নিয়া খেলা আরম্ভ করেন। এইভাবে খাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া বাইতেছে। আজ ভাত কি রুটি কিছুই খাইলেন না। একটু দুধ ও জলে তরকারী সিদ্ধ করিয়া দিলাম—তাহাই একটু খাইলেন। অনেক সময়ই মা এই সিদ্ধ খান। রাস্তায় যখন একা একা ঘুরিতেন, তখন ফল পাওয়া যাইত না, রুটিও হরতো

খাইতেন না; তাই বিরাজদিদিকে বলিতেন, “জলে একটু তরকারী সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইয়া দেও।” আমি এখনও মধ্যে মধ্যে তাহা খাওয়াইয়া দেই। ছপুরে মেয়েরা আসিয়াছেন—মা বলিতেছেন, “খালিমুখে বসিয়া থাকিতে নাই, নাম কর”। এই বলিয়া নিজেই ছোট করতালটি বাজাইতে লাগিলেন। নাম উঠাইলেন—“হরিবোল, হরিবোল”। আগাকে বলিলেন, “তুমিও বল”। তাই হইল। অনেকক্ষণ নাম হইল। আজ রটন্তী কালী পূজা। অবিনাশবাবু উপবাস করিয়াছেন। সমুদ্রের পার দাঁশু ও সত্যেনকে নিয়া গিয়াছেন। পূজা করিয়াছেন। গল্প শুনিলাম, তাহাদের তিনি কি করিয়াছিলেন। তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গিয়াছিল। দাঁশু মার সোণামূর্তির কোলে শুইয়া আছে দেখিয়াছে ইত্যাদি। রাত্রিতেও তিনি নিজের ঘরে বসিয়া পূজাদি করিলেন। কীৰ্ত্তনের পর মা একটু বাইরে পায়চারি করিতেছেন। অবিনাশ বাবু মাকে পূজা করিতে আসিলেন। মা সিঁড়ির উপর বসিলে তিনি মাকে পূজা করিলেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, “বাবা, তুমি নাকি সমুদ্রের পারে কি করিয়াছ? এখন ইহাদের একটু কর না?” অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, অবিনাশবাবু বলিলেন, “মা, আমি কি জানি—সবই তোমার ইচ্ছা”। মা বলিলেন, “তুমিও সমুদ্রের ধারে করিয়াছিলে, এখন কর।” তিনি তখন ৪৫ জনকে কাছে বসাইলেন। তার মধ্যে রণ ও এখানকার আর একটি ছেলের কপালে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া

দিলেন, চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন—কিন্তু কাহারও কিছু হইল না। তখন অবিনাশবাবু মার পা ধরিয়া বলিতেছেন, “মা, তুমি আমার সব নিয়া বসিয়া আছ; তাই কিছু হচ্ছে না। মা—আমি করিতে পারিতেছি না।” তখন মা বলিলেন, “এত লোক বসিয়াছে, ২।১ জনের একটু হওয়া দরকার”। —এই বলিয়া তুষ্টমী করিতেছেন। একটু পরে মা এখানকার কক্সবাজারে ছেলেটিকে বলিলেন, “তুমি আমার দিকে কাহাকে কাহাকেও চাহিয়া থাক”। সে তাহাই করিল। এক শক্তির আভাস মিনিট যাইতে না যাইতেই সে অজ্ঞানের মত দেওয়া। হইয়া পড়িয়া গেল। মা হাসিতে লাগিলেন। কিছু পরেই সকলে ছেলেটিকে ধরিয়া উঠাইয়া মাকে প্রণাম করাইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, “রণ বম্বুক,”—মাও সঙ্গে সঙ্গে তামাসা করিয়াই বলিতেছেন, “বম্বুক”। রণ আসিয়া মার পায়ের কাছে বসিল। মা বলিলেন, “আমার চোখের দিকে চাহিয়া থাক”, তাই সে করিল। একটু পরেই তাহার ধ্বাসের মত উঠিল, কাঁদা কাঁদা ভাব হইল, কিন্তু ঠিক মার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মা বলিলেন, “ওর শ্বাস বড় দ্রুত চলিতেছে, আর কাজ নাই, ওর বুক ভাল নয়। আর একটু থাকিলেই পড়িয়া যাইবে।” আমি ভাবিলাম—ইহারা ছেলেমানুষ আর সাদাসিধা তাই এইরূপ হইয়াছে; বলিলাম, “শশীবাবু বম্বুক—দেখিও কি হয়।” মা ছেলেমানুষের মত হাসিতেছেন—বলিলেন, “আচ্ছা”। শশীবাবু আসিয়া

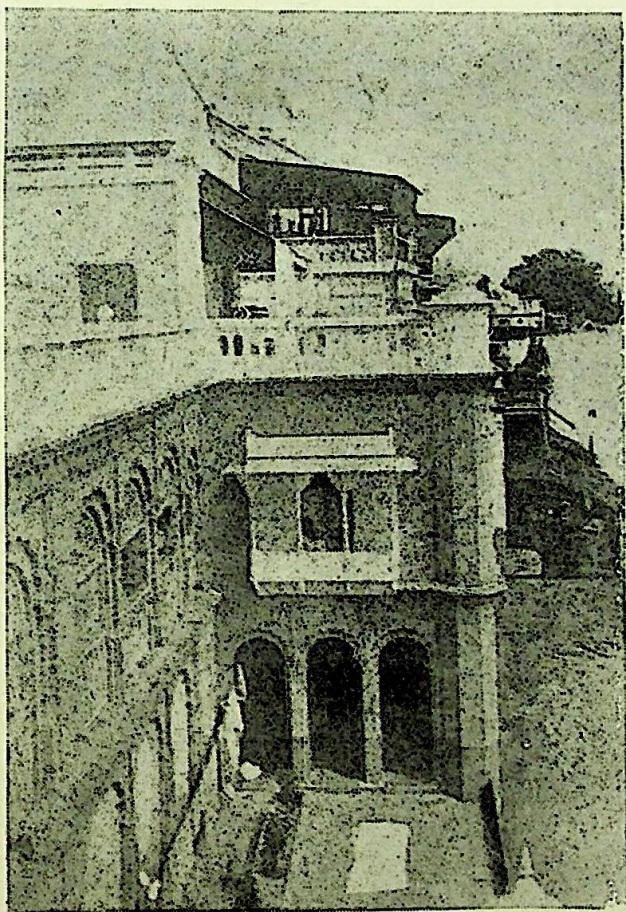
ঠিক হইয়া বসিলেন। মার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন। মা স্বাভাবিক ভাবে চাহিয়া আছেন। একটু পরেই শশীবাবু হাত উঠাইয়া চোখ ঘষিলেন। আবার চাহিয়া আছেন। একটু পরেই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কিন্তু চোখের পলক নাই; মার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন। তারপর পড়িয়া গেলেন। ২৩ জনে ধরিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পর তিনি স্থির হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। আর একজন ভদ্রলোক বলিলেন, “আমি আর বসিবনা, আমি দেখিয়াছি”। কি দেখিয়াছেন বলিলেন না। মা বলিলেন, “এই এক খেলা চলিয়াছে, কখনও কিন্তু এ খেলা হয় না—আজ বাবার (অবিনাশবাবু) কথায়ই আরম্ভ হইয়াছে”। আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “ইহা কিন্তু তোমরা যে কি বল ‘হিপ্পন-টিজাম’ তা নয়; ইহা ভিন্ন জিনিষ। আচ্ছা তোমরা বসিওনা—যার যার বিছানায় শুইবার সময় একটু বসিও, তবেই বুঝিতে পারিবে।” উল্লিখিত ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তুমিত কাল চলিয়া যাইতেছ; বৈশ, যেখানে যাও সেইখানেই একটু বসিও—তবেই বুঝিবে”। সে রাজী হইল। এইভাবে খেলা করিয়া মা বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল।

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজও মা সকালে বাহির হইলেন না। ছপুর্বে মেয়েরা সব আসিয়াছে। মা বলিলেন, “তোমরা সব একটু চোখ

বুজিয়া চুপ করিয়া বস দেখি।” সকলে তাই করিলেন। আজকাল মা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এইভাবে উপস্থিত সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে বলেন। পরে চোখ খুলিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা কে কি দেখিয়াছ? কাহার মনটা কোথায় গিয়াছিল ইত্যাদি”। আজও তাহাই হইল। পরে মেয়েরা কেহ কেহ গান করিল। আজ পুষ্পিতা মুখার্জি মুন্সেফবাবুর বাসায় কীর্তনে মাকে নিবেন। মা বিকালে একটু সমুদ্রে বেড়াইয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় মুন্সেফবাবুর স্ত্রী মাকে নিতে আসিয়াছেন। সকলে তথায় রওনা হইলাম। অবিনাশবাবু বলিলেন, তিনি যাইতে চাহেন না, একটু একান্তে বসিতে চাহেন। মা বলিলেন, “বেশ, তুমি থাক, বুড়ানা ও (চট্টগ্রামের সুরেন ঘোষাল মহাশয়ের মা, এবার মার সঙ্গে আসিয়াছেন) থাকিবে। একান্তে, এক+কান্ত’কে নিয়া থাক, ভালই ত”। মা সকলকে নিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় পৌঁছিতেই তাহার মার পা ধোয়াইয়া দিলেন। মাকে আসনে বসান হইল। প্রথমেই তার ১০।১২ বছরের ছেলেটি গান ধরিল,—

“শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে—ইত্যাদি।” পরে কীর্তন হইল। কীর্তনের পর মাকে মুন্সেফবাবুর স্ত্রী একটু জল খাওয়াইয়া দিলেন। সকলে প্রণাম করিল। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা সকলকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। প্রায় ২টার মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।



শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সেবাসদন
“ পীতকুঠী ”
হরিদ্বার ।

৩০শে মার্চ, শুক্রবার।

আজও মা অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। এখন খাওয়া-
দাওয়ার আর কিছুই নিয়ম নাই; যখন হয় কিছু খান—আজ
ফল খাইবেন, কি রুটি খাইবেন, সে সব কিছু নিয়ম নাই।
রুটি প্রায় খাইতেছেন না। কখনও একটু ফল, কখনও একটু
দুধ কি জলে তরকারী সিদ্ধ—এই প্রায় খান। আজও অনেক
বেলায় একটু খাইলেন। ছপুরে আজও সকলকে চুপ করাইয়া
বসাইলেন। পরে মেরেরা আসিলে নাম কীর্তন হইল।
আজ দেবেশ চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্তনে মাকে নিবেন স্থির
হইয়াছে। ইঁহার ৭৮টি সন্তান, সবই মারা গিয়াছে—শোকের
প্রায় পাগলের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মার কাছে আসিয়া
এইসব বলিয়া কাঁদিতে ছিলেন। মা বলিলেন, “ওমা, তুমি

শোকাক্ত রমণীকে
নিজে ছেলে-মেয়ে
হইয়া শান্তি দান।

কাঁদিতে পারিবে না, আমিই তোমার
ছেলে-মেয়ে।” সে এই গুনিয়া মাকে
জড়াইয়া ধরিল; একটু শান্ত ভাবে

মাকে নিয়া নানা ভাবে আদর করিতে
লাগিল। বলিতেছে, “বেশ, তুমি আমার ছেলেও মেয়েও;
আমি তোমার সঙ্গে চলিয়া যাইব।” এই বলিয়া সে
বেশ মা হইয়া বসিল, সেই ভাবেই কথাবার্তা বলিতেছে।
আজ কীর্তনে মাকে নিবেন। মা বৈকালে সমুজের ধারে
গিয়াছেন; সেখানে গিয়াও সকলকে চুপ করিয়া কিছু
সময় বসিতে বসিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কে

কি দেখিয়াছ?" 'সন্ধ্যার কিছু পরে মা তাঁবুতে ফিরিলেন। প্রায় ৭ টায় মাকে দেবেন্দ্রবাবুর বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে কীৰ্ত্তনের পর দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মাকে ভিতরের উঠানে নিয়া গেলেন, সেখানে রায়বাহাদুর বিপিনবাবুর স্ত্রী, যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, মোহিনী বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী সকলেই উপস্থিত আছেন। এই দেশের নিয়মানুসারেই আজ চন্দনাদি দিয়া দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মার নামকরণ করিলেন। তাহার মৃত ছেলে-মেয়ের নামানুসারেই নাম রাখিলেন। নানারকম খাবার তৈয়ার করিয়াছেন। মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। বিলাত হইতে তাহার ভাইয়েরা যে সব জিনিষ-পত্র পাঠাইয়াছে, তাহা মাকে দেখাইলেন। মাও ছোট মেয়েটি সাজিয়া বসিয়া মা, মা—বলিয়া নানাভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতেছেন। তিনি কিন্তু মাকে ছাড়িয়াই দিবেন না। আবার এক এক সময় মৃত সন্তানদের শোকে কাঁদিবার উপক্রম করিতেই মা বলিতেছেন, “তবে কিন্তু আমি চলিয়া যাইব। বলিতেছি যে আমিই আবার আসিয়াছি, আমিই তোমার মেয়ে আবার ছেলেও।” অমনি পাগল শান্ত হইয়া বলিতেছে, “আর আমি কাঁদিব না তুমি আর আমাকে ছাড়িয়া যাইও না”। এইভাবে খেলা করিয়া মা রাত্রি প্রায় ১২ টায় তাঁবুতে আসিয়াছেন। আজও প্রায় ২ টায় মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১লা ফাল্গুন, শনিবার।

আজও সকালে মা শুইয়া আছেন। অনেকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, মা উঠিয়াই তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। কিছু পরেই মার নূতন পিতামাতা (দেবেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী) আসিয়া একডালা ফল নিয়া উপস্থিত। তাহাকে নিয়া অনেকক্ষণ খেলা হইল। দুপুরবেলা তাহাকে কিছু খাওয়াইয়া মা বিদায় দিলেন। সে যাইবেই না—ভয়ানক রোদ্র উঠিয়া যাইতেছে; তাই মা বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আজ ভোরে ভোলানাথ ছেলেদের নিয়া আদিনাথ বেড়াইতে গিয়াছিলেন, বৈকালেই ফিরিয়া আসিলেন। জটুও আজ ঢাকা চলিয়া গেল। শশীবাবু চট্টগ্রাম চলিয়া গেলেন। শশীবাবুর ভ্রাতা জ্ঞানকীবাবু (ইনি পরৈকোড়ার জমিদার প্রসন্নবাবুর জামাতা) আজ কয়েকদিন যাবত মার কাছেই আছেন। শশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, “আপনি সেদিন মার দৃষ্টিতে ঐরূপ হইয়া গেলেন কেন?” তিনি বলিলেন, “প্রথম প্রথম আমি একটা নীল আলো মার চোখ হইতে বাহির হইয়া আমার ভিতর আসিতেছে দেখিয়া খুব আনন্দ পাইলাম। ভুল দেখিতেছি ভাবিয়া চোখে একবার হাত দিয়া ঘিরিয়া দিলাম; কিন্তু আলো আমাকে ছাড়িল না। শেষে এমন একটা উজ্জ্বল আলো দেখিতে লাগিলাম যে আমি আর চোখ ফিরাইতে পারি না, চাইতেও পারি না— আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, আর কিছু বলিতে পারি না।”

আজও বৈকালে মা সমুদ্রের ধারে প্রায় ৫টায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক। বলিতেছেন, “দাসুকে বলিলাম, আজ চাটগাঁ চলিয়া যা, সে গেলনা, বলিল, ‘বাবা আমাকে আদিনাথ যাইতে বলিয়াছেন,—তাই আমি আর কিছু বলিলাম না; কিন্তু এইসব ছেলেপিলেদের এইভাবে ঘোরাঘুরি করিতে দেওয়া ঠিক নয়।’” ভাবিলাম, মা দাসুর কথা কেন বলিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা ফিরিয়া আসিলে জানিলাম, দাসু ৩ বার পড়িয়া গিয়াছিল; অবশ্য বিশেষ কিছু হয় নাই। দাসুকে বলিলাম, “দেখ, মার দৃষ্টি থাকে”। আজ সমুদ্রের ধার হইতে ফিরিয়া মা ভক্তদের নিয়া বসিয়াছেন। কেহ কেহ ২৪টা গান করিলেন। আজ রাত্রি প্রায় ১১টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

২রা ফাল্গুন, রবিবার।

আজ সকালে মা বাহির হন নাই। বেলা প্রায় ১০টায় বাহির হইয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গেলেন, তথা হইতে দলবল নিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলেন। সেখানে খুব স্নান চলিল। মা ছেলেমানুষের মত কোমরে কাপড় জড়াইয়া দোঁড়াদোঁড়ি করিতেছেন। অনেক ছোট ছোট মেয়েরাও মার সঙ্গে জলে নামিয়াছে—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় মাও তাহাদের দলের একজন। মা সকলের গায় জল ছিটাইয়া দিতেছেন, যাহারা স্নান করিবেনা ভাবিয়াছিল, তাহাদেরও ভিজাইয়া দিলেন। অনেক কণ জল ক্রীড়া করিয়া মা উঠিয়

ককসবাজারে ভক্ত আসিয়াছেন। আমি কাপড় পরিবর্তন সঙ্গে সমুদ্র স্নান। করিয়া দিলাম। আমি পাড়ে বসিয়াছিলাম, স্নান করি নাই। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ মা বলিলেন, “সকলে স্নান করিল, তুমি যে করিলেনা? আমার খেয়াল ছিলনা”—এই বলিয়া খানিকটা জল ছিটাইয়া আমাকেও ভিজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, “যাও, স্নান করিয়া আইস”। আমি আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলাম। “মা সকলকে নিয়া তাঁবুর দিকে চলিলেন। বেলা প্রায় ২টার মার ভোগ হইল—পরে মেয়েরা সব আসিলেন। মা সকলকে কিছুক্ষণ নাম করাইলেন। পরে প্রায় ৬টার মা সকলকে নিয়া সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন; ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন। সকলের সঙ্গে বসিয়া আলাপাদি করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। পরে মা বিশ্রাম করিলেন। আজ দুপুরে তাঁবুর ভিতর একটি সাপ শঙ্করানন্দ স্বামীর বিছানার বসিয়াছিল। মা বলিলেন, “কয়দিন যাবতই সাপ গায়ের কাছে আছে বলিয়া মনে হইতেছিল।”

৩রা ফাল্গুন সোমবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা সকলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১১টা হইল। মা তখন সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন, বেলা প্রায় ২টার মা ফিরিলেন। তখন মার ভোগ হইল। মা শুইয়া উঠিবার পরই স্ত্রীলোকেরা সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুসেফবাবু প্রভৃতিও আসিয়াছেন।

আজ অবিনাশদাদা মেয়েদের কাছে কিছু বক্তৃতা দিবেন স্থির হইয়াছে। বেলা ৫টায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। মুন্সেফবাবুর স্ত্রী সভাপতি হইয়াছেন। অবিনাশবাবু মার তত্ত্বই সকলকে কিছু কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সকলেই সম্ভুষ্ট হইলেন। পরে বিপিনবাবুর স্ত্রী, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী মার আগমনে যে তাহারা ধন্য হইয়াছেন, মা অযাচিত ভাবে তাঁহাদের দয়া করিয়াছেন—এই সব বিষয় কিছু কিছু বলিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। মাকে যোগেনবাবু ব্রাহ্ম সমাজে নিয়া গেলেন। সেখানে ও মার সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক, পুরুষ চলিল। সমাজ ঘরটি ভরিয়া গেল। যোগেনবাবু বলিলেন, “মা, এইভাবে আমার ঘরটি কখনও পূর্ণ হয় নাই।” তারপর বিরাজবাবুর গান ও যোগেনবাবুর প্রার্থনা দি হইল। সন্ধ্যার পর সকলে ফিরিলেন। আজ জ্যোতিষদাদা বলিতে ছিলেন, কাশীতে যে তিনি জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে কথা হইতে মা বলিয়াছিলেন, “আমি সবই দেখিতে ছিলাম—যে তুমি যাইতেছ স্নান করিতে, জলে ঐ ভাবে পড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।” তাহাতে জ্যোতিষদাদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যদি আপনি সব দেখিতে পাইতেছিলেন, তবে বলিয়া দিলেন না কেন, শুধু বলিয়াছিলেন, সাবধান মত যাইও”। মা বলিলেন, “আমি সব দেখি ঠিকই, তবে সব সময় বলার খেয়াল হয় না—কারণ তাহা যে হইবারই, হওয়াত চাই।” ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিতে অবিনাশবাবুর

শাস্ত্র পড়া ও শেখার সহিত তাঁবুতে বসিয়া কথা হইতেছিল।
 ততক্ষণই দরকার কথায় কথায় মা বলিতেছিলেন, “শাস্ত্রাদি
 যতক্ষণ ঠিক কর্ম পড়ার ও শেখার ততক্ষণই দরকার যতক্ষণ
 আরম্ভ হয় নাই। পর্য্যন্ত কর্ম আরম্ভ হয় নাই। কর্ম একটা

ঠিক হইয়া আরম্ভ হইয়া গেলে আর পড়ার দরকার হয় না।
 যেমন টাইম-টেবিল দেখিয়া এবং শুনিয়া যখন ঠিক বুঝিয়া
 নিলাম ইহা দেয়াতুনে যাইবার গাড়ী, আর টিকিট কাটিয়া
 তথায় বসিয়া গেলাম—তখন আর কিছু শুনিবার দরকার নাই ;
 গাড়ী তোমাকে দেয়াতুন পৌছাইয়াই দিবে। তাই কর্মে
 লাগিয়া যাও।” এই সব কথাবার্তার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া
 হইতে বিনয় সেন (মুন্সেফ) আসিয়া পৌছিলেন। তিনি
 সরস্বতী পূজার ছুটিতে একদিনের জন্ম মার দর্শনে আসিয়া-
 ছেন। আজ রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শয়ন করিলেন।

৪ঠা ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ মা সকালে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। মুন্সেফ-
 বাবুর ছেলেমেয়েরা মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে, বড়
 ছেলেটি মার কাছে গান করিল—

আমায় জাগিওনা,—স্বপন যদি মধুর এমন হোক্ মিছে
 কল্পনা। ইত্যাদি—বেলা প্রায় ৮টায় মা বাহিরে আসিলেন।
 হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া একটু কিছু খাওয়াইয়া দিলাম।
 পরে মা সকলকে নিয়া সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন। আজ
 ছেলের দল মাকে থিয়েটার করিয়া দেখাইবে। বিরাজবাবুই

তাহাদের শিক্ষাদাতা। সন্ধ্যার পর ছেলেরা মাকে থিয়েটার দেখাইল। ছেলেদের মিষ্টি ও ফল দেওয়া হইল। আজ বৈকালে মাকে রায়বাহাদুর বিপিনবাবুর বাসায় নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তথায় দীনবন্ধুবাবু মাকে বলিলেন, “মা, যোগেনবাবু

তোমাকে ব্রাহ্মিকা করিয়া দিয়াছেন, মা চিরদিনই ব্রাহ্মিকা।

কাল ব্রাহ্ম সমাজে নিয়া গিয়াছিলেন।”

মা হাসিয়া বলিলেন, “আমাকে আবার করিবে কি? আমি ত ছিলামই।” এই কথায় সকলেই আনন্দ পাইলেন। সেখানে সকলেই একত্র হইয়াছেন, গান হইল, পরে তাহারা মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। প্রায় ২ঘণ্টা তথায় থাকিয়া মা সকলকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। পরে থিয়েটার হইল— ‘ধ্রুব’। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিলেন।

৫ই ফাল্গুন, বুধবার।

যোগেনবাবু ও বিপিনবাবু প্রাতে আসিয়া উপস্থিত। মা তাহাদের সহিত বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আলাপাদি করিলেন; সকালে মা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া আসিলেন। সমুদ্র কিনারায় বালিকার মত কড়ি, ঝিনুক খুঁজিতেছেন, একটি পাইলেই এক একজনকে দিতেছেন। ঘণ্টা খানেক এই ভাবে খেলা করিয়া মা তাঁবুতে ফিরিলেন। ৯টায় তাহাকে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে নেওয়া হইল, সঙ্গে সকলেই গেলেন! জলযোগের

ভবিষ্যৎকালের শক্তি
ও শ্রেণী নির্দেশ।

আয়োজন হইয়াছে। মা, যোগেনবাবু,
বিপিনবাবু, অবিলাসবাবু প্রভৃতির সহিত

কথাবার্তা বলিতেছেন। কথা উঠিল,—অনেকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়। মা বলিলেন, “এর ভিতরেও অনেক কথা আছে। ভবিষ্যদ্বক্তাদেরও বিভিন্ন শ্রেণী আছে। কেহ কেহ হঠাৎ বলিয়া ফেলেন—খাটিয়া যায়; কেহ কেহ বা সংশয়ের ভাব নিয়া বলেন; কাহারও বা শক্তিকমল ফুটি ফুটি করিতেছে, ফোটে নাই, সে জিনিষটা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই তাহার সহিত ইচ্ছাশক্তি জুড়িয়া দিয়া বা হউক একটা কিছু বলিয়া দেয়,—আর ভুলও এরাই বেশী করে। আর বাঁহারা ভবিষ্যৎ দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদের কখনও ভুল হয় না। এই রকম নানা অবস্থা আছে; একটু খেয়াল করিলেই বুঝিবে কে কোন্ স্তরের লোক।” মা তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিলেন। বেলা প্রায় ৪টার উঠিলেন। স্ত্রীলোকেরা বসিয়া আছেন। কেহ কেহ মার জন্ম খাবার লইয়া আসিয়াছেন; মা তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ম নামমাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সবই বিলাইয়া দিতেছেন। শ্রীযুত নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে কীৰ্ত্তন হইবে; বৈকাল ৫টার মাকে নিবার জন্ম সেখান হইতে লোক আসিল। মা সহ সকলে কীৰ্ত্তনে গেলেন, রাত্রি প্রায় ৯টার ফিরিলেন। অবিনাশবাবু মার সহিত আলাপ করিতেছেন; আমি সব সময় উপস্থিত না থাকায় কি কথাবার্তা হইল লিখিতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা ভগবান্ আমাদের

সৃষ্টি করিয়া আমরা কি করিব স্থির করিলেন?” মা অমনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, “তোমরা যাহা করিতেছ তাহাই স্থির করিয়া দিলেন।” শঙ্করানন্দ স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, “মা, ঠিকই বলিয়াছ।” আরও নানা কথা হইতেছে, যেন অজস্র স্বর্ণখণ্ড বিতরিত হইতেছে। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, সময়ভাবে আমি সবসময় উপস্থিত থাকিতে পারি না, স্বর্ণখণ্ডগুলি কুড়াইয়া লইতে পারি না। যার কপালে আছে সে সোনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া ঘরে লইয়া যায়। রাত্রি প্রায় ১১।৫টায় মা শয্যা গ্রহণ করিলেন।

৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

আজ বেলা প্রায় ৯টা পর্যন্ত মা পড়িয়াই আছেন। আমি তাঁবুতে গিয়া দেখি মা প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাহিরে গিয়াছেন, জ্যোতিষদাদা ও ভোলানাথ অত্নরে বসিয়াই কথা বলিতেছেন। আমি যাইয়াই মার বিছানা ঠিক করিলাম, কিন্তু মা এখনও আসিতেছেন না কেন? সন্দেহ হইল। ইচ্ছাময়ী মা।

বাহির হইয়া দেখি মা কোথাও নাই। জ্যোতিষদাদা ও আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখি বহুদূরে সমুদ্রের ধার দিয়া একাকিনী চলিয়াছেন। জ্যোতিষদাদা ও আমি দৌড়াইয়া যাইয়া মাকে ধরিলাম; মা গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি একাই যুরিব।” চেহারা দেখিয়া আমাদের আর দ্বিধা করিবার সাহস হইল না, আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ভোলানাথ জ্যোতিষদাদাকে

পাঠাইয়া দিলেন। আমি মার খাবার তৈয়ারী করিতে গেলাম। বেলা প্রায় ১১টায় মা ফিরিলেন। আসিয়াই বলিতেছেন, “খুকুনী কোথায়? এত বেলা হইল, আমাকে খাইতে দিবে না?” যেন পঞ্চম বর্ষিয়া বালিকা! আমি দৌড়াইয়া আসিয়া মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। রুটি খাওয়াইতে বসিলাম কিন্তু আজ আর প্রায় কিছুই খাইলেন না; বলিলেন, “খাইতে বসিলেই দেহটা যেন কেমন হইয়া যায়, ঐ ভাবটা ভুলিবার জন্যই আবার খেলা করিতে আরম্ভ করি।” খাওয়াইতে বসিয়া কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমি একটু উঠিয়া গিয়াছি; ইতিমধ্যে বঙ্কিমদাদার স্ত্রী ও আরও ২১টি মহিলা মার নিকট আসিয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ নিজের হাত দেখাইয়া মা বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, কিসের গন্ধ!” বঙ্কিমদাদার স্ত্রীর খুব মাথা ধরিয়া ছিল, তিনি মার হাতের স্বাগ নিয়া দেখিলেন—দিব্য সুগন্ধ! মা বলিলেন, “আমিও দেখিয়াছি এ কোন ফুলের গন্ধ নয়, অপর কোন সৌরভ।” বঙ্কিমদাদার স্ত্রী বলিলেন, সুগন্ধে তাঁহার মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল। মা সারাদিন আর কিছু খাইলেন না; বলিলেন রাত্রিতে খাইবেন। রাত্রিতে খাওয়াইতে বসিয়াছি। যোগেনবাবু মার নিকট বসিয়া কথায় কথায় বলিয়াছিলেন রাত্রি ১০টার পর তিনি কিছু খান না। মা আসনে বসিয়াই বলিলেন, “বাবা (অর্থাৎ যোগেনবাবু) রাত্রি ১০টার পর খান না; তাহাকে ডাকিয়া আন, কিছু খাওয়াইয়া দেই।”

যোগেনবাবুকে বলা মাত্রেই তিনি বলিলেন, “মা, আপনি বলিলে খাইতেই হইবে। মা নিজে মুখে না দিয়া আগেই যোগেনবাবুকে সব দিয়া দিলেন, পরে নিজে মুখে দিলেন। প্রসাদ দিবার মার এমনই সুন্দর রীতি ! প্রথম জীবনে ত প্রসাদ অদৌ দিতেন না ; প্রবল আর্তি দেখিলে এখন দেন বটে, কিন্তু উপরোক্ত নিয়মে ; অর্থাৎ মা উচ্ছিষ্ট বর্টনের পক্ষপাতিনী নহেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

—:০:—

৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার ।

বেলা প্রায় ৮টায় মা সমুদ্র তীরে গিয়াছেন, অল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসিলেন । চেহারায় অসুস্থ বলিয়া মনে হইল । বেলা প্রায় ১১টায় মা সহ আমরা রামকূট রওনা হইলাম । যাত্রার পূর্বে মা দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী হইয়া যাত্রা করিলেন । বঙ্কিম দাদা ও নন্দ কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে চলিলেন । সাম্পানে ৫।৬ ঘণ্টা চলার পর আমরা বড়ঙ্গ নোকায় (সুদীর্ঘ ডিঙ্গি নোকায়) উঠিলাম । পৌছিতে ঘণ্টাখানেক রামকূট গমন ।

লাগিবে । বেলা পড়িয়া আসিয়াছে ; আমরা খালের ভিতর দিয়া চলিয়াছি । ছুই ধারে গরীব গৃহস্থ-বধূরা চাউল ধুইতেছে, কলসী ভরিয়া জল নিতেছে । সবই প্রায় মুসলমান । মা প্রায় সকলের সহিত ডাকিয়া আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছেন । ‘মা আমাকে খাইতে দিবে ?’ ‘আমায় ভাত রাঁধিয়া দে’—ইত্যাদি কথাগুলি চটুগ্রামের ভাষায় বলিতেছেন, বড়ই মধুর শুনাইতেছে ! মহাপুরুষদের মামুলী কথাও যে কর্ণ-রসায়ন, বেশ বৃদ্ধিতে পারিলাম ; আমাদের কাণে কে যেন মধু ঢালিয়া দিল ! সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া

দেখিতেছে, বুঝি ভাবিতেছে, 'আপন পর ভেদ নাই, তুমি কোন্ সোনার দেশের মানুষ গো! 'তোমার কণ্ঠের মুরলীখানি আবার বাজাও, গো, বাজাও; আমরা শুনি—শুনি—শুনি।'... একবার এমন খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন যে ছেলে-মেয়েরা চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। হাসির উদ্বেল তরঙ্গ-স্পর্শে তাহাদের প্রাণের দুয়ারও বুঝি খুলিয়া গেল; তাহারাও হাসিয়া হাসিয়া মার সহিত আনন্দে কথা বলিতে বলিতে চলিল। আনন্দময়ী মা আমার আনন্দ বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন। ভোলানাথের লাঠিটা দিয়া নৌকা বাহিতেছেন, গান ধরিলেন, 'খেয়াঘাটের পাটনী এসেছে।' স্থান-কাল-কণ্ঠের মধুমিলনের সঙ্গীতের ২৪টি পংক্তিও বড় মিঠা শোনাইতেছে!..... প্রায় সন্ধ্যায় আমরা রামকূট পাহাড়ে উঠিলাম।

কল্পবাজারের পোষ্ট মাষ্টার রামকূটের পোষ্ট মাষ্টারকে ফোন করিয়াছেন যে মা যাইতেছেন; কিন্তু রামকূটের কাহারও সহিত মার পরিচয় নাই। স্থানীয় জমিদার ঙ্গেশান পালের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র পাল মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মায়ের ভক্তদের সেবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এখানে বুদ্ধ, শিবও রামসীতার মন্দির আছে। আরও বাড়ী ঘর আছে। বেশ স্থানটি। পুরি সম্প্রদায়ের একজন সাধু এ সব করিয়াছেন। তিনি অল্পস্থ হইয়া পড়িয়া আছেন। সাধুকে দেখিতে মা তাঁহার কুটীরে গেলেন। আমরা আজই ফিরিয়া যাইব কথা

‘আসা-যাওয়া কি আর ভাল?’ হইয়াছে, কিন্তু কেহই ছাড়িতে চাহে না। সাধুটি বলিলেন, আজই যাওয়া কি ভাল লাগিবে? মাও হাসিয়া জবাব দিলেন, “আসা যাওয়া কি আর ভাল?” সাধুটি বুঝিলেন কিনা জানিনা। একটু পরেই মা বাহির হইয়া আসিয়া চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুন্দর উন্মুক্ত স্থান, মার সহিত আমরাও ঘুরিতেছি। বৌদ্ধদেব ‘ক্যাং’ (বৌদ্ধ মন্দিরকে এখানে ‘ক্যাং’ বলে) আছে। মা সবই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন। গুনিলাম এখানে বাঘ ও হাতি আছে। একটু রাত্রিতে দূর গ্রাম হইতে প্রাকাণ্ড একদল লোক কীৰ্ত্তন করিতে আসিল। গুনিলাম বেলা ৩টার এখানে মায়ের আসার কথা পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এরি মধ্যে এত লোক কিরূপে খবর পাইল বুঝিলাম না ইহার মাকে অভ্যর্থনা করিতে নদীতীরেও নাকি গিয়াছিলেন কিন্তু মা তার পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছেন। কীৰ্ত্তন সাঙ্গ হইতে রাত্রি ১২টা বাজিল। আহার প্রস্তুত, যাহার প্রয়োজন গ্রহণ করিলেন। রাত্রি ১২টার পর কীৰ্ত্তনের দল পাহাড় হইতে নদীতীরে সাম্পানে মাকে তুলিয়া দিতে চলিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু কাহারও ভ্রক্ষেপ নাই, সকলে কীৰ্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। ষড়ঙ্গ নোকা পাওয়া গেল না; প্রায় ২ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সাম্পান খুঁজিতে লাগিলাম, তাহাও পাওয়া গেল না। বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু কেহই ঘরে ফিরিতে রাজী নয়। অবশেষে স্থির হইল

মা নগেন্দ্র বাবুদের বিয়ু মন্দিরে অপেক্ষা করিবেন গ্রামবাসীরা
সাম্প্রদায়িকের খোঁজে বাহির হইবে। কেহই ঘরে বাইতে প্রস্তুত
নয় দেখিয়া মাও চলিলেন, সঙ্গে কীর্তন চলিয়াছে—

প্রাণ গৌরাজ নিত্যানন্দ ব'লে ডাকরে।

নিতাইর সমান দয়াল আর নাই রে।

সকলে নাচিয়া গাহিয়া গ্রাম মুখরিত করিয়া চলিয়াছেন।
কীর্তনের মধু নির্ঘোষে স্তম্ভ গ্রাম জাগিয়া উঠিল।

যাত্রাপথে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল লেখা হয় নাই।
ঘটনাটি এই :—খালের পথে মা মুসলমান বোদের সঙ্গে “মা

রামকৃষ্ণের পথের
বিশেষ ঘটনা।

ভাত দাও, মা ভাত দাও,” বলিয়া খেলা
করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের নামিবার

ঘাটেও দুইটি মুসলমান স্ত্রীলোক চাউল

ধুইতেছিল। মা কাছে গিয়া বলিলেন, “মা বড় ক্ষুধা পাইয়াছে,
ভাত দিবে। সে বলিল, ‘এস’। মা অমনি নৌকা হইতে
নামিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন, আমরাও চলিলাম। আখের
ক্ষেত হইতে আখ নেওয়া হইল। মা মুসলমান স্ত্রী লোকটার
বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই, সে কেমন থমকিয়া গেল, বলিল
“আমার রান্না কি তুমি খাইবে”? মা বলিলেন, “কেন
খাইব না? দেখতে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। তোমার
শরীর কাটিলে রক্ত বাহির হয়, আমারও হয়; তবে কেন
খাইব না?” সে বেচারা ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘না,
তুমি যাও।’ অমনি তাহার সঙ্গিনীটি বলিল, ‘তুই ভয় পাস্

কেন? বল্‌না—‘চল’ উহারা খাইবেনা, শুধু মুখে বলিতেছে।’ মা তৎক্ষণাৎ জোরদিয়া বলিলেন, “কেন খাইব না? দিলেই খাইব।” সে বলিল, ‘গরুর গোস্ত দিয়া দিব।’ মা বলিলেন, “মা, তুমি গরুর গোস্ত, পাঠার গোস্ত, যা’ দিবে তাহাই খাইব।” তাহারা আর বাদানুবাদ করিতে সাহস না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মা আমাকে আদেশ করিলেন, “একখানা আখ আমার মাকে দিয়া আস।” আমি দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া একখানা আখ তাহার হাতে দিয়া আসিলাম।

লীলাময়ী এই ভাবে লীলা করিয়া চলিয়াছেন। কীর্তনীয়ারা গাহিতেছে—‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম’। রাত্রি প্রায় ৩টা, এখনও আমরা কীর্তনদল সঙ্গে মাকে নিয়া গ্রামের মাঠে পথে ঘুরিতেছি। মধ্যে মধ্যে গৃহস্থবাড়ী হইতে স্বামী স্ত্রী বাহিরে আসিয়া মার চরণ বন্দনা করিতেই মা স্ত্রীলোকটার হাত ধরিয়া একটু হাসিতেছেন, আবার চলিতেছেন।

এই ভাবে নিশীথ রাত্ৰিতে (১২—৩টা
নিশীথ রাত্ৰিতে রাম-
কুটের পথে পথে নাম
কীর্তন ও বিষ্ণুমন্দিরে
শেষরাত্রি যাপন।

পর্য্যন্ত) মাকে লইয়া গ্রাম, মাঠ-ঘাটে
কীর্তন করিয়া ভ্রমণ—এই প্রথম।
বৃষ্টির বিরাম নাই, জনসঙ্ঘের চরণ
যুগলেরও বিশ্রাম নাই। কি এক ভাবে সকলে আত্মহারা
হইয়া চলিয়াছেন। মা কীর্তনের তালে তালে হাততালি
দিতেন; কখনও বা বাহু তুলিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে তালে

তালে দোলাইতেছেন,—দেখিয়া ভক্তদের ভিতর ভাবের তরঙ্গ
বহিয়া বাইতেছে। আনন্দে সকলে স্থপ্তি-স্থখ বিম্বৃত
হইয়াছেন, রাত্রি বহিয়া যায় খেয়াল নাই। এই ভাবে
আঁধার পথে (মেঘে ঢাকা চাঁদ) চলিতে চলিতে আমরা
শ্রীযুত নগেন্দ্র পালের বিষ্ণু মন্দিরে উঠিলাম। প্রকাণ্ড
বাড়ী, মালিকেরা অতি ভদ্র, বিনয়ী। অতিথি সৎকারের
বথেষ্ট করিতেছেন। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। দু'একজন
গ্রাম্যলোক তখনই সাম্পানের খোঁজে বাহির হইলেন।
সাম্পানে আমাদের কষলাদি সবই ছিল, সঙ্গে মাত্র গায়ের
চাদর। মা সকলকে সাম্পানের খোঁজ করিতে নিষেধ
করিলেন; বলিলেন, “সারারাত্রি পরিশ্রমে তোমরা-ক্লান্ত, এখন
বিশ্রাম কর। ভোরবেলায় সকলে একত্রে বাহির হওয়া
বাইবে।” কিন্তু সে কথায় তাঁহারা কাণ দিলেন না, বলিলেন,
“ক'রু কি? আজ আমাদের কত আনন্দ।” পাছে মা ও
ভক্তদের অসুবিধা হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা আর বিশ্রামের
অবসর পাইলেন না। অত রাত্রিতে দুর্ঘ্যোগের ভিতরেই
সাম্পানের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা অপরের
ব্যবহৃত লেপ তোষকাদি গ্রহণ করি না, কাজেই চাদর মুড়ি
দিয়া কোন প্রকারে পড়িয়া রহিলাম। গৃহস্থদের ক্রটি নাই,
তাঁহারা শয্যাতির সকল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

৮ই ফাল্গুন, শনিবার।

ভোর হইতেই খবর পাইলাম, সাম্পান পাওয়া গিয়াছে।

অতিথি-বৎসল-সেবাপরায়ণ গ্রামবাসীরা বিষ্ণু মন্দিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন; এইবার কীর্তন করিতে করিতে মাকে কল্পবাজার প্রত্যাবর্তন।

পথের দৃশ্য।

যত্নে আমরা মুগ্ধ হইতেছি। মাকে ইহারা কি করিয়া এই ভাবে বরণ করিয়া লইলেন, ভাবিয়া অবাক হইতেছি। মা ঘাটের দিকে চলিয়াছেন, সঙ্গে কীর্তন মুখর দলবল; গ্রাম্য শিশু ও স্ত্রীলোকগণ মার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ ফুল ফল আনিয়া মায়ের চরণে নিবেদন করিতেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই এক ডালা বিস্কুট আনিয়া মার হাতে দিয়া বলিলেন, “মা, তুমি বিলাইয়া দাও।” মা সেগুলি দিয়া লুট দিলেন। কিছু দূর আসিলে একজন এক ডালা মুড়ি মার হাতে দিল; মা উহা লুটের ভাবে ছিটাইতে আরম্ভ করিলে, সকলেই ছিটাইতে লাগিল। প্রাতে চিরাচরিত লাজ-বর্ষণের পরিবর্তে মুড়ি-বর্ষণ করিয়া মুড়ি-মঙ্গল উৎসব হইল। সকলে এই ভাবে আনন্দ করিতে করিতে মাকে সাম্পানে উঠাইয়া দিলেন। বিদায় কোলাহলের ভিতর সাম্পান ছাড়িয়া দিল, দলে দলে লোক খালের দুই-ধারে দাঁড়াইয়া মাকে তৃষিত-নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন, অথচ তাঁহাদের মাতৃদর্শন এই প্রথম। জ্যোতিষদাদা মাকে সাম্পানের বাহিরে বসাইয়া

দিলেন। নগেন্দ্রবাবু, এক চক্রবর্তী মহাশয় এবং আরও অনেকে সঙ্গে চলিলেন। পরে মা বলিলেন, “তোমরা অনেক দূর আসিয়াছ, এখন ফিরিয়া যাও।” তাহারা চলিয়া গেলে মা ভিতরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১০টার সাম্পান কল্লবাজার পৌঁছিল। আমরা দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী গেলাম; মাকে মুখ ধোওয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম, পরে তাঁবুতে আসিলাম। শঙ্করানন্দ স্বামীজি প্রভৃতির সহিত নানা কথা হইতেছে।

সাম্পানে শুইয়া মা বলিয়াছিলেন, “কল্লবাজারে আসিবার দিন তোমাকে ‘১৫দিন’ বলিয়াছিলাম না? আজ ক’দিন হইল? তখন হিসাব করিয়া দেখা গেল পনের দিন কল্লবাজারে থাকিবার পর পঞ্চদশদিনে সাম্পানে মার বাক্যের সত্যতা। রামকুট যাওয়া হইয়াছে। মা বলিলেন, “ইহাই বলিয়াছিলাম।” আবার পথে বলিয়াছিলেন, “যেন সাপ দেখিতেছি।” বুঝিলাম, শীঘ্রই আবার সর্পের দর্শন মিলিবে।

রবিবার দিন মার শরীর কেমন হইয়া গিয়াছিল, কথায় কথায় সেই কথা উঠিল। মা বলিলেন, “উহা সমাধি নয়। সমাধি ত কত রকমের আছে, আর কত রকমই এ শরীরে সমাধির প্রকার ভেদ ও হইয়া গিয়াছে। সেদিন যেন তোমাদের শরীরের উপর তাহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু-লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া। মহাশ্বাস শুরু হইয়াছিল। তোমরা

লক্ষ্য করিলে বুঝিতে আমার নীচের অঙ্গ সব ছাড়িয়া গিয়াছিল, শ্বাসের গতি ও ক্রিয়ার দিকে খেয়াল করিলে সবই বোঝা যায় কিনা।”—শঙ্করানন্দজীকে ইসারায়—“তুমি বল প্রাণ স্তম্ভাপথে ব্রহ্মরুদ্ধাবধি যায়, নয়? আমার সেদিন হৃদয় হইতে এখানে (জ-মধ্য দেখাইয়া), গিয়া যেন ঠেকিয়া গেল, আবার (প্রাণ) ধীরে ধীরে বিপরীত পথে ফিরিয়া আসিল। সেদিন অবস্থা ভিন্ন রকমের হইয়াছিল। সমাধিও নানা প্রকার আছে। খুকুনী আমার বলিত, ‘দেখ মা, প্রথম তোমায় দেখিতাম তুমি সমাধির মত হইয়া পড়িয়া বাইতে, বখন উঠিতে তখন তোমার আনন্দোদ্ভাসিত মুখ কোমল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে অনিন্দ্যসুন্দর। আবার একটা স্থির ধীর, প্রশান্ত ভাব! চিত্তে যেন শান্তি অচলা হইয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এখন মনে হয় মড়ার ঘর হইতে ফিরিয়া আস, এমনই একটা চেহারা দেখা যায়।’ সত্যইত তাই। প্রথমে আনন্দের ভাব, পরে, আনন্দ—নিরানন্দের অতীত! তারপর আরও একটা অবস্থা আছে; এ অবস্থায় শরীরে রক্তচলাচলের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসিতে ১২।১৪ ঘণ্টা লাগে, কাজেই চেহারা মৃতবৎ দেখায়। নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়, আরও কত কি, বাবাজী (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) ত নিজে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।” এসব কথায় আতঙ্ক হইল, কিন্তু নিরুপায়। মা আরও বলিতেছেন, “হাঁটিতে গেলেও সব সময় পারি না; কেমন একটা অবস্থা

হয়, যেন পড়িয়া যাইবে।” আমি বলিলাম, “সেই জন্মই ত
ভয়ে ভয়ে আমি সর্বদা তোমার পেছনে পেছনে থাকি,
আমি দেখি তুমি যেন পড়িয়া যাইবে।” এই বিহ্বল অবস্থায়
চলিতে চলিতে মা অনেক সময় পায়ে চোট পান। কি
যে হইবে ভাবিয়া পাই না। মা বলেন, “চিন্তা কর কেন ?
যাহা হইবার হইবেই।”

বেলা প্রায় ২টার একটু খাওয়াইয়া দিলাম। আহারান্তে
একটু বিশ্রামের পরই উঠিয়া বসিলেন। স্ত্রীলোকেরা অনেকে
আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় মা নাম করিতেছেন, আমরাও
সঙ্গে সঙ্গে করিতেছি—

“জয় মা, জয় মা, মা, মা, মা, মা,—

“হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,—

“জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে,

ও নাম বল বদনে, শুনাও কাণে, বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে”
কিছুক্ষণ নাম চলিবার পর ভদ্রলোকেরা আসিয়া পড়িলেন,
নাম বন্ধ হইল। মা কথা বলিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন ;

সে হাসি অতিশয় সংক্রামক, সকলের
মার সর্ব্বধর্ম্মে সমান শ্রদ্ধা বুক বুক হাসির ছোঁয়াচ্ লাগিতেছে।
ও স্বভাবতই ষোগিক সকলের উপর দিয়া আনন্দের উদ্বেল
ক্রিয়া ও ভাব-সমাধি প্রভৃতির স্বতঃস্ফূরণ ; মা প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। একজন
দ্রষ্টা মাত্র।

মুসলমান ডাক্তার ও অগ্ন্যাগ্ন ভদ্রলোকেরা
উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে মা শাহাবাগে যে নমাজ পড়িয়াছিলেন

সেই কথা উঠিয়াছে। মা মুসলমান্ ভদ্রলোকটিকে বলিতেছেন, “বাবা আমিও যে মুসলমান”। অবিনাশ বাবু হঠাৎ যোগের কথা তুলিয়াছেন; বলিতেছেন, রামকৃষ্ণদেব তোতাপুরির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরিজী বাহা ৪০ বৎসরে আয়ত্ন করিয়াছিলেন, পরমহংসদেব তাহা তিন দিনে করিয়াছিলেন। আমাদের আনন্দময়ী মায়ের কিন্তু সবই অভূতপূর্ব। মায়ের হঠাৎ যোগের ক্রিয়াগুলি সব আপনা আপনি হইয়া যাইত, ভোলানাথ দেখিয়া ভয় পাইতেন। অনেক পড়িয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এমনটি কোথাও দেখি নাই, পড়ি নাই, শুনি নাই।” মা সেইসব কথাগুলি শিশুর মত আলোচনা করিতেছেন, “এই যে সব হইত, এর মধ্যে ইচ্ছা-শক্তির কোনই ক্রিয়া ছিলনা, হইয়া যাইত—আমি দেখিতাম, এইমাত্র। আবার, কীর্তন হইলেই যে শরীরটা এলোমেলো হইত তাও নয়। কখনও সামান্য কীর্তনেই ঐরূপ হইত, আবার তুমুল কীর্তনেও কিছুই হইত না। হয়ত রান্না করিতে বসিয়াছি, লাকড়ি ঠেলিতে গিয়া হাত ঐখানেই পড়িয়া গেল, শরীরও পড়িয়া গেল—ব্যাস্!”—বলিয়া হাততালি দিয়া ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিলেন।

যোগেনবাবুর একদিন তাঁবুতে শুইবার সাধ হইয়াছে। শঙ্করানন্দজী বলিতেছেন, ‘বেশ ত, শুইবেন।’ তিনি বলিলেন, “আমরা ত মার গণ নই, আমরা যে সংসারী লোক।” মা হাসিয়া বলিতেছেন, “তুমি বুঝি ‘গণ’ ছাড়া ?

দেহী মায়েই সংসারী সংসারী নয় কে, বল ত? এ
সকল ধর্মাবলম্বীকে শরীরটা যতদিন আছে, 'সং' যে সাথী
মর্যাদা দান। হইয়াই আছে।" সহাস্ত্রে আমার
দিকে চাহিয়া—“কি বল?” নানা কথার পর মুসলমান
ভদ্রলোকটি বিদায় কালে বলিতেছেন, “বিরক্ত করিয়া
গেলাম”। মা অমনি শুভ্র হাসি-রাশি ছড়াইয়া বলিলেন,
“বাপ মেয়ের কাছে আসিলে, মেয়ে বিরক্ত হয় নাকি?
আর, মেয়েকে এসব কথা বলে নাকি, বাবা? যখন ইচ্ছা
হয়, এইরূপ বিরক্ত করিও।” ভদ্রলোকটি খুব আনন্দিত
হইয়া ‘আদাব’ বলিয়া বিদায় নিলেন, মাও ‘আদাব’ বলিয়া
প্রতি-নমস্কার করিলেন। মা মুসলমানদিগকে সর্বদাই এই
ভাবে প্রতি-নমস্কার জানাইতেন। মার প্রত্যেকটি ব্যবহার
ক্রটি হীন, সুন্দর। প্রস্ফুটিত সহস্রদল কমলের প্রত্যেকটি
পাঁপড়ীই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে ভরপুর। একটু পরেই মা
বলিতেছেন, “তোমরা আমার এখানে ক’টার সময় বসাইয়াছ?
এখন ক’টা বাজে? আমরা বলিলাম, “৩ টায় বসিয়াছ,
এখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে।” মা হাসিয়া বলিলেন, “এখন
একটু বাহিরে যাই,—কি বল?” এই বলিয়া ছোট বিছানাটুকু
ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে একটু পায়চারি করিয়া
আবার ভিতরে বিছানায় গিয়া বসিলেন। আমি একটু
দুধ ও জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম; কিছুই প্রায়
খাইলেন না, শুইয়া পড়িলেন।

৯ই ফাল্গুন, রবিবার।

কিছুদিন পূর্বের ঘটনা ; মা তখন দেবদুনে। মীরার (গোপালজীর স্ত্রী) প্রতি গোপালজীর প্রবল অনুরাগপ্রসঙ্গে একদিন লক্ষ্মীরাণী প্রমুখ করেকজন একটু আনন্দ গোপালজীর স্ত্রী মীরার করিতেছিলেন। মীরার কি একটু সঙ্গে তাহার স্বামীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, গোপালজী মহাচিন্তিত বন্ধনের মোচন।

হইয়া মাকে সেইসব কথা বলিতেছেন।

মা ক্রীড়াচ্ছলে গোপালজীকে বলিতেছেন, “এত কি বন্ধনে জড়াইতে হয় ? এইভাবে বন্ধন ছিঁড়িতে হয়”—এই বলিয়া নিজের পরিহিত বস্ত্রের একখণ্ড ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দিলেন। গোপালজী ভাবিলেন, এইভাবে বুঝি মীরাহারা হইবে ; তিনি দোড়াইয়া যাইয়া নেই ছিন্ন বস্ত্রটুকু কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে রাখিয়া দিলেন। এই ব্যাপার নিয়া সকলে হাসাহাসি করিল। যাক্, এই ঘটনার কিছুকাল পরে মীরার সত্যি অসাধ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইল, বহু চিকিৎসায়ও কিছুমাত্র ফল হইল না। অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িল। মা তখন নবদ্বীপে। গোপালজী মীরার জন্ম আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া মার নিকট ২৩ খানা টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে হরিরাম গোপালজীকে বলিল, (পরে আমরা শুনিয়াছি) “তুমি মাতাজীর বস্ত্রখণ্ড যজ্ঞে আহুতি দিয়া দাও, নতুবা মীরার এই কর্মভোগই হইবে, জীবনান্ত হইবে না।” উপায়ান্তর না দেখিয়া গোপালজী বস্ত্রখণ্ড যজ্ঞে আহুতি দিলেন, তার

কয়েকদিন পরেই মীরার সকল কষ্টের অবসান হইল। তাই বলিতেছি, ক্রীড়াচ্ছলেও যে মা কত সত্য-বস্ত্র বিলাইয়া দিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের বোধের অন্তরালে মহাশক্তির যে কত লীলা-বিলাস চলিতেছে, কাহার সাধ্য নির্ণয় করে?

যাক! আজ মা একটু বেলাতেই সমুদ্র-ভ্রমণে বাহির হইলেন। ফিবিরার পর একটু কি খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন। দুপুরে মেয়েরা আসিলে মা সকলকে নিম্না নাম করিলেন। আমি আজ-কাল হারমোনিয়ামে গান শিখিতেছি; মা বলিলেন, “আজ, তুমিই ধরাইয়া দাও, আমরা নাম করি।” তাহাই হইল। কিছুক্ষণ নামান্তে সদলে সমুদ্রের ধারে চলিলেন। আজ শনিবার, ছুটির পরই স্কুলের ছেলেরা তাঁবুতে আসিয়া একত্র হইয়াছে। সময় পাইলেই এখন তাহারা মার নিকট ছুটিয়া আসে। পথে তাহারা বলিল, ‘মা তুমি নাম ধরাইয়া দাও, আমরা করি।’ ‘মা হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,’ বলিয়া নামামৃত-তরঙ্গ তুলিলেন। পরে সুমধুর ‘মা, মা, মা, মা,’

জ্যোৎস্নালোকে

সমুদ্রকূলে কীৰ্ত্তন।

ধ্বনিতে তরঙ্গ উত্তাল আকার ধারণ

করিল। জ্যোৎস্নাপুলকিতা রজনী;

স্বচ্ছ নীল আকাশ; সমুদ্র অজস্র

রজতধারা বুকে মাখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। বুঝি এমনই আর এক মধু-যামিনীতে শ্রীগৌরাজসুন্দর সমুদ্রকূলে ‘প্রতিপদং পূর্ণায়ুতস্বাদনং’ রসধারা ভারতভূমিতে অজস্র সিঞ্চন

করিয়াছিলেন। আর তারই ফলে দেশ শ্যামশোভায় কি অপূর্ব ক্রী-ই ধারণ করিয়াছিল। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মা আমার, আবার বেলাভূমিতে নামবীজ ছড়াইতেছেন। উষর ভূমিতে ইহার ফল কত গভীর, কত সুদূর প্রসারী হইবে, কে বলিতে পারে! মাকে মধ্যে রাখিয়া ছেলের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতেছে। মা হাততালি দিয়া গাহিতেছেন—

মা মা মা মা মা মা

কহ মা ভজ মা—ইত্যাদি

অনির্বচনীর আনন্দে ভরপুর। কিছুকাল পরে মা তাঁবুর দিকে ফিরিতেছেন। ছেলেরা অক্লান্ত; নাচিয়া নাচিয়া নানা-ভাবে কীর্তন করিয়া চলিয়াছে। মার আদেশে তাহাদিগকে ফল বিতরণ করা হইল, তাহারা ‘আনন্দময়ী মায়ের জয়’ ধ্বনি করিয়া উঠিল। ছেলেদের ভিতরে ৭৮ বৎসরের বালক হইতে ২০।২২ বৎসরের যুবক পর্যন্ত আছে। তাহারা যখন নানা ভঙ্গীতে নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতেছিল তখন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। ‘গোপাল’ বলিয়া মা তাহাদিগকে আদর করিতেছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্তনের পর মাকে সার্ষাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাহারা একে একে বিদায় নিল। ১০ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজও মা বেলায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। পোর্টমাস্টার মহাশয়ের মার সহিত একান্তে কথা আছে; তিনি মার সঙ্গে গেলেন, আরও ২।১ জন গেলেন। ঘণ্টা খানেক পর ফিরিলে

একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। আজ রামবাবু মাকে ভোগ দিবেন রান্না হইতে দেবী হইতেছে। বেলা প্রায় ৩টার মার ভোগ হইল, প্রসাদ পাইলেন। বৈকাল ৫টার যোগেনবাবুর স্ত্রী পূর্ব ব্যবস্থামত তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া গেলেন, অনেক সঙ্গে গেল। বাড়ী সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে, মাকে নাদর অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। সম্মুখে চৌকীর উপর মার প্রতিমূর্তি নয়নাভিরাম ভাবে সজ্জিত। ছেলেরা মার সঙ্গে সঙ্গেই আছে, সমস্ত পথ কীর্তন করিয়া

সঙ্গীত জজসাহেবর
মাতৃ-বন্দন।

আসিয়াছে। মুন্সেফবাবু ও বিপিনবাবুর
ও বিপিনবাবুর সহিত ডিষ্ট্রিক্ট জজসাহেব
মাকে দর্শন করিবার জন্ম সপরিবারে

তাঁবুতে চলিয়াছেন—রাস্তাতেই মার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মেম সাহেব মার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন, খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা কবে চট্টগ্রাম যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা এখানে পরিদর্শনে আসিয়াছেন।

যোগেনবাবুর বাড়ীতেও ছেলেরা তুমুল কীর্তন চালাইয়াছে, বাহ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া শুধু নামই গাহিতেছে। নাম-রসে ছেলেরা যেন উন্মাদ; তাহারা জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করিয়া নানা ছাঁদে নৃত্য করিতে করিতে নামের রোল তুলিয়াছে, বয়স্ক ছেলেরা তাহাদিগকে একটু সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এরিমধ্যে রামকূট হইতে মায়ের দর্শনার্থী কীর্তনীয়াদল কীর্তন করিতে করিতে সোজা যোগেনবাবুর

বাড়ীতে উপস্থিত। ভোলানাথও কীর্তনে যোগ দিলেন—
 কীর্তন জমজমাট হইয়া উঠিল। তাঁথৈ
 জমাট কীর্তন, আনন্দের তাঁথৈ নাচে অঁথৈ আনন্দ—আনন্দের
 ছড়াছড়ি, “সকলেই প্রকৃতি।” আর সীমা নাই।।। মা হাসির তরঙ্গ
 তুলিয়া বলিতেছেন, “মা (যোগেন-
 বাবুর স্ত্রী) বলিয়াছিল, ‘আজ পুরুষদের বাড়ীতে ঢুকিতে
 দিবনা। তোমার সঙ্গে ক’জন ও ছেলেরা মিলিয়া আজ আমরা
 কীর্তন করিব।’ কি মা, আজ তবে এখানে সবই স্ত্রীলোক ?
 আর বটেই ত ! পুরুষেরাও যখন সেই পরমপতিকে চায়,
 তখন তাহারাও স্ত্রীলোক বৈকি,”—এই বলিয়া হাসিতে
 লাগিলেন। অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, মা এইবার তাঁবুতে
 ফিরিবেন। যোগেনবাবুর পত্নী স্বহস্তে মাকে খাবার খাওয়াইয়া
 দিতেছেন। একটু ক্ষীর মুখে দিয়া বলিতেছেন, “মা আমার
 বড় ছেলে (রাজবন্দী) ক্ষীর বড় ভালবাসিত ; সেই ক্ষীর
 আমি তোমার মুখে দিতেছি,—তুমিই যে আমার ছেলে-মেয়ে !”
 বলিতে বলিতে কান্নার রুদ্ধ-কণ্ঠ হইতেই মা বলিতেছেন, “মা,
 আমি তোমার ছেলে-মেয়ে ; তুমি যদি কাঁদ তবে কিন্তু মুখ
 হইতে ক্ষীর ফেলিয়া দিব।” যোগেনবাবুর পত্নী অমনি মাকে
 জড়াইয়া ধরিয়া চ’থের জল মুছিয়া বলিলেন, “না, মা, ক্ষীর
 ফেলিও না। তুমিই আমার সব হইও। আমি আর কাঁদিব
 না।” এই বলিয়াই তিনি আবার আনন্দ করিতে লাগিলেন।
 বালকদল কীর্তন করিতে করিতে মাকে তাঁবুতে ফিরাইয়া

নিয়া চলিল, তাঁবুতেও কিছুক্ষণ কীৰ্ত্তন করিয়া মাকে একে একে সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়া বিদায় নিল।

তাঁর ছোট বিছানাটিতে বসিয়া মা উপস্থিত ভক্তদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মা শয়ন করিলেন, অপর সকলেও শয্যা গ্রহণ করিতেছেন। হঠাৎ মা উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষদাদা ও আমিও আসিয়া বসিলাম। একটু পরেই দেখি,—রামকূট মা অন্তর্ধামিনী ; গভীর রাত্রিতে রামকূটের কীৰ্ত্তনদলের আগমন। তাঁবু স্থপ্তিমগ্ন দেখিয়া তাঁহারা কীৰ্ত্তনের রাখে হরি মারে কে ? প্রস্তাব করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কথাটা মা-ই প্রথম পাড়িলেন,—“তোমরা কি হাঁটিয়া আসিয়াছ ?” “হাঁ, মা ; ৭ মাইল পথ, হাঁটিয়াই আসিয়াছি”। নানা কথার পর সহাস্ত্রে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “খোল-করতাল নিয়া আসিয়াছ কেন ?” তাঁহারা নির্বাক। তখন জ্যোতিষদাদা বলিলেন, “আসিয়াছেন, ২১টি গান করুন।” চক্রবর্তী মহাশয় গান ধরিলেন, সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় কীৰ্ত্তন সাজ করিয়া তাঁহারা বিদায় নিলেন, বলিয়া গেলেন, তারপরদিন প্রাতেই রামকূট ফিরিয়া যাইবেন। এদের প্রসঙ্গে মা সহাস্ত্রে বলিতেছেন, “আমি ত শুইয়া ছিলাম, হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বসিলাম। আর কোন দিন ত এমন হয় না ! কাল রাত্রিতেও শুইয়া-

ছিলাম, হঠাৎ উঠিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলাম। গিয়া দেখি একটি কুকুরের বাচ্চাকে শিয়াল ধরিয়াছে, একটু পরে গেলেই বাচ্চাটিকে মারিয়া ফেলিত। জ্যোতিষ সঙ্গে ছিল, সে বাচ্চাটিকে আনিয়া বন্ধিমের বাড়ীতে দিল। ‘রাথে হরি মারে কে ? মারে হরি রাথে কে ?’—লোকে বলে না ?”

১১ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজও বেলা প্রায় ৮টার পোর্টমার্কার মহাশয় একান্তে কি কথা বলিবার জন্য মাকে সমুদ্রতীরে নিয়া গেলেন। মুখ না ধুইয়াই মা বাহির হইয়া হইয়া গেলেন, বেলা প্রায় ১২টায় ফিরিলেন। পোর্টমার্কার মহাশয় ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, মা একাই সমুদ্রের ধারে বসিয়াছিলেন। জ্যোতিষদাদা গিয়া মাকে নিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম “মা, তুমি কাল সেই দুপুরে খাইয়াছ, আর কিছু খাও নাই ; আজও এত বেলা হইল, এতটুকু কিছু মুখে দিলেনা, —তুমি কি ভাবিয়াছ, বলত ?” মা বলিলেন, “কি করিব, খাইতে যে খেয়ালই হয় না।” বাহ'ক, অনেক বলিয়া বহিয়া একটু খাওয়াইলাম খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন। রামকুটের দল ফিরিয়া যায় নাই, তাঁহারা বৈকালে মার নিকট কীর্তন করিবেন বলিয়া গেলেন। ২টা না রামকুটদলের কীর্তন। বাজিতেই স্ত্রীলোক ও বালকদল আসিয়া

উপস্থিত, এতবড় তাঁবুতেও আর যায়গা হয় না। বৈকালে মার আদেশে আমি নাম করিলাম, তারপর রামকুটের দল

কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্তন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। কীর্তনের পর মাকে একটু খাওয়াইতে চেফটা করিলাম; মা খাইলেন না। এইভাবে ধীরে ধীরে মা আহাৰ একেবারেই ত্যাগ করিতেছেন। কি করিবেন, মা-ই জানেন। রাত্রি প্রায় ১২টার সকলে শুইয়া পড়িলেন।

১২ই ফাল্গুন, বুধবার।

মা আজও অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। এক একদিন রাত্রিতে মোটেই স্থির হইতে পারেন না, যেন জোর করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া সকাল পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া কাটান। কখনও বলেন

“কাল রাত্রিতে চোখের দুটি পাতা মার বিনিদ্র রজনী। মুহূর্তের জ্ঞাও জোড়ে নাই, শরীরটাও

স্থির ছিল না। ভোর বেলা কাপড় মুড়ি দিয়া যেন লুকাইয়া থাকি, এইভাবে পড়িয়া ছিলাম।” আজ কাল প্রায়ই এই অবস্থা হয়। বলেন, শুইবার ভাবই নাই। কখনও উঠিয়া বসিয়া থাকেন; কখনও বলেন, “কাল রাত্রিতে শুইবার ভাবই ছিল না; জোর করিয়া কতক্ষণ শুইয়া থাকা চলে? খেয়াল হইল; সমুদ্রধারে চলিয়া যাই, কিন্তু ঠাণ্ডার ভিতরে আবার তোমরাও যাইবে, এই ভাবিয়া যাওয়া হইল না। তবে তেমন খেয়াল হইলে এসব বাধা ঠেকাইতে পারিত না, হয়ত তেমন খেয়াল হয় নাই?”—এই বলিয়া হাসিলেন। আজ সকালে উঠিয়া তাঁবুর ভিতরেই কিছুক্ষণ পায়চারি

করিলেন, তারপর নিজের ছোট বিছানাটীতে গিয়া বসিলেন। ২।১ জন দর্শনার্থী ভদ্রলোক আসিলেন,—মা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টায় অনেক অনুনয়-বিনয়ে সামান্য কিছু খাইলেন, তারপর একটু এদিক-ওদিক করিয়া আবার গিয়া শুইয়া পড়িলেন। চাদর মুড়িদিয়া পড়িয়া আছেন। আজ শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে মার ভোগ হইবে, বেলা প্রায় ১টায় সেই বাড়ী হইতে মাকে নিতে লোক আসিল। মা উঠিয়া বসিলেন। সন্দের সকলে মার সহিত প্রসাদ পাইতে গেলেন। প্রায় ৪টায় তাঁবুতে ফিরিলেন, তখন বহু দর্শনার্থী তাঁবুতে একত্র হইয়াছেন। স্কুলের ছেলেদের ত কথাই নাই, ৩৪ দিন ছুটি পাইয়া তাহারা মহানন্দে মার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আছে। মা আসিয়াই ছেলেদের বলিলেন, “আয়—আমরা একটা খেলা করি। এই খেলার নাম ‘সচ্চিদানন্দ’ খেলা।” এই বলিয়া ছেলেদের নিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমুদ্র হইতে তোলা কড়ি দিয়া খেলা শুরু হইল। এই খেলার নাম ও নিয়মাবলী মাই করিয়াছেন। প্রায় ১৫।২০ জন ছেলে নিয়া মা খেলিতে বসিলেন। দুইদল করিয়া দিলেন। শঙ্করানন্দ একদলে আছেন। মা বলিলেন “আমি মধ্যখানে বসিয়া বসিয়া দেখিব” তাই আরম্ভ হইল। এর মধ্যে S. D. O. এবং জজসাহেবের মেম মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

শিশুদের নিয়ে সচ্চিদানন্দ খেলা, যে হারিবে তাহার করিলেন। তাহার চলিয়া গেলে আবার খেলা বসিল। মা খেলাতে নিয়ম করিয়াছেন যে হারিয়া যাইবে ইহাতে শিশুদের নামের উপর ঝাঁক। তাহার ১০৮ বার ভগবানের নাম করিতে হইবে। অবশ্য বার যে নাম। খেলার পর নাম করান শুরু হইল। যাহারা হারিয়া গিয়া নাম করিতেছে তাহার জব্দ না হইয়া—যাহারা জিতিয়াছে তাহাদের বলিতে লাগিল—“দেখতো আমাদের কি ভাগ্য আমরা ভগবানের নাম করিতে পারিতেছি।” আজ কয়দিন যাবত মার কাছে আসিলেই নাম করিতে হয়। ইহাতে শিশুদের মধ্যে একটা নামের ঝাঁক পড়িয়া গিয়াছে। তাহার পথে চলিতে চলিতেও হরিবোল হরিবোল কি মা, মা, মা, মা বলিয়া সুর ধরে। সন্ধ্যার সময় তাঁবুর পাশেই এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেলেন। সেখানেও বহু লোক একত্র হইল। কীর্তনাদির পর মা এবং উপস্থিত ভক্তগণকে তাহার জল খাওয়াইয়া দিলেন। আর মুসলমান ছেলেরা সন্ধ্যার পর মাকে তাহাদের থিয়েটারে নিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মাও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পূর্বেই শরতবাবুর (উকিল) বাসায় কীর্তনের কথা হইয়া গিয়াছিল, তাই আর যাওয়া হইল না। সকলেসাইতে বাইতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। পরে মা শুইয়া পড়িলেন।

১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ।

মা আজ প্রাতে উঠিয়া বসিয়াছেন । ২।১ জন ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়া আছেন । মার সহিত একান্তে কথা বলিবেন । মা বিছানাতে বসিয়া বসিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতেছেন । বেলা প্রায় ৯টার মা তাঁবু হইতে বাহির হইলেন । পরে মুখ ধুইয়া একটু দুধ খাইলেন । আজ শশীদাদা মার জন্য পাকা পোঁপের হালুয়া করিতেছেন—তাহাও মা একটু খাইলেন । নিকটে ৪।৫টা ছেলে দাঁড়াইয়াছিল, মা তাহাদের হাতে হাতে দিতে বলিলেন । পরে নিজে খাইতেছেন, আর ছেলেদের বলিতেছেন, “এখন তোরাও খা আমিও খাই, আমিও যে ছেলে-মানুষ’ । এই বলিয়া হাসিতেছেন সাব-ডেপুটিবাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন । তিনি মার চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিলেন—“মাতো আমার মেয়ে,—মার চুলগুলি ঠিক করিয়া দেই । মা আমার—মাও, আবার মেয়েও ।” মা হাসিয়া বলিলেন—“না আমি তোমার সকলের ছোট মেয়ে ।” এই সব বলিয়া আনন্দ করিতেছেন । কিছু সময় পরেই মা উঠিয়া আবার গিয়া তাঁবুতে বসিলেন । ভদ্রলোকেরা দু-চারজন আসিয়াছেন—কথাবার্তা হইতেছে । বেলা প্রায় ১২টার মার ভোগ হইল । কয়েকদিন যাবত একটু একটু সৃজি সিদ্ধ তরকারী দিয়া খাইতেছেন । আজও তাহাই খাইলেন । খাওয়া দাওয়ার পর একটু শুইয়া পড়িলেন । স্ত্রীলোকেরা এখনও কেহ আসে নাই । প্রায় ঘন্টা দেড়েক মা

শুইয়া ছিলেন। এর মধ্যেই স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিলে সকলেই তাঁবুতে মার কাছে গিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে ছেলেদের দলও আসিয়া জুটিল। মা নিজের বিছানতেই বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পূর্বে দোকানদারেরা কীৰ্ত্তন নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুলোক একত্র হইল। মা একস্থানেই বসিয়া আছেন। খুব কীৰ্ত্তন হইল। কীৰ্ত্তনের পর ধীরে ধীরে সকলে বিদায় নিলেন। ২।১টি ভদ্রলোক বসিয়া মার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, তখন গিয়া শুনি

চক্রভেদের উপায়,
এক লক্ষ্যে নামকরা।

মা বলিতেছেন, ষট্চক্রের কথা। ভদ্রলোকটি বলিলেন, কয়টা চক্র?” মা

বলিলেন, “ধরনা—যেমন তোমরা রেলগাড়ীতে চড়িয়া একটা স্টেশনে যাইবে। সেই স্টেশন একটা হইলেও তথায় যাইতে আরও কত কি দেখিলে; সেই রকম—তোমাদের বই পুস্তকে ষট্চক্র বলিয়া কথা আছে, কিন্তু বাহারা তাহা ভেদ করিয়া যায়, তাহারা দেখে আরও আরও কত চক্র কত কি এর ভিতর আছে। ভদ্রলোকটি বলিলেন—“এই চক্রবেদ করিবার উপায় কি? মা বলিলেন, এক লক্ষ্যে নাম করা। আর এই লক্ষ্য থাকার জন্যই নানারূপ কৰ্ম্ম নিতে হয়, বাহাতে সব সময় একটা না একটা কিছু নিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়। যেমন—জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ

পাঠ—কি কৌতুহল ইত্যাদি।” ভদ্রলোকটি বলিলেন—
 “গুরুমন্ত্রে আমাদের কাজ হয় না কেন?” মা বলিলেন
 —“কেন হয় না—জাননা। আমরা ঔষধ খাই, কিন্তু কুপথ্য
 করি—তাই ঔষধে কাজ দেয়না—রোগও সারে না। তাই
 —যেমন গুরুদত্ত ঔষধ পড়িয়াছে, তেমন সুপথ্যও পড়া
 দরকার। অর্থাৎ আহার, বিহার সবই ঠিক মত হওয়া
 দরকার। তোমার মধ্যেই তো সব আছে। একত্ব, বহুত্ব,
 অনন্ত, অব্যক্ত, ব্যক্ত।” ভদ্রলোকটি বলিলেন, —“মা মন যে
 বড়ই চঞ্চল।” মা বলিলেন—“চঞ্চলতা

মন আনন্দ চায়,

তাই চঞ্চলতা।

যেমন তাহার স্বভাব—স্থিরতাও তাহার
 স্বভাব। আর মন তো তাহার মাকে,
 অর্থাৎ পূর্ণ-আনন্দকে চাইছে। তাই দেখনা তাহাকে সাংসারিক
 বতই সুখ ভোগ দেও, তবুও সে তৃপ্ত হয় না। আবার
 কোথায় কোথায় ছুটিয়া যায়। চঞ্চলতা যে থাকিবেই, সে
 যে তাঁহাকে পাওয়ার জন্যই চঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে, তাঁকে
 না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হইবে না—তাঁকে পাইলেই শান্ত
 হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়াই ভদ্রলোকটি বলিলেন,
 —“এমন কথা আর কখনও শুনি নাই। আজ খুব শিক্ষা
 পাইলাম।” মা বলিলেন; “তোমরাই শিক্ষা দিলে,”—এই
 বলিয়া হাতদুটি জোড় করিলেন। একটু পরেই ভদ্রলোকটি
 মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিল। মাকে একটু খাওয়াইবার
 চেষ্টা করা হইল। মা একটু খাইলেন—তারপর বলিতেছেন,

—“আজ আর হাঁটি নাই—সেই যে বসিয়াছি আর উঠি নাই।” হিসাব করিয়া দেখা গেল প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা যাবত মা ঐ একস্থানেই বসিয়া আছেন। মাও এই কথা নিয়া হাসাহাসি করিলেন। শেষে মা একটু বাহিরে হাঁটিতে আসিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আছি। রাত্রি প্রায় ১টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

১৪ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

তু.

মা আজ সকালে উঠিতেই শশীবাবু মাকে সমুদ্রের ধারে ফটো তুলিতে নিয়া গেলেন। এর মধ্যেই ২।৪ জন ভদ্রলোকও মার দর্শনে আসিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া মাকে ধরিলেন। মা সকলের সহিত আসিয়া তাঁবুর ভিতর বসিলেন। একটু পরে মাকে বাহিরে আনিয়া একটু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আবার মা তাঁবুতে গিয়া বসিলেন। সচ্চিদানন্দ খেলার নিয়মগুলি এখন পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই। পুনঃপুনঃ পরিবর্তন হইতেছে। আজ তাহা মা ঠিক করিয়া জ্যোতিষদাদাকে দিয়া একটা কাগজে লিখাইলেন। পরে ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা, শশীদাদা, শঙ্করানন্দ এবং ছেলেপিলেদের নিয়া মা খেলিতে বসিলেন। বেলা প্রায় ১টা পর্য্যন্ত খেলা চলিল। আজ দীনবন্ধুবাবুর বাসায় মা সকলকে নিয়া আহার করিতে যাইবেন বলিয়া দিয়াছেন। তাহাদের বাড়ী হইতে মেয়েরা মাকে ডাকিতে আসিল। আমি বলিলাম, “সচ্চিদানন্দ খেলার

সচ্চিদানন্দ খেলার ছলে
 ছেলেদের নাম কৌর্ভন
 করান।

নিয়ম ঠিক করা হইয়াছে তো ?” মা
 বলিলেন, “হাঁ, আজ হইয়াছে,
 আর-পরিবর্তন হইবে না। আজ
 পূর্ণিমা, বৃহস্পতিবার, আজ সচ্চিদানন্দ খেলা আরম্ভ হইল।”
 এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। লীলাময়ী এইরূপে খেলাচ্ছিলে
 নানাভাবে লীলা করিতেছেন। “যাক, মা সকলকে নিয়া দীনবন্ধু-
 বাবুর বাসায় গেলেন। দীনবন্ধুবাবুর বাসার সকলেই মনে
 করেন মা পূর্ব জন্মে কখনও তাহাদের বংশের মেয়ে
 ছিলেন। তাহারা সেইভাবেই মার সহিত ব্যবহার করেন।
 দীনবন্ধুবাবুর ভ্রাতৃপুত্র বিজনবাবু (উকিল) বলেন, “আমরা
 আনন্দময়ীর ভক্ত নই, আমরা তাঁহার নিজের লোক।
 তিনি আমাদের দিদি।” এই ভাবিয়াই তাহারা গর্ব অনুভব
 করেন। সেদিন এক ঘটনা হইয়াছে। বিজনবাবু খুব অসুস্থ
 হইয়া পড়িয়াছেন। একটা ফোড়া ও জ্বর হইয়াছে। কিছুদিন
 পূর্বেই একটা ফোড়া অপারেশন করা হইয়াছে। আবার
 ফোড়া হইয়াছে, ডাক্তার বলিয়াছে, কালই অপারেশন
 করিতে হইবে। আমরা যেদিন রামকুট যাই, যাইবার পূর্বেই
 মা গিয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় বসিয়াছেন। বিজনবাবু উঠিতে
 পারিলেন না, বিছানায় বসিয়া জানালা দিয়া মাকে দেখিতে-
 ছেন। মাকে বলিলেন,—“এবার আর অপারেশন সহ্য করিতে
 পারিব না; ফোড়াটা ফাটিয়া গেলে রক্ষা পাইতাম” মা
 কিছুই খান নাই, সেখানে গিয়া একটু দুধ খাইলেন, বাকীটা

বিজনবাবুকে দিতে বলিলেন। বিজনবাবু ও তখনই প্রসাদী দুধটা খাইয়া ফেলিলেন। পরদিন রামকূট হইতে আসিয়া শুনি রাত্রিতেই ফোড়াটা ফাটিয়া গিয়াছে। মা শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। বিজনবাবুদের বিশ্বাস মার অনুগ্রহেই এইরূপ হইয়াছে।

দীনবন্ধুবাবুর বাসা হইতে আসিয়া মা আবার সচ্চিদানন্দ খেলা নিয়া বসিলেন। ছেলেরা অনেকেই আসিয়াছে। মহানন্দে খেলা চলিল। সন্ধ্যার একটু পূর্বে নাম কীর্তন হইল। মাকে পান্নাবাবুর বাসায় নিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্যন্ত তথায় কীর্তন হইল। ভোলানাথ খুব মাতিয়াছিলেন। নকলেই তাহাতে আনন্দ পাইয়াছিল। পান্নাবাবু মার ও ভক্তগণের খাওয়ার খুব জোগাড় করিয়াছিল। তাবুতে ফিরিয়া প্রায় ২টা পর্যন্ত সকলেই কথাবার্তায় কাটাইলাম। ২টার সময় সকলে শয়ন করিল।

১৫ই ফাল্গুন, শনিবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা একটু সমুদ্রের ধারে গেলেন আসিয়া মুখ ধুইলেন, একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। প্রায় ১২টার ভোগ হইল। ভোগের পর সচ্চিদানন্দ খেলা চলিল। ইতিমধ্যেই স্কুলের ছেলের দল আসিয়া জুটিল। নকলকে নিয়া মা খেলিতেছেন। খেলার নিয়ম, যে দল হারিয়া যাইবে তাহারা ১০৮ বার করিয়া যে কোন নাম

জপ করিবে, আর যে দল জিতিবে তাহারা আনন্দে নৃত্য করিবে। এইভাবে মা সকলকে নাম করাইতেছেন। ছেলেরাও কিন্তু এই খেলায় খুব আনন্দ পাইতেছে। খেলার সময় ও সকলেই সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ হইতে পারিল কি না সেই চিন্তাই করিতে হয়। পরে নাম চলে। ছেলেদের টিফিনের ছুটি ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে মেয়েরাও আসিয়া জুটিল। আবার তাহাদের নিয়া খেলা চলিল। নন্দ্যার পূর্বের বিরাজবাবু আসিয়া মার আদেশানুসারে সকলকে নিয়া নাম কীর্তন করিলেন। পরে মা বাহিরে বালুতে গিয়া বসিলেন মেয়েরা গান ধরিল। চাঁদের আলোতে নন্দ্যার সময়টা মাকে নিয়া গানে বেশ কাটিল। রাত্রি বেশী হইতেই সকলে একে একে বিদায় নিলেন। অল্পস্থ ছেলে মেয়েরা আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে আসিয়া কাহারও সে জন্ম ঢাক্ষেপও নাই। মা একটু খাইয়া আবার উপস্থিত সকলকে নিয়া খেলায় বসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১২টার সকলে শয়ন করিলেন।

১৬ই ফাল্গুন, রবিবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা বিছানায় বসিয়া আছেন। অনেকে আসিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ খেলা আরম্ভ হইল। আজ দীনবন্ধুবাবুর বাসায় মায়ের ভোগ। একটু খেলার পরই মা শুইয়া পড়িলেন, আর আর সকলে খেলিতেছেন।

বেলা প্রায় ২টায় মা উঠিয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় ভোগে চলিলেন। ৪টায় মা তাঁবুতে ফিরিলেন। সকলকে নিয়া সচ্চিদানন্দ খেলা চলিতেছে। সকলকে নাম করান এই খেলার উদ্দেশ্য। মা বলেন ছেলেরা মেয়েরা আসিয়া বাজে কথা বলে, নাম করিতে বলিলেও বিশেষ করে না, এখন এই খেলাচ্ছলে ও নাম করিবে। বাস্তবিকই তাই হইতেছে। দুইহাত তুলিয়া সকলে যখন উচ্চৈঃস্বরে নাম করে তখন প্রতিবেশীরাও বুঝিতে পারে যে সচ্চিদানন্দ খেলার জয়ীদল নামকীর্তন করিতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই মা সকলকে নিয়া সমুদ্রের ধারে চলিলেন। আজ আকাশ মেঘে ঢাকা— তাই রৌদ্র না থাকায় বেলা থাকিতেই মা বাহির হইয়াছেন। সমুদ্রের ধারে একটু খেলা হইল। পরে মা মেয়েদের নিয়া নাম করিতে করিতে চলিলেন। সমুদ্র দর্শন করিয়া আবার তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, মার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নাম করিতে করিতে চলিয়াছে। মা বলিয়া দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে বলিতেছে। প্রথম হইল—হরিবোল, হরিবোল। পরে—জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে ইত্যাদি। তারপরে ধরিলেন—জয় শিব-শঙ্কর, বম্ বম্, হর হর। সকলে শেষে উঠাইলেন—মা মা মা মা—এই নাম করিতে করিতে মা তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিছুদূরে ছেলের দলও হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে আসিতেছে। বিরাজবাবু তাহাদের নাম

করাইতেছেন। ছেলেরা মার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি শনিবার মার তাঁবুর কাছে নাম কীর্তন করিবে স্থির হইয়াছে। তাই আজ তাহারা কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রের ধার হইতে তাঁবুর কাছে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিল। সন্ধ্যার সময় মার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে নাম কীর্তন করায় যে কি আনন্দ হইতেছিল তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝিতে পারিবেন না। যাক, কীর্তনের পর আবার মুসেফাবু ও তাহার স্ত্রীর আসিয়া এত নূতন খেলায় রূপা অনুভব করিতে হইলে রূপার অধিকারী যোগ দিলেন। আবার খেলা বসিল। হইতে হয়। প্রায় রাত্রি ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

গতকল্য রাত্রিতে মা শঙ্করানন্দের সঙ্গে কথায় কথায় বলিতেছিলেন, রূপা অনুভবের অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত সে রূপার কথা বুঝিতেই পারে না।”

১৭ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজ এখানকার লোকেরা মার কাছে উদয়াস্ত কীর্তন করিবে স্থির করিয়াছে। ভোরেই বিরাজাবু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া নাম ধরিলেন, তাহারা মাকে নিয়া নগর কীর্তনে বাহির হইবেন। ভোলানাথের কীর্তনে মহানন্দ। তাঁবুর নিকট হইতে মাকে নিয়া সকলে বাহির হইলেন। নাম ধরা হটল—জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে। ও নাম বল বদনে, শুনাও কাণে, বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে। নাম করিতে করিতে দীনবন্ধুবাবুর কালী-মন্দিরের

নমুখে গিয়া কীৰ্ত্তনের দল দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ সেখানে কীৰ্ত্তন হইল, তাহার লুট দিলেন। মা আমাকে ধুপতি নিয়া প্রদক্ষিণ করাইলেন। মা তথায়ই বসিয়া রহিলেন। ভোলানাথের সঙ্গে সঙ্গে কীৰ্ত্তনের দল নগর-কীৰ্ত্তনে বাহির হইল। মুন্সেফবাবু, যোগেনবাবু, রামবাবু প্রভৃতির বাড়ী বাড়ী কীৰ্ত্তনের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার কালী-বাড়ীতে (দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী) আসিলে মাকে সঙ্গে নিয়া কীৰ্ত্তনের দল তাঁবুর দিকে চলিল। মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, মোহিনীবাবুর স্ত্রী, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি এবার অনেকেই দলে যোগ দিয়া নাম করিতে করিতে আসিতেছেন। তাঁবুর নিকটে আসিয়া কীৰ্ত্তনের দল ইন্দুবাবুর বারান্দায় বসিয়া কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল। ছেলের দল মিলিয়া মহানন্দে নাম চলিল। বিরাজবাবু নাম করাইতেছেন। ভোগের আয়োজন শরতবাবু (শরত পাল, উকিল) করাইলেন। বেলা প্রায় ৪টার কালী পালের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেল (পূর্বেই কথা ছিল আজ যাইবার)। এবার স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া নগর কীৰ্ত্তন করিয়া চলিল। রাস্তার ভিতর এইভাবে স্ত্রী-পুরুষের কীৰ্ত্তন বোধ হয় আর কেহ কখনও দেখে নাই। মার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মেয়ের দল চলিল। পরে ভোলানাথের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরা চলিয়াছে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “এত মেয়েলোক কল্পবাজারে আছে তাই জানিনা—তামাসা—কোথা হইতে এত মেয়েলোক একত্র হইল।”—এই সব বলাবলি করিতে

লাগিল। মনে হইল কল্পবাজারে ঘরে আর কেহ ছিল না।
রাস্তায় মেথরের দল (স্ত্রী, পুরুষ) এই দলের সঙ্গে মিলিয়া
গেল। উচ্চৈঃস্বরে নাম চলিল :—

“এ নাম বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে
ইত্যাদি।” এ আনন্দ হয়তো জীবনে কেহ ভুলিবেন না।
কাহার শক্তিতে আজ মুন্সেফ, ডেপুটিবাবুর স্ত্রীরা ও কয়েক
ডিপার্টমেন্টের ছোট সাহেবের স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই হাততালি
দিতে দিতে রাস্তায় কীৰ্ত্তন করিয়া চলিয়াছে—এখন সে কথা
চিন্তা করিবারও কাহারও অবসর নাই। পরে সকলেই
আশ্চর্য্য হইল। যাক, এইরূপে মিলিয়া কীৰ্ত্তনের দল কালী
পাড়ার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানেও খুব
খানিকক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া ছোট ছোট ছেলেরা কীৰ্ত্তন করিল।
যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলেই যেন মাতিয়া গিয়াছে। মা
স্থির, ধীর, হাস্তময়ী। কখনও মহানন্দে হাততালি দিতেছেন—
কখনও শিশুদের নাচ দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন—আবার
কখনও স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা। প্রায় য়গ্টাখানেক তথায়
থাকিয়া কীৰ্ত্তনের দল মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিল। এবার
তাঁবুতে না আসিয়া সমুদ্রের ধারে যেখানে মার আশ্রমের
জন্ম জায়গা নেওয়া হইল, সেই স্থানটায় গিয়া সকলে
বসিলেন, কীৰ্ত্তন চলিল। সেইখানে সূর্য্যাস্ত হইল। লুট
বিলাইয়া সকলে মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। পরে
প্রনাদ বিতরণ হইতে লাগিল, বালুর উপর বসিয়াই সকলে

প্রসাদ পাইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় এই আনন্দ শেষ করিয়া সকলে বিদায় হইলেন। মাও শুইয়া পরিলেন।

১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা সমুদ্রের ধারে গিয়াছেন; প্রায় ১১টায় ফিরিয়াছেন। ফিরিয়া উপস্থিত সকলে মিলিয়া সচ্চিদানন্দ খেলায় বসিলেন। বেলা প্রায় ১২।০টায় মার ভোগ হইল। আজও বিশেষ কিছুই খাইলেন না। ভোগের পর মা শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই স্বালোক ও ছেলের দল আসিয়া জুটিল। দলে দলে সচ্চিদানন্দ খেলা চলিল; আর জপের কীর্তনের আনন্দ চলিতেছে। মা একধারে বসিয়া দেখিতেছেন। মধ্যে মধ্যে খেলায়ও যোগ দিতেছেন। সকলে আসিয়া গল্প-গুজব করিতেন, এখন আর তাহা বড় হয় না। খেলার ছলে নাম চলিতেছে। গতকল্য রাত্রিতে মুসলমান ডেপুটীবাবুর স্ত্রী মার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলেন, আজ তিনি নিজের বাড়িতে মাকে নিয়া গেলেন। মা ফিরিয়া আসিয়া নাম কীর্তন করাইতেছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্বে সমুদ্রের ধারে চলিলেন। ছেলেরা ধরিল—“মা—কাল যে নাম হঠয়াছিল, আজ তুমি বলিয়া দেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলিব।” ছেলেদের কথায় মা নাম করিতে লাগিলেন। বালুর চরে, সমুদ্রের ধারে, সূর্যাস্তের সময় সেই নাম কীর্তন বড়ই মধুর লাগিল। মা ছেলেদের বলিলেন—“তোমরা এখন বাসায় পড়াশুনা করিতে যাও।

নিজেদের লেখাপড়া ঠিক মত করিও, তাহাতে অবহেলা করিয়া তোমরা যদি বকুনী খাও তবে কিন্তু আমারই বকুনী খাওয়া হইবে—আমাকে বকুনী খাওয়াইও না”। মার কথায় ছেলের দল ফিরিয়া আসিল। একটু পরেই মা নাম করাইতে করাইতে মেয়েদের নিয়া তাঁবুতে আসিলেন। আবার একদল কীর্তন করিতে আসিয়াছে। বিরাজবাবুই প্রথমে বলিয়া দিতেছেন। মা স্থিরভাবে বসিয়া শুনিতেছেন। কীর্তনের পর ঘরে যে সব ফল আসিয়াছিল সব বিতরণ হইল। এক বাড়ী হইতে কয়েক সের দুধ পাঠাইয়াছিল—ফল পাঠাইয়াছিল, মুড়ি দিয়া মিশাইয়া সেই সব বিতরণ করা হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় একে একে সব বিদায় নিলেন। মা প্রায় ২টার পর শুইলেন।

১৯শে ফাল্গুন, বুধবার।

আজ মার শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। শুইয়া শুইয়া কথা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ৯টায় সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন। ১১টায় ফিরিলেন। আজ কিছুই খাইবেন না, বলিয়াছেন, “যখন বা বলিব।” একটু গরম দুধ মাত্র খাইলেন। বিকালে ছেলের দল ও স্ত্রীলোকের দলে তাঁবু ভরিয়া গিয়াছে। মা ছোট একজোড়া করতাল বাজাইয়া বাজাইয়া নাম করাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ সেকেণ্ড অফিসারের বাড়ীতে মাকে কীর্তনে নিয়া গেল।

সেখানে ভোলানাথ কীৰ্তনে খুব আনন্দ করিলেন। কীৰ্তনান্তে মাকে একটু জল খাওয়াইয়া দিলেন এবং সঙ্গীয় সকলকে প্রসাদ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। মা আজ আর কিছু খাইবেন না বলিলেন। আসিরাই মা শুইয়া পড়িলেন।

২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা বসিয়া আছেন। দুইদিন যাবত প্রায় কিছুই খাওয়া নাই। আজ তাড়াতাড়িই একটু খাওয়াইয়া দিলাম। মা অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে শুইয়া পড়িলেন। বৈকালে প্রত্যেক দিনের মতই স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছেন। দুপুরে ছেলের দলও আসিয়াছে। তাহারাও বলিতেছে—“মার নিকট হইতে বাইতে ইচ্ছা হয় না”। মার কাছে মেয়েরা কেহ কেহ, সংসারে দুঃখ পাইতেছে বলিয়া জানাইতেছেন। মা বলিতেছেন,—“তোমরা যে মালিক হইয়া বস তাই দুঃখ পাও, মালিক না হইয়া—মালী হও—তবেই আর দুঃখ থাকিবে না।” আজ আর মা সমুদ্রের ধারে গেলেন না, তাঁবুতেই বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত লোক আসা যাওয়া করিতেছে। কেহ কেহ মাকে গল্প বলিতে বলিতেছেন। মা একটা গল্প বলিলেন—“এক সাধু জঙ্গলে থাকিয়া তপস্বী করিতেছে, একটি লোকের তাহার প্রতি খুব শ্রদ্ধা হইল। সে গিয়া সাধুর চরণে আশ্রয় নিল, সাধুটি এক ছটাক চালের ভাত খায়। তাই

সে ভিক্ষা করে, আর সারাদিন তপস্বী করে ; কিন্তু এই লোকটি আশ্রয় নেওয়ার তাঁহার চিন্তা হইল যে এ আবার এক ছটাকের উপর ভাগ বসাইবে। কিন্তু আশ্রিত লোকটি খাওয়ার কথা সাধুটিকে কিছু বলিল না। সাধুটি যখন চাউল খুইয়া জল ফেলিতেছে, তখন সে অঞ্জলী ভরিয়া সেই জল পান করিল—তাহাতেই সে তৃপ্ত হইয়া সাধুটির সেবা করিতে লাগিল। সাধুটি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু কিছুই বলিলনা। কয়েকদিন পর আবার আর একজন আসিয়া সাধুর কুটীরে আশ্রয় নিল। সাধুটি ভাবিল, একজন তো জল খাইয়া আছে, এটি নিশ্চয়ই ভাতে ভাগ বসাইবে কিন্তু সেও তাহা করিল না। সেই লোকটি, সাধু যখন

ভাতের ফেন কাটিতেছে তখন তাহা
 “ভগবানই সব ব্যবস্থা
 করেন”, বিষয়ক গল্প।

নিবৃত্তি করিয়া সাধুর চরণে পড়িয়া
 রহিল। ইহা দেখিয়া সাধুর চৈতন্য হইল, তাহার ভুল
 ভাঙ্গিয়া গেল, সে বুঝিল ভগবানই সব ব্যবস্থা করেন।
 যখন যাহাকে যে কাজে পাঠান তাহাকে তদুপযোগী বুদ্ধি
 ও শক্তি তিনিই দিয়া দেন—কেহ কাহাকেও কিছু করে
 না। তখন সাধুটি ঐ আশ্রিত দুইজনকে নিয়া আরও
 গভীর জঙ্গলে তপস্বীর চলিয়া গেল এবং প্রাণ ভরিয়া
 ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।” সকলে বিদায় নিলে উপস্থিত
 কয়েকজনকে নিয়া মা সচ্চিদানন্দ খেলায় বসিলেন।

১১শে ফাল্গুন, শুক্রবার ।

আজও সকালে মা বাহির হন নাই। প্রতিদিনের মত আজও দৈনন্দিন ঘটনা ঘটয়া গেল। সন্ধ্যার পর আজ মাকে মোহিনীবাবুর বাসায় কীৰ্ত্তনে নিয়ে গেল। তথায় ভোলানাথের আনন্দে সকলে খুব আনন্দে কীৰ্ত্তনে বোগ দিল। কীৰ্ত্তন খুবই জমিয়া গেল। মেয়েরা শাঁক ও হলুধনি করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১২টার আমরা মাকে সহ তাঁবুতে ফিরিলাম। সেদিন রাত্রিতে মা বালুর চরে হাঁটিতে হাঁটিতে বলিতেছিলেন—“আবার সাপ সাপ দেখিতেছি।” আমি বলিলাম,—হয়তো আবার দেখা হইবে।” মা বলিলেন,—“সব সময় বাইরে দেখা নাও হয়, স্নানভাবে দর্শন হয়, আবার কখনও সাপের ছবি দেখা কিংবা সাপের গল্পও কেহ আসিয়া করিয়া যায়।” এই কথায় কথায় আমরা বাইরে কিছুক্ষণ কাটাইয়া তাঁবুর ভিতরে গেলাম। গিয়াই দেখি ভোলানাথ একটা কি বই পড়িতেছেন আর সেই পাতায়ই প্রকাণ্ড এক সাপের ছবি। মা হাসিয়া আমাকে দেখাইলেন। রাত্রি প্রায় ১টার মা শুইলেন।

২২শে ফাল্গুন, শনিবার ।

আজ সকালে মা একটু সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দুইজন স্কুলের মাস্টার ও যোগেন্দবাবু আসিয়াছেন।

কথায় কথায় সচ্চিদানন্দ খেলার কথা উঠিল। জ্যোতিষদাদা তাহাদের নিয়া খেলিতে বসিলেন। মা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। মার্টারটি বলিলেন, “এ খেলায় হারিলেও ক্ষতি নাই, নাম করা হইবে।” বাস্তবিকই যে সব ছেলে-মেয়েরা হয়তো কখনও নাম করে নাই, জপ করিতেই জানে না, তাহারাও জপ করিবার নিয়ম লিখিয়া নিতেছে এবং জপ করিতে হইতেছে। বেলা প্রায় ১০টায় মায়ের ভোগ হইল। মা আবার তাঁবুতে গিয়া বিছানায় বসিয়াছেন। শঙ্করানন্দ, ভোলানাথ, মা ও জ্যোতিষদাদার সচ্চিদানন্দ খেলা চলিতেছে। আজ সন্ধ্যায় মা মণীন্দ্রবাবুর আহ্বানে সরস্বতী বাড়ীতে কীৰ্ত্তনে গেলেন। লোকে লোকাবগ্য। মণীন্দ্রবাবুই তথায় সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আজও ভোলানাথ খুব মাতিয়া গেলেন। ভদ্রলোকেরা সকলেই আজ ভোলানাথের সহিত কীৰ্ত্তনে যোগ দিলেন। খুব আনন্দ হইল, রাত্রি ১২টায় আমরা তাঁবুতে ফিরিলাম।

২৩শে ফাল্গুন, রবিবার।

আজও মা উঠিবার পর হইতেই ভদ্রলোকেরা আসিয়া বসিয়া আছেন। আজ সকালে মাকে কাঁচা পেঁপে দিয়া একটু দুধ জ্বাল দিয়া খাওয়াইলাম। আর কিছুই খাইলেন না। আজও রজনীবাবুর বাসায় কীৰ্ত্তনে যাওয়ার কথা—তথা হইতে কীৰ্ত্তনের পর রামু যাইবেন। সেখান হইতে

প্রায়ই মাকে নিতে লোক আসিতেছে। মা দুপুরে শুইয়া
 আছেন। প্রতিদিনের মত আজও লোক আসিয়াছে।
 সন্ধ্যাবেলায় রজনীবাবুর (মোস্তার), বাসার কীৰ্ত্তনে বাওয়া
 হইল। রাত্রি প্রায় ১২টার জোয়ার আসিল। মার সঙ্গে
 দলবল সাম্পানে রামু চলিল। এখানকার কয়েকজন গেলেন।
 যোগেন বাবুর স্ত্রীও গেলেন।

—:0:—

সপ্তম অধ্যায় :



২৪শে ফাল্গুন, সোমবার ।

বেলা প্রায় ৯টার রামু পৌঁছলাম। কীর্তনের দল
মাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিতে আসিয়াছে। মহানন্দে সকলে
কীর্তন করিয়া চলিল। মা ও হাততালি দিতেছেন। তাতে
সকলেরই উৎসাহ বাড়িয়া যাইতেছে। মার পিছনে পিছনে
কীর্তনের দল চলিয়াছে। মা মধ্যে মধ্যে পিছন ফিরিয়া
বাম হাতখানি উঠাইয়া তালে তালে ঢুলাইতেছেন। তাহাতে
সকলেই খুব আনন্দ পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নাম করিতে
করিতে চলিয়াছে। আজ যেন রামকূটের সকলের কাছে
মা কত পরিচিতা। পথে বাইতে বাইতে যোগেনবাবুর স্ত্রীর
কাছে শুনলাম—যেদিন সরস্বতীবাড়ী কীর্তন হয়, সেদিন
একটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখানকার স্বর্গীয় উকীল
প্যারীবাবুর স্ত্রীর খুব ইচ্ছা মার কীর্তনাদিতে যোগ দেন,
কিন্তু ছেলের তেমন মত নাই। তাই আসিতে পারি নাই।
তাই নিজের দরজায় দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ
দেখিলেন, কালো এক মূর্তি। কাটিতে রক্তবস্ত্র, কৃষ্ণের মত

বাঁধা—মাথায় মুকুট বন্ধ করিতেছে। ইনি ইহা দেখিতেছেন—
স্পর্শ দেখিতেছেন। পরে বউ ও মেয়েকে ডাকাইয়া দেখিতে
বলিলেন। তাহারা প্রথমে একটু কেমন কেমন দেখিল—
পরে আর দেখিল না। কিন্তু তিনি দেখিতেছেন। যখন
লুটের জয়ধ্বনি দিয়া কীর্তন শেষ হইল, তখন আর কিছু
দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি রজনীবাবুর বাসায়
কীর্তনে আসিয়াছিলেন। মার নিকটেই বসিয়াছিলেন। মা
হঠাৎ তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও
জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ইনি কে?” তিনি বলিলেন, ‘প্যারী-
বাবুর স্ত্রী’, মা বলিলেন,—“ছেলের কাছে আছ বুঝি—
ইত্যাদি”, বলিয়া তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন।

যাক, রামুতে আমরা প্রথমে রামকুটের
রামু আগমন ও তথায় পঞ্চবটী স্থাপন।
পাহাড়ের উপর গেলাম। সেখানে

সকলে খুব আনন্দ করিল। সেখানকার
মালিক সাধুটি অসুস্থ, তাঁর ইচ্ছায় মার 'ভোগ' সেখানেই
হইল। বেলা প্রায় ৪টার আমরা নগেন্দ্র পালের বাড়ী
আসিলাম। সেখানেও ভোগের আয়োজন ও কীর্তনের
আয়োজন হইয়াছে। মা দরজায় আসিতেই পঞ্চপ্রদীপ
ইত্যাদি দিয়া মাকে বরণ করিয়া নিল। ঠাকুরমন্দির মার
জগ্য সাজান হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর ছেলে পেলে নাই
মাকে দুঃখ জানাইলে, মা বলিতেছেন—“আমিই তোমার
ছেলে-মেয়ে”—এই বলিয়া মা, মা, করিয়া ডাকিয়া তাহাকে

আনন্দ দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র পালের স্ত্রী-মাকে খাওয়াইয়া দিল। একবার সে বলিয়াছিল, “তুমিতো আমার মেয়ে। আমি তোমার সঙ্গে খাইব।” মা সে ইচ্ছাও পূর্ণ করিলেন। তাহার সঙ্গে একটু ফল মিষ্টি খাইলেন। আসিবার সময় চোখের জল ফেলিলেন, ‘আবার কল্পবাজার আসিবেন’, বলিলেন। সেদিনই রাত্রিতে কীর্ত্তন ও ভোগাদির পর প্রায় ১২টায় আমরা সাম্পানে কল্পবাজার ফিরিলাম। রামুর লোকগুলি যেন মার জন্ম এত অল্প সময়েই খুব মাতিয়া উঠিয়াছে। মাকে বিদায় দিবার সময় সকলে হাতজোড় করিয়া বসিয়া করুণাম্বরে একটা গান করিয়া মাকেশ্বানইল। গানটির পদ মনে নাই—মর্শ্ব। এই যে, মা তুমি আমাদের ছাড়িয়া গেলে আমরা যে মাতৃহারা হইব। ওগো করুণাময়ী তুমি আমাদের চরণছাড়া করিওনা—আমরা তোমার অধম সন্তান ইত্যাদি। মা এদের ওখানকার একটা জায়গা দেখাইয়া বলিলেন,—“এটা পঞ্চবটী স্থানের মত হইলে বেশ হয়।” সে জায়গাটা রামকূট।

রামকূট গিয়া সেই পঞ্চবটী কোথায় হইবে, জ্যোতিষদাদা বলিতেই স্থানীয় একটি লোক বলিল,—“কয়েকদিন হইয়া জঙ্গলের মধ্যে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে, সেটাই নাকি পূর্বে রামকূট ছিল, এখন এখানে মূর্ত্তি ইত্যাদি নিয়া আসিয়াছে। সেখানেই পঞ্চবটী তৈরায় হউক।” অমনি

মাকে নিয়া সেস্থানে যাওয়া হইল—খুব জঙ্গল কাটিয়া কাটিয়া
আমরা মাকে নিয়া সেইস্থানে গিয়া দেখি একটা স্থান
বাঁধান ছিল এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ বলিল—বৌদ্ধ
মন্দির ছিল। মা বলিলেন—“বাহাই থাকুক—ধর্মস্থান ছিলতো ?
পুরান স্থান—এই স্থানটাতেই হউক।” স্থানীয় লোকদের
বলিয়া আসা হইল। সেখানকার লোকেরা কীর্তন করিতে
করিতে মাকে সাম্পানে পৌঁছাইয়া দিল। তাহারা নাম ধরিল,—

প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ বলে ডাকরে, নিতাইর সমান
দয়াল আর নাইরে।

নমঃ রামনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হরে, জনার্দন মধুসূদন রে।

জয়গুরু জয়গুরু বল অবিরাম, তারকব্রহ্ম সনাতন
পূর্ণ করবে মনস্কাম।

গ্রামবাসীদের সরল ভক্তি বিশ্বাস এবং যত্নে সঙ্গীয়
সকলেই খুব আনন্দ পাইলেন।

২৫শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ ভোর হইতেই আমরা কল্পবাজার ঘাটে পৌঁছাইলাম।
বিরাজবাবু প্রভৃতি উষা কীর্তন করিতে করিতে মাকে তাঁবুতে
নিয়া আসিলেন। গান ধরিলেন,—

ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের নাম রে ;
যে জন গোবিন্দ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে।

ওরে ওরে মৃত মন, জান জান রে, জানিয়া হরিগুণ গাও রে ;
 প্রভাত-সময়-কালে পাখীরা সব ডালে ডালে,
 আনন্দে হরিগুণ গায় রে, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

তখন কল্পবাজার নিদ্রিত—গানের শব্দে, মা কিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া, অনেকে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন । মা তাঁবুতে আসিয়াছেন, দুই একজন আসিয়া বসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে মা আলাপ করিতেছেন । খানিক পরে মা কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন । রামুতেও লোকের খুব ভীড় হইয়াছিল । বেলা প্রায় দশটায় মা উঠিলেন, মার ভোগ হইল । দুপুরে সচ্চিদানন্দ খেলা জমিয়া উঠিল । সন্ধ্যাবেলায় সকলে আসিয়াছেন, আজ ধোপাবাড়ী মাকে কীর্তনে লইয়া যাইবে । সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফবাবু সন্ত্রোক, মোহিনী বাবুর স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ধোপাবাড়ী গেলেন । ভোলানাথ মহানন্দে কীর্তনে যোগ দিলেন । ধোপাবাড়িতে যত্নের ক্রটি নাই । কীর্তনান্তে আমরা সকলে মিলিয়া ফল কাটিয়া বিতরণ করিলাম । গৃহিণী, মা যাইতেই প্রদীপ দিয়া বরণ করিয়া লইল—পাখা দিয়া ছিটাইল—নতাপাতা দিয়া দরজা সাজাইয়াছে । মা ও ভোলানাথের পা ধোয়াইয়া চুল দিয়া মুছিয়া লইল । সকলেই বেশ আনন্দ পাইলাম । আগামী কল্য দুপুরে মাকে নিয়া মেয়েরা কীর্তন করিবেন স্থির হইয়াছে । রাত্রি প্রায় ১১০টায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেল ।

২৬শে কাঙ্কন, বুধবার।

সকালে উঠিয়াই মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলেন, তথা হইতে সহরের দিকেও বেড়াইয়া আসিলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সকলকে নিয়া বাহির হইলেন—মেথরপটিতে গিয়া সকলকে নিয়া কীর্তন করিলেন। পরে ছেলেদের স্কুলে গেলেন, তাহারা মাকে অভিনন্দন করিল—তথা হইতে হাঁসপাতালে গেলেন—ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় ১২টায় তাঁবুতে আসিলেন। ভোগের পর মেয়েদের কীর্তন হইল। সন্ধ্যায় কীর্তন শেষ হইল। এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর কীর্তন নিয়া আসিয়া মাকে কীর্তন শুনাইলেন।

২৭শে কাঙ্কন, বৃহস্পতিবার।

মা অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। আজ মাকে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি ভোগ দিলেন। খাইতে খাইতে চারটা বাজিয়া গেল। মা আহারের পরই বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার আহারের পূর্ব হইতে ভক্তগণ সার্বোচ্চ প্রণিপাত করিয়া পিড়িয়া আছে কারণ তাহারা শুনিয়াছে মা আগামী কল্যাই চলিয়া যাইবেন। তাহারা যাইতে দিবে না বলিয়া মার চরণ তলে দলে দলে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে—অনেক করিয়া বলিয়াও তাহাদের উঠাইতে পারিলেন না, পরে আহারে গেলেন। ছেলেরা ৮টা অবধি ওই ভাবে পড়িয়া রহিল। সকলের অনুরোধে মার আগামী কল্য যাওয়া

স্বর্গিত হইল। দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গিয়া মেয়েদের নিয়া কীর্তন করিলেন, তথা হইতে আরও ২।৪ বাসায় নিয়া গেল। পরে মহেন্দ্রবাবুর বাসায় কীর্তনে গেলেন। সেখান হইতে রাত্রি ১টার ফিরিলেন, শুইতে প্রায় রাত্রি ২।০টা বাজিল। ২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

আজও মা অনেক বেলা পর্যন্তই শুইয়া ছিলেন। তারপর ভদ্রলোকেরা আসিয়া বসিলেন। মা উঠিলে নানা কথা হইতে লাগিল। আজ শিবরাত্রি, মা কিছু খাইলেন না। মেথরের দল, ধোপার দল আসিয়া মাকে কীর্তন শুনাইল। পরে সন্ধ্যায় বঙ্কিমদাদা কীর্তন করাইলেন। কীর্তনের সময় অনেকেই মাকে পূজা করিতে আসিয়াছে। মা সব স্ত্রীলোকদের দিয়া (তাহাদের স্বামী উপস্থিত), স্বামী পূজা করাইলেন। কয়েকজন স্ত্রীলোক শিবপূজাও করিল। রাত্রি ১টার সময় সকলে বিদায় নিলেন। আগামী কল্য মার কল্পবাজার ত্যাগ করিবার কথা স্থির হইয়াছে, সকলেই বিষম। এখানকার সকলেই যেন মাকে লইয়া মাতিয়া আছে—এই আনন্দমেলা কাল ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া সকলেই প্রায় কাঁদিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—আজ দুই তিন দিন যাবৎ রাত্রিতেও তাহাদের ঘুম হয় নাই। বাড়ী বাড়ী কীর্তন, তাঁবুতে প্রায় সময়তেই নাম কীর্তন লাগিয়া আছে। কীর্তনে লোকও যথেষ্ট হয়; ভোলানাথ মাতিয়া যান, তাহাতে সকলেই আনন্দে

নাচিতে থাকে। নামে নামে যেন বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। অনেক নিজের বাড়ীতে গিয়া গভীর রাত্রে কীৰ্ত্তনের শব্দ পায়। এত আনন্দের খেলা কালই ফুরাইয়া যাইবে, সকলেরই চোখে জল। রাত্রি প্রায় ২টার সময় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

—:0:—

অষ্টম অধ্যায়

—: * :—

২৯শে ফাল্গুন, শনিবার।

আজ ভোর বেলা হইতেই মার কাছে সকলে আসিতেছেন। প্রায় ৭।০টা-৮টার মধ্যেই মা রওনা হইবেন। মা একবার একটু সমুদ্রের ধারে গেলেন, তখনই ফিরিয়া আসিলেন। মাকে একখানি চেয়ারে বসানো হইল। সকলেই ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোকেরা সিন্দুর, ধান-দূর্ব্বা প্রভৃতি দিতেছেন। পুরুষেরা খোল, করতাল, হারমোনিয়াম নিয়া প্রস্তুত। মাকে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে সাম্পানে উঠাইয়া দিবে। যথাসময়ে মা রওনা হইলেন। পিছনে

সকলে মা-মা-মা-মা-মা-মা গাহিয়া চলিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতেছে ও বলিতেছে, “আজ কি করিয়া থাকিব! আজ যে আমাদের বিজয়-দশমী।” আজ কল্পবাজার ত্যাগ।

মা-মা গানও যেন বিষাদস্বরে সকলের প্রাণে বাজিতেছে। পথে মা একবার দীনবন্ধুবাবুর বাসায় ঢুকিলেন। তাঁহারা মাকে নিজের বাড়ীর মেয়ের মত মনে করে। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—“মা আবার শীঘ্র আসিও।” ফল, মিষ্টি লইয়া সকলে আসিতেছে। ভাবিতেছে—মা তাহার জিনিষ একটু লইলে, সে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। দীনবন্ধুবাবুর বাসা হইতে মাকে সমুদ্রের দিকে নিয়া যাওয়া হইল। লোকে-লোকার্ণা! আর, কীৰ্ত্তন চলিতেছে। সকলে সজল-চক্ষে মাকে প্রণাম করিতেছে ও দয়া ভিক্ষা করিতেছে। মাও হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিতেছেন। এই ভাবে বিদায় উৎসব শেষ করিয়া মা গিয়া সাম্পানে উঠিলেন। খানিকটা সাম্পানে গিয়া ষ্টীমার ধরিতে হইবে। যতদূর সাম্পান দেখা যায় সকলে তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। বহুদূর গিয়া আমরা দেখিলাম, তখন দল ফিরিতেছে।

ষ্টীমারে আসিয়া মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ২টায় মা উঠিয়াছেন। এক ভদ্রলোক মা'র সহিত দেখা করিতে

আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন—“মা ধর্ম ধর্ম সবাই করে, কিন্তু বাস্তবিক ধর্মটা কি?” মা বলিলেন, “যাহা সকলেই চায়, তাহা পাইবার সহায়ক যে সব কর্ম, তাহাই ধর্ম। তাহাই স্বভাবের কর্ম, আর যাহা অশান্তি দুঃখ আনে, তাহাই অভাবের কর্ম, তাহাই অধর্ম।” তিনি বলিলেন, “কেহ টাকা চায়, কেহ ঘশ চায়।” মা বলিলেন—“টাকা চায় সত্য, কিন্তু টাকাতে অভাব বাড়াইয়া অশান্তিই বাড়ায় শান্তি পায় না, কাজেই তাহা স্বভাবের কর্ম হইল না।

আমরা চাই শান্তি ও আনন্দ। সংসারের

ধর্ম ধর্ম সকলে করে,
বাস্তবিক ধর্ম কি?

বিষয়ে খণ্ড আনন্দ পাওয়া বাইতে
পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের তৃপ্তি

হয় না। আমরা চাই অখণ্ড আনন্দ—অখণ্ড শান্তি। তাহা পাইবার সহায়ক কর্ম সকল নেওয়া দরকার।” কথাবার্তার পর মা গিয়া বাহিরে বসিয়াছেন। জ্যোতিষদাদা সামনের একটি পাহাড় দেখাইয়া বলিতেছেন—“মা প্রবাদ আছে, হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বত নিয়া যায় তখন খানিক ঔষধের গাছ এই পাহাড়ে ছিঁড়িয়া পড়ে, তাই এই পাহাড়ে নাকি অনেক ঔষধ পাওয়া যায়।” মা হাসিয়া বলিলেন—“বেশ তো হনুমান কৃপা করিয়াছে। যতক্ষণ ক্রিয়া, ততক্ষণই কৃপা। ক্রিয়া না থাকিলে, দুই না থাকিলে কৃপা কে কার কাছে প্রার্থনা করে? দুই না থাকিলে ক্রিয়াও হয় না।”

আমরা প্রায় বেলা ৫টায় চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া রাজেশ্বরের বাড়ীতে উঠিলাম। এই মন্দিরে মারও একখানা আসন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মন্দিরের সেবায়ত শীতল ঠাকুর মহাশয়, মার বড় ভক্ত। কল্লবাজার ছাড়িবার পূর্বদিন মা মেয়েদের নিয়া সমুদ্রে স্নান করিলেন। সে কি আনন্দ! হাত ধরাধরি করিয়া জয় শিব শঙ্কর—বম্ বম্ হর হর—নাম করিয়া মা সমুদ্রের ভিতরে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছেন,—জলকেলিতে সকলেই মহা আনন্দ পাইলেন। বহু স্ত্রীলোক নামিয়াছেন, আবার অপর দিকে

চট্টগ্রাম আগমন। পুরুষেরাও নামিয়াছেন। মা স্ত্রীলোকদের

চারি জনকে নিয়া বেশী ঢেউয়ের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। চারজনে ধরাধরি করিয়া দোল দিতে লাগিল। মা ঢেউয়ের সাথে সাথে দোল খাইতেছেন। এইসব খেলা প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিল। তারপর জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর নাম করিতে করিতে মা দলবল নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। চট্টগ্রামে আসা মাত্রই লোকজন ঘিরিয়া বসিল। রাত্রিতে মা যশোদাবাবুর বাসায় উঠানে গিয়া বসিলেন। সামান্য একটু ফল, দুধ খাইয়া পুনরায় রাজেশ্বরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। মন্দিরের বারান্দায়ই মা'র আসন পাতা হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিলেন।

৩০শে ফাল্গুন, রবিবার।

প্রাতে মা উঠিয়া বসিয়াছেন। অনেকেই আসিয়াছেন। রামঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও চন্দ্রনাথ ঘোষালের স্ত্রী মাকে ঠাকুরের আশ্রমে, পাহাড়তলী নিয়া গেলেন। সেখানে আশ্রমবাসীরা মাকে ভোগ দিবার জন্ত রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু সময় অভাবে থাকা হইল না। বিশেষতঃ যশোদাবাবুর বাসায় ভোগের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা মাকে মিষ্টি ও ফল দিয়া ভোগ দিলেন। সব যাঁয়গাটা মাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন। মা প্রায় ঘণ্টাখানেক তথায় থাকিয়া

ফিরিয়া আসিলেন। শশীবাবু প্রভৃতির পঠিকোড়ায় গমন।

বিশেষ অনুরোধে আজ আবার পঠিকোড়া যাওয়া স্থির হইয়াছে। প্রায় বেলায় ৩টায় খাওয়া দাওয়ার পর সাম্পানে পঠিকোড়া রওনা হওয়া হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই মাকে আবার পাইয়া সকলেই মহা আনন্দিত হইলেন। সন্ধ্যায় সময় আমরা পঠিকোড়া পৌছিলাম।

১লা চৈত্র, সোমবার।

আজ পঠিকোড়ার সকলে খবর পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ৩টায় মা'র ভোগ সাজান হইল। বাহিরের উঠানে মাকে ও ভোলানাথকে মধ্যে বসাইয়া সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। মহানন্দে ভোগের ব্যাপার শেষ হইল।

মা একটু একটু মুখে দিলেন মাত্র। আর এক একজনকে বাটি ধরিয়া দিয়া দিতেছেন, আর বলিতেছেন,—“দেখ, আমি সব খাইয়া শেষ করিয়া দিতেছি।” একজন বলিল, “তুমি তো খাইলে না।” মা বলিলেন, “সবই তো সেই একজনেরই মুখ, ঐ মুখে খাইতেছি।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দুপুর বেলা আজ খুব আনন্দে সচ্চিদানন্দর খেলা চলিল। সন্ধ্যার পর কীর্তনীয়ারা আসিল—খুব কীর্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১০টার কীর্তনীয়ারা কীর্তন শেষ হইল। তখন নিজেরা কীর্তন করিতে লাগিল। ভোলানাথ কীর্তনে নাচিতেছেন। মা মেয়েদের নিয়া ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নাম করিতে লাগিলেন। বেশী রাত্রি হইল, একে একে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় নিলেন। আজই রাত্রি ৪টার চট্টগ্রাম পঠৈকোড়া ত্যাগ। রওনা হওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

আজ বৈকালেই বাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ছেলেরা বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসায় রাত্রি ৪টার রওনা হওয়া স্থির হইয়াছে। আনন্দ-কোলাহলে রাত্রি প্রায় ২টা বাজিল। ভোর ৪টা কি ৪।০টার—আমরা চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। মোটরে খানিকদূর আসিয়া সাম্পানে উঠিলাম।

২রা চৈত্র, মঙ্গলবার।

বেলা প্রায় ৬টার আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। ঘাটেই ইন্সপেক্টর অফিসার নৃপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাসা ; তাহার

ষাট হইতেই মাকে নিয়া নিজেদের বাড়ী একটু নিয়া গেল
এবং নিজেই মোটরে করিয়া মাকে
চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন।

রাজেশ্বরের বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া গেল।
বেলা প্রায় ১১টায় জিতেন্দ্র ঘোষালের বাড়ী ভোগে মাকে নিয়া
গেল। বৈকালে ৪টায় মা আবার রাজেশ্বরের বাড়ি ফিরিলেন।
আজ সন্ধ্যায় মাকে গিরিজাবাবুর বাসায় লইয়া গেলেন।
রাত্রি ১১টায় ফিরিলেন। আসিয়া দেখি রাজেশ্বরের বাড়ীতে
একদল বসিয়া কীর্তন করিতেছে। মাকে দেখিয়া কীর্তন
খুব জমিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১টায় তাহারা বিদায় নিলেন।
৩রা চৈত্র, বুধবার।

সকালে মা উঠিলেন। অনন্তবাবুর বাসায় মাকে নিয়া
গেল। অনন্তবাবুর বসন্ত হইয়াছিল তাহাতে তাহার স্ত্রী মানত
করিয়াছিল মাকে ডাবের জল, দুধ দিয়া স্নান করাইবেন।
অনন্তবাবু ভাল হইয়াছেন, আজ তাহারা মাকে মানতের স্নান
করাইতে বাসায় নিয়া গেলেন। স্নানাদি হইয়া গেল।
পরে কিছুক্ষণ গ্রামোফোন বাজান হইল। বেলা প্রায় ১১টায়
মাকে গিরিজাবাবুর বাসায় ভোগে নিয়া গেলেন। অনেকই
প্রসাদ পাইলেন। বেলা প্রায় ৫টায় উপেন্দ্র পালের স্ত্রী

মার মেয়েদের ও নির্খলা
মাকে নিয়া কীর্তন ও
নির্খলা মা ভাবাবিষ্ট।

মাকে তাহার বাসায় নিয়া গেলেন।
তথায় কিছু জলযোগাদি করাইলেন।
সেখান হইতে মাকে সুরেন্দ্র ঘোষালের
বাড়ী কীর্তনে নিয়া গেলেন। একজন

ভাল কীর্তনীয় (প্রাণহরিদাস), কীর্তন করিলেন। নির্মলা মাও এখানে আসিয়াছেন। তিনি তথায় মার সঙ্গে গিয়াছেন। বখন নাম কীর্তন আরম্ভ হইল মাও নির্মলা মা ও মেয়েদেয় নিয়া একধারে দাঁড়াইয়া নাম করিলেন ও করাইলেন। নির্মলা মা ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। অনেক লোক প্রসাদ পাইলেন। নির্মলামাকে শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১টায় মা তথা হইতে আসিলেন। নির্মলামাকেও নিয়া আসা হইল। রাত্রি ২।০টা পর্যন্ত কথাবার্তা চলিল।

৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

ভোরে অনন্তবাবু আসিয়া গ্রামোফোন বাজাইতে বসিলেন। মা শুইয়া আছেন। চন্দ্রনাথবাবুর বাসায় ভোগের কথা স্থির হইয়াছে। জজসাহেব তাঁহার বাংলোয় গাকে নিতে চাহিয়াছেন। বৈকালে ৪।০টার সময় তথায় যাওয়া হইবে। আজই রাত্রির গাড়ীতে মা চাঁদপুর যাইবেন, এখনও প্রকাশ করেন নাই। একটু বেলা হইতেই বৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃশোদাবাবুদের পরিচিতি এক মা আসিয়াছেন, নাম মুক্তকেশী মা। বৃষ্টির মধ্যে মা হঠাৎ একা একা বাহির হইয়া রাজেশ্বরের বাড়ী হইতে বৃশোদাবাবুর বাসায় ভিজিতে ভিজিতে, হাততালি দিতে দিতে, ‘জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ এই গান করিতে করিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে দেখিয়া অনেকেই বৃষ্টির মধ্যে

মার সঙ্গে কীর্তনে মুক্তকেশী
মা ও নির্মলা মার ভাবাবিষ্ট
অবস্থা চট্টগ্রাম ত্যাগের
পূর্বে জজসাহেবের মাকে
দর্শন।

নামিয়া ঐ নাম করিতে লাগিলেন।
যশোদাবাবুর স্ত্রী দুঃখ করিতেছিলেন,
মা চলিয়া যাইতেছেন, এত অল্প সময়ের
মধ্যে তাঁর বাসায় নামকীর্তন হইল না,
তাই মা আজ সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

করিলেন। মার দুই আঁচলে নির্মলা ও মুক্তকেশী মার
কাপড়ের আঁচলকে বাঁধিয়া দিল। মহানন্দে কীর্তন চলিল।
ধীরে ধীরে মা সকলকে নিয়া, রাজেশ্বরের বাড়ী আসিলেন।
সেখানে নাটমন্দিরে কীর্তন আরম্ভ হইতেই মুক্তকেশী মা
ভাবে একেবারে ধরাশায়ী হইলেন। নির্মলা মা ভাবে বিভোর
হইয়া তালে তালে নাচিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দ
পাইলেন। মা আস্তে আস্তে কাপড়ের বাঁধ খুলিয়া একধারে
আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতেছেন।
মুক্তকেশী মা একটু পরেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নামকীর্তন করিতে
লাগিলেন। নির্মলা মার ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া ধীরে ধীরে
নাম বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ঘরে নিয়া আসা হইল।
কাপড় ছাড়াইয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। খানিক পরে
তিনি উঠিয়া স্নানাদি করিয়া একটু জল খাইয়া শুইয়া
পড়িলেন। মাকে জটু দাদার বাসায় নিয়া গেল। সেখানে
সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিলেন। বেলা প্রায় ১২টায়
মাকে চন্দ্রমাধববাবুর বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে
ভোগ হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চন্দ্রমাধববাবুর স্ত্রী মাকে-

অনুরোধ করিয়াছেন,—“মা এখন যেন বৃষ্টি হয়না, তা হইলে বড়ই বিপদ।” বাইরে মার বসিবার ও আহারের জায়গা হইয়াছে। বৃষ্টির ভয়ে আর সকলেরই স্থান বারান্দায় হইয়াছিল। একটু পরেই দেখা গেল, ধীরে ধীরে একটু রৌদ্র উঠিয়াছে। তখন মা, ভোলানাথ ও হেম ভাইকে সকলে মাঝখানে বসাইয়া উঠানেই প্রসাদ নিতে বসিয়া গেলেন, আর বৃষ্টি হইল না। মা ভোগের পর একটু শুইয়া রহিলেন, কীর্তন চলিতে লাগিল। মা মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া দেখিতেছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই মা উঠিয়া বসিলেন। মা আজ চলিয়া বাইবেন, কাজেই মা শুইয়া থাকেন—কাহারও ইচ্ছা নয়। নির্মলা মাও গিয়াছেন। বেলা প্রায় ৪টায় মাকে চন্দ্রনাথবাবুর বাসা হইতে শশীবাবু তাঁহার ষ্টুডিওতে নিয়া গেলেন। সেখানে মার ফটো তোলা হইল। আমি সঙ্গে ছিলাম, মাকে নিয়া রাজেশ্বরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। বেলা ৫টায় জজসাহেবের বাংলোয় গেলেন। ইতিমধ্যে কীর্তনীদ্বারা আসিয়াছে, মা বলিয়া গেলেন, “তোমরা কীর্তন আরম্ভ কর আমি এখনই আসিতেছি।” মা আজই ৯টায় ফৈশনে বাইবেন। চাঁদপুর বাইতেছেন, তাই একটু বেলা থাকিতেই কীর্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন, বাহাতে বাইবার পূর্বে কীর্তন শেষ হয়। মা আজই বাইবেন, আবার কীর্তনের মধ্য হইতে উঠিয়া যাওয়া ঠিক নয় তাই মা পূর্বেই বলিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবেই কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। লোকে

লোকারণ্য অনেকেরই আজ কীৰ্ত্তনে মন নাই। কীৰ্ত্তনে মন একটু লাগিলেই আবার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছে যে মা আজই চলিয়া যাইবেন। অনেকেরই চোখে জল। রাজেশ্বরের বাড়ীর শীতলঠাকুরের স্ত্রীর অবিবর্ত কান্না চলিতেছে। মা জজসাহেবের বাংলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কীৰ্ত্তনের মধ্যে রসিলেন। যাইবার সময় হইয়া আসিল। একজন ভদ্রলোক দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছেন তাই ভোলানাথ আজ যাইতে পারিতেছেন না আগামী কল্য দীক্ষা দিয়া তিনি যাইবেন। মা বলিতেছেন, “আমি যখন আজই যাইব বলিয়া ফেলিয়াছি তখন আমি আজই যাই তুমি কাল আসিও। আমি গিয়া চাঁদপুর গিরিজার বাসায় থাকিব।” ভোলানাথ রাজি হইলেন, শঙ্করানন্দ তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। মার সঙ্গে আমি অখণ্ডানন্দ স্বামী ও জ্যোতিষদাদা আসিলাম। সকলের চোখের জলের মধ্যে মা বিদায় নিতেছেন—সে এক অপূৰ্ব দৃশ্য। প্রণামের জগু হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে, আবার কয়েকজন স্থির ভাবে সজল নয়নে শুধু মার মুখের দিকে চাহিয়াই দূরে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা সুরেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের মোটরে স্টেশনে আসিলাম। ঘোষাল মহাশয়েরাও সপরিবারে স্টেশনে আসিয়াছেন, আরও অনেকেই আসিয়াছেন। গিরিজা বাবুও সপরিবারে আসিয়াছেন। সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। যাঁহার নূতন পরিচিত তাঁহার মার সহিত আলাপ করিতেছেন। মার মধুর উপদেশবাণী শুনিয়া

কৃতার্থ হইতেছেন। শীতলঠাকুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে ছিলেন। ভীড়ের মধ্যে কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই কিন্তু মার চক্ষে তাহা এড়ায় নাই। মা হাসিয়া বলিতেছেন, “শীতল বাবা কই?” এই বলিয়া দূরে গাছতলার দিকে চাহিয়া, “শীতল বাবা শীতল বাবা”—বলিয়া ডাকিতেছেন ও হাসিতেছেন। তখন সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। শীতলঠাকুরকে ধরিয়া আনিয়া মার পায়ের কাছে বসাইয়া দেওয়া হইল। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, “কি লোককেই তুমি মন্দিরে স্থান দিয়াছিলে, এখন কাঁদাইয়া যাইতেছে।” আবার বলিতেছেন, “আচ্ছা দেখত আমিহা হাসিতেছি; যে হাসে তাহার জন্ম আবার তোমরা কাঁদিতেছ, যে হাসে তাহার জন্ম লোক কাঁদে নাকি,” এই বলিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “তবে এই যে হাসিটা প্রকাশ পাইতেছে ইহাও কান্না বলিতে পার। কিছু একটা প্রকাশ হইতেছে ত;

সেই হিসাবে কাঁদিতেছি বলিতে পার।”

মাকে বিদায় দিবার করুণ

দৃশ্য।

পরে সকলের কাছে একটু একটু

নাম করিবার ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল। হীরু ছেলেটি সীতাকুণ্ডে মার কাছে কিছুদিন ছিল, ডাক্তারী পড়ে, সে হঠাৎ আর চাপিতে না পারিয়া সশব্দে কাঁদিয়া উঠিল। মা সকলকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে বলিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কাহারও আকুল বেদনার জগতের কেহই দাঁড়াইয়া থাকে না, গাড়ীও দাঁড়াইল

না। কয়েকজন ছেলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল। অগ্ৰাহ সকলে চিত্রপুস্তলিকার মত মার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কল্পবাজার যাওয়ায় সকলেরই মনে ভরসা ছিল মা চট্টগ্রাম দিয়াই ফিরিবেন, দেখা হইবেই কিন্তু আজ সকলেই ভাবিতেছে কি জানি কবে দেখা পাইব। এইভাবে চট্টগ্রামের লীলা শেষ করিয়া মা চাঁদপুর চলিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পরই মা শুইয়া পড়িলেন ইহা আরও দেখিয়াছি। কে জানে ভক্তদের প্রাণের বেদনা মার প্রাণে আঘাত করে কি না। রাত্রি প্রায় ৪টায় চাঁদপুর পৌঁছিয়া তখন গিরিজাবাবুকে (ভোলানাথের ভাগিনেয়), খবর দেওয়া হইল না ফেঁশন মাস্টারকে বলায় তিনি মাকে ওয়েটিংরুমে নিয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহারা সকলেই গতবার মার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। যাওয়ার সময় মা ও আর সব নিয়া ফেঁশনে আসিয়াছিলেন। তিনি রেলওয়ের ডাক্তার, কাজেই রেলওয়ের কর্মচারী অনেকেই আসিয়া তখনই মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিজাবাবুকে খবর পাঠান হইল।

এই চৈত্র, শুক্রবার।

বেলা ৬টা বাজিতেই গিরিজাবাবুগিয়া উপস্থিত। আমাদের নিয়া তিনি নিজ বাসায় আসিলেন এবং হাঁসপাতালের একটা ঘর খালি করিয়া মার থাকিবার স্থান করিয়া দিলেন। আমরা তথায় আশ্রয় নিলাম। খবর পাইয়া সকলে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

কলিকাতা যাবার পথে দুপুরে মা কিছু সময় পড়িয়াছিলেন।
 চাঁদপুরে আগমন মা উঠিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্তা
 বলিতে লাগিলেন। কীর্তনাদি হইল। খবর পাইয়া পূর্ণ
 বাবু (কৃষ্ণনগরে যিনি ছিলেন), আসিয়াছেন। তিনি নদীর
 ওপারে থাকেন। সন্ধ্যায় আসিয়া মাকে নিজ বাসায় নিয়া
 যাইবেন বলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর পর্যন্ত মেয়েরা আসা
 যাওয়া করিতে লাগিল তারপর মা উঠিয়া রাস্তায় একটু
 হাঁটিতে লাগিলেন। আমি ও গিরিজাদাদা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে
 লাগিলাম, অনেক কথা হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্ন
 কুশারীকে যে বলা হইয়াছিল, “আপনি এখন সংসার ছাড়িয়া
 যান”—তিনি যান নাই, পরে তাঁহার পুত্র বিয়োগ হইল।
 মা নিজ ভাব হইতে যে কথা বলেন, সব সময় আমরা
 তাহা নিজেদের মনের মত না হইলেই তাহা পালন করি
 না। এক্ষেত্রেও তাই হইয়াছিল, যখন কালীপ্রসন্নবাবুর
 দ্বিতীয় ছেলে কঠীন রোগে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসে;
 তারপর মা তারাপীঠ আসিলেন, কালীপ্রসন্নবাবুও সপরিবারে
 গিয়াছেন, মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনি এখন সস্ত্রীক
 সংসার ছাড়িয়া দেন, দূরে যাইতে না চান সিদ্ধেশ্বরী
 আশ্রমে গিয়া থাকেন”; কিন্তু তিনি জানাইলেন, তৃতীয়
 ছেলে হরিদাসের বিবাহ না দিয়া যাওয়া হয়না। মা
 তাহাতে বলিলেন, “বেশ তাই হইবে, বিবাহের পরই
 চলিয়া যাইও। এই কয়দিন শিবপূজা নিয়া প্রত্যহ শিব-

পূজাদি কর। এরপর মা যখন শ্রীরামপুর গেলেন, তখন প্রথম ছেলে—এই গিরিজাবাবু ও দ্বিতীয় ছেলে আসিয়া মাকে ধরিলেন ‘বাবাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না’ তখন মা ছাতের কোঠায় থাকিবার ব্যবস্থা দিলেন—তাও তাদের সুবিধা হইবে না বলায় মা অণ্ড একটা বিধান দিলেন। সেই কথাই বলিতেছেন—“অণ্ড একটা বিধান ত নয়, কিছু একটা না বলিলে তোমরা মনে করিতে পার আমি বুঝি রাগ করিয়াছি, তাই তোমাদের ভাব অনুসারেই একটা কিছু বলা হয়।” এই ঘটনার কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন বাবুর দ্বিতীয় ছেলে মারা যায়—তখন সকলেই বুঝিল মার বিধান পালন করাই বোধ হয় মঙ্গলকর ছিল। কিন্তু যাহা হইবার হইবেই। পূর্ণবাবুর সন্ধ্যায় আসিবার কথা, রাত্রি চটা বাজিয়া যায়, তিনি আসেন না। মা রাস্তা হইতে আসিয়া পায়খানায় গেলেন, পায়খানায় সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন, “হয়ত এখনই বাবাজি (পূর্ণবাবু) আসিয়া বলিবে, মা চলুন। এই কথা বলিতে বলিতে মা গিয়া পায়খানায় ঢুকিলেন। বোধহয় একমিনিটের মধ্যেই পূর্ণবাবু সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত। মা আসিলে অনেকেরই, এত রাত্রিতে নৌকায় ওপারে যাওয়া অমত হইল, কিন্তু পূর্ণবাবু ও তাহার স্ত্রীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মা তাঁহার বাসায় চলিলেন। জ্যোতিষদাদা শারীরিক অসুস্থতার জন্য গেলেন না, আমিও অখণ্ডানন্দজী

গিরিজাবাবুর সঙ্গে চলিলাম। ঘাটে গিয়া ডেপুটিবাবুর নৌকায় উঠিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, বেশ লাগিতেছিল। পূর্ণবাবুর মেয়েটি গান ধরিল—

‘বল্‌রে জবা বল্‌ ! কোন সাধনায়
পেলিরে তুই মায়ের চরণতল’

আমরা পূর্ণবাবুর বাসায় উঠিলাম। ছেলে মেয়েরা নাম করিল। আগামীকাল আসিবার জন্ত আবার বিশেষ অনুরোধ করিয়া মাকে তাহারা বিদায় দিলেন। পূর্ণবাবু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার আসিয়া বাহিরে গাছতলায় বসিলেন। জ্যোতিষদাদার সহিত কথা হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ২টার মা শুইলেন।

৬ই চৈত্র, শনিবার।

আজ ভোর রাত্রিতেই ভোলানাথ শঙ্করানন্দ ও জুটু আসিয়া পৌঁছিল। বেলা প্রায় ৭টার মা উঠিয়াছেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। খানিকপরে মাকে উঠাইয়া নিয়া মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। বাংলাদেশ সিন্দুরে সিন্দুরে মাকে স্নবচণী ঠাকুরাণী করিয়া তুলিয়াছে। নাক, মুখ, চোখ সব সিন্দুরে মাখা, কাপড়, জামা ও রং হইয়া গিয়াছে। সাবান দিয়া ধোয়াইয়া দিয়াও পারা যায় না। অনবরতই এই অবস্থা। আজও ধোয়াইয়া দিলাম।

মাকে একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। আজও পূর্ণবাবু ও তাঁহার ছেলেরা আসিয়াছেন। আরও অনেকে আসিয়াছেন। পূর্ণবাবুর ছেলে কয়েকটি গান করিল। বেলা প্রায় ১টার সকলে বিদায় নিলে মা কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

চাঁদপুর হইতে ভোগ তৈয়ার হইলে মাকে উঠাইয়া কলিকাতা যাত্রা একটু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আবার আসিয়া মা শুইয়া রহিলেন। আজ রাত্রিতে কলিকাতা রওনা হইবার কথা, তথা হইতে দিল্লী যাওয়ার কথা। দিল্লীর সকলে অস্থির হইয়া আছে। তাঁবু টাঙাইয়া মাস্থানেক অপেক্ষা করিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে—কত টেলিগ্রাম আসিতেছে, মা কবে আসিবেন। আজ বৈকালে মেয়েরা আসিয়াছে, মা উঠিয়া বসিয়া কথা বলিতেছেন। সন্ধ্যার সময় পূর্ণবাবু আবার মাকে তাহার বাসায় নিয়া গেলেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে খুব কীৰ্ত্তন হইল। সেখান হইতে পূর্ণবাবুর স্ত্রীর কাঁদাকাটার মধ্যে মা ফিরিয়া এক বাসা হইয়া হাঁসপাতালে ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ১টার আমরা গিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া রহিলাম।

—: 0 :—

নবম অধ্যায় :

—: * :—

৭ই চৈত্র, রবিবার ।

ভোর বেলা টোয় ষ্টীমার ছাড়িল । হঠাৎ কলিকাতা-
যাত্রী বিনয়বাবু (মুন্সেফ) ও সেই ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলেন ।
একটা স্টেশনে কিছু কীর কেনা হইল । মার আদেশে
ষ্টীমারে যাত্রীদের মধ্যে তাহা বিতরণ হইল । রাত্রি ৮।০
টায় আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম । মার আদেশে এবার
কাহাকেও খবর দেওয়া হয় নাই । বিনয়বাবুই আমাদের
বির্লা পার্কের শিব-মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় চলিয়া
গেলেন । কথা হইল তিনি কি খাবার নিয়া আসিবেন ।
মা দুর্ভাগ্য করিতে বাহির হইলেন । প্রথম শচীবাবুর
বাসায় গেলেন । আমাদের সকলকে রাস্তায় রাখিয়া রহস্ত-
ময়ী মা নিজের চাদর দিয়া মাথায় পাগড়ীর মত বাঁধিলেন ।
অন্ধকারে ধীরে ধীরে শচীবাবুর দরজায় গান ধরিলেন—

‘জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে’ ।

গান শুনিয়াই সকলে চমকিয়া উঠিল, শচীবাবু পরে বলিলেন
—আমার যেন প্রাণটা তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু
মার গলা বলিয়া চিনিতে পারি নাই । মা আসিয়া
বলিলেন, “আমার যে মনে হইয়াছিল তোমরা যেন গলার

আওরাজ ধরিতে না পার।” যাক, ভূপেশ বলিয়া একটি ছেলে দৌড়াইয়া বাহিরে আসিতেই মা আবার অন্ধকারে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ চেহারা কি ভুল হইবার! যতই পাগড়ী বাঁধা থাকুক, ভূপেশ একটু থমকিয়া থাকিয়াই মাকে চিনিতে পারিয়া ‘মা’ বলিয়া আনন্দে চাঁৎকার করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। উচ্চ হাসির শব্দ, বাহির হইতে আমরা শুনিলাম। একটু পরেই শচীবাবু আসিয়া আমাদের ভিতরে নিয়া গেলেন। আমি ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা ও অখণ্ড-নন্দজী মার সঙ্গে সঙ্গে আছি। কিছু সময় তথায় আসিয়া আমরা যতীশগুহদের বাসায় চলিলাম। তথায় গিয়াও মা এই খেলাই খেলিলেন। শচীবাবু উপরে চলিয়া গেলেন—অনেকেই শুইয়াছিলেন রাত্রি প্রায় ১১টার শচীবাবুকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে জাগিল, মার খবর নিশ্চয়ই কিছু নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শচীবাবু কিছুই বলেন না। মা আবার সকলকে দূরে রাখিয়া আমাকে নিয়া যতীশগুহদের বাড়ীর পিছনের গলিতে ঢুকিয়া পূর্বের মাজে

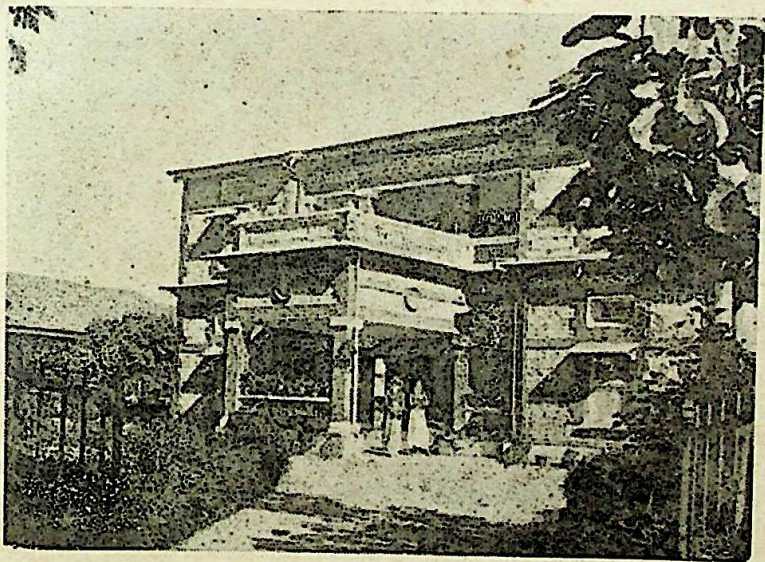
ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান ধরিলেন, রাত্রিতে কলিকাতায়
 আগমন এবং প্রস্থর ভাবে
 বাড়ী-বাড়িতে “জয় রাধে
 রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ,” ইত্যাদি
 নাম কীৰ্ত্তন।
 “জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে
 রাম, হরে হরে; ঐ নাম বল বদনে
 শুনাও কানে বিলাও জীবের দ্বারে
 দ্বারে”; এত রাতে মধুর সুরে সকলেই

চমকিয়া উঠিল। সকলে দোতালায় আছে, শব্দ বড় করিবার জন্ম মা আমাদেরও সঙ্গে নাম করিতে আদেশ দিলেন। সভ্য ঘটনা কখনও কখনও কাহারও কাহারও প্রাণে জাগিয়া ওঠে—আজ নীতিশের স্ত্রীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সে বলিল, মার কথা মনে হয়—এই বলিতেই সকলে ছুটিয়া নানিয়া আসিল। মাকে ঐ ভাবে দেখিয়া সকলে গিয়া মাকে ডড়াইয়া ধরিল। আনন্দের সীমা রহিল না। কিছু সময় দাঁড়াইয়াই মা প্রাণকুমারবাবুর বাসা, বিনয়বাবুর বাসা হইয়া শিব মন্দিরে ফিরিলেন। তথায় বিনয়বাবু সম্ভ্রীক ষাইয়া খাবার নিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। খাওয়া দাওয়া হইল। মা আবার বাহির হইলেন। এবার গাড়ী ভর্তি। মা ভ্রমরদের বাসায় গেলেন, তথা হইতে নবতরুদের বাসা হইয়া গোষ্টিটে উপেন্দ্রবাবুর বাসা হইয়া রাত্রি প্রায় ২টার ফিরিলেন। তখন আবার দুটামাী আরম্ভ করিলেন, “খুকুনী নাম শিখিয়াছ, এখন সকলে শুনিবে শীঘ্র কর” আমি বলিলাম, “তুমিও কর।” এই সব নাম করিতে করিতে রাত্রি ৩টার মা শুইলেন। শচীবাবু, নবতরু, যতীশগুহ, নীতিশ, তাহাদের মা সকলেই কম্বল নিয়া মার পাশে স্থান নিল।

৮ই চৈত্র, সোমবার।

সকালবেলা মা উঠিতেই অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিয়া বসিলেন সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন।

বেলা প্রায় ১২টায় মা ঢাকুরিয়া কুশারী মহাশয়ের বাসায় ভোগে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে সুরেন ঠাকুরের, বাসায় তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর বিশেষ আগ্রহে, হইয়া আসিলেন। প্রায় ৫টায় মা বিলার মন্দিরে আসিলেন। লোকে লোকারণ্য, মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। মা গতবার যখন সকলকে নিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতা হইতে রায়বাহাদুর সুরেনবাবু তাহা ফিল্মে ৬ কাশী যাত্রা। তুলিয়া নিয়াছিলেন। আজ সন্ধ্যায় তাহা মাকে দেখাইবেন। আমাদের পৈতার ছবিও তোলা আছে। সুবই আজ সন্ধ্যার সময় দেখান হইল। এর পরই মার রওনা হইবার সময় হইল। অনেকেই প্রণাম করিয়া একে একে বিদায় হইতেছেন। অনেকে সঙ্গে সঙ্গে ফেশনে চলিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব পর্যন্ত সকলে একদৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া আছে। মা কাশী যাইতেছেন। বাচ্চুর মার বিশেষ আহ্বানে তথায় যাইতেছেন। তিনি অহোরাত্র কীর্তন করিবেন। রাত্রি ১০টায় মা কাশীর গাড়ীতে রওনা হইলেন। রেলওয়ে কর্মচারীরা গাড়ীতে এত ভীড় করিতে নিষেধ করিতেছেন কিন্তু কেহই মার নিকট হইতে নড়িতেছেন না। বকুনী খাইতেছে, একবার নামিয়া যাইতেছে আবার ২।১ জন করিয়া মার কাছে সকলে আসিয়া জমিতেছে। এক হাসির ব্যাপার। যাক নির্দিষ্ট সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অনেকে দৌড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে



শ্রীশ্রীমা অনন্দময়ী আশ্রম
“কিশনপুর”
দেরাছন।



চলিতেছে। শেষে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি হইল। হতাশ হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। এই বিদায় দৃশ্যগুলি বড়ই করুণ।

৯ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

বেলা ১০টার আমরা ৩কানীধামে পৌঁছলাম। বিমলা মা ও আনন্দ ভাই হরিদ্বার বাইতেছেন। এইখানে তাহাদের সহিত দেখা হইল। মাকে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। স্টেশনে বাচ্চুর মা প্রভৃতি আসিয়াছেন, পূর্বেরই টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। ভোরে কীর্তন আরম্ভ ৩কানী আগমন, করা হইয়াছে। মাকে বাচ্চুদের অহোরাত্র কীর্তন। বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। বাগানে এক কুটারে মার থাকিবার জায়গা করা হইয়াছে। মা তথায় গিয়া বসিলেন। মাকে কাপড় ছাড়াইয়া একটু জল খাওয়ান হইল। কীর্তন চলিতেছে—

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে—”

মার আগমন সংবাদ পাইয়া সকলে মার দর্শনে আসিতেছে মা সকলের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক মিষ্টভাষায় আলাপ করিতেছেন। বেলা প্রায় ১২টার মার ভোগ হইল। থিওসফিকেল সোসাইটির বৈজনাথ পাণ্ডের স্ত্রী আসিয়াছেন। গতবার হইতেই ইহার স্বামী-স্ত্রী মার খুব অনুরক্ত

হইয়াছেন। সন্ধ্যায় মাও একবার কীর্তনে আসিয়া বসিলেন। কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। সকলে মিলিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। সারারাত্রিই প্রায় জাগিয়া কাটিয়া গেল। রাত্রি হইতে মা, ভোলানাথ ও সঙ্গের সকলেই কীর্তনের কাছে গিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন মা একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

১০ই চৈত্র, বুধবার।

বেলা ৩।০টার কীর্তন শেষ হইল! এখানকার নিয়মে চুণ-হলুদ গুলিয়া মাটিতে ঢালিয়া দিয়া সকলে তাহাতে গড়াগড়ি দিল। পরে সকলে মাকে নিয়া গঙ্গাস্নানে চলিল। হরসুন্দরী ধর্মশালা হইতে কানাই দাদা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মাকে তাঁহাদের ধর্মশালায় নিয়া বাইবেন। মালিক, মহেশবাবু অসুস্থ। মা ফিরিবার পথে তথায় গেলেন। মা তাহাকে এক বৎসর যে নিয়ম পালন করিতে বলিয়াছিলেন, এই চৈত্র মাসে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, নিয়মগুলি পালন করা হইয়াছে। মা বলিতেছেন, “ধাক কতদিন হইতেই বাবাজীর শরীর খারাপ, তার মধ্যে এই এক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া যে নিয়মগুলির কথা হইয়াছিল, তাহা পালন করা হইয়া গেল।” মহেশবাবু আজ মাকে বলিতেছেন, “মা, বড় কষ্ট আর পারিনা, মহেশবাবুকে আশ্বাস এখন বাইতেও পারিতেছিনা।” মা প্রদান—চিন্তা কি? বলিলেন, “তুমি চিন্তা করিওনা, শুধু

তাকে ডাক, পরিবর্তন ত হইয়াই যাইতেছে চিন্তা কি ?”
 মা ধর্মশালা হইতে বাচ্চুদের বাগানের কুটিরে আসিয়াছেন,
 অনেকেই আসিয়াছেন। মাকে মুখ ধোওয়াইয়া দেওয়া
 হইল। একটু দুধ খাইলেন; সকলে বিদায় নিলে মা একটু
 শুইয়া পড়িলেন। আগামী কল্য ১টার গাড়ীতে দিল্লী
 রওনা হইবার কথা। বেলা প্রায় ১টার সময় মা উঠিয়াছেন।
 উপস্থিত সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। বহুলোক
 আজ খবর পাইয়া মার দর্শনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যায়
 আবার কীর্তন হইল। ভোলানাথের সঙ্গে সকলেই কীর্তনে
 আনন্দ পাইলেন। মা বারান্দায় কুঠিয়ার বসিয়া আছেন।
 বাচ্চুর মা প্রভৃতি নিভুতে মার সঙ্গে নিজেদের কথা
 বলিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১১টার মা আসিয়া বাচ্চুদের
 দালানের খোলা রোয়াকে শুইলেন। এখানেই কীর্তনাদি
 হইয়াছে। মাকে ঘিরিয়া সকলে কঞ্চল বিছাইয়া নিজেদের
 শুইবার স্থান করিয়া নিয়াছে।

১১ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

সকাল বেলা হইতেই লোক আসিতেছে। মা আজ
 ১২টার গাড়ীতে দিল্লী রওনা হইতেছেন। আমাদের কৃষ্ণা
 মা (মনোরমা) আসিয়াছেন। নৈনিতালের পরিচিত এক
 ইঞ্জিনীয়ার সঙ্গীক কাল আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের বাসায়

মাকে নিবার জন্ম খুব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সময় নাই, তাই বাওয়া হইল না। আজ ভোর বেলা তাঁহারা আসিয়াছেন। এলাহাবাদ হইয়া বাইতে হইবে, তাই মার দিল্লীর পথে এলাহাবাদে দর্শনের জন্ম বাহারা ব্যস্ত হইয়া ভক্তদের মাকে দর্শন আছেন, তাহাদের টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বেলা প্রায় ষ্টোয় এলাহাবাদ পৌঁছিলাম। কাশ্মীরিরা সকলেই খবর পাইয়া আসিয়াছে। দেৱাতুনের কাশীরাগীও এখানেই আছেন—তিনি এতদিন পর মাকে দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল। কাশ্মীরী রমণীগণ যখন ফুল মালা সহ গাড়ীতে আসিয়া উঠিল, গাড়ী যেন আলো হইয়া গেল। মাকে তাহারা মালা দিয়া সাজাইল, সুপাকার ফল মার চরণে ঢালিয়া দিল। মাকে এত আগ্রহে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, যেন কতকালের আরাধ্য ধনকে তাহারা কাছে পাইয়াছে। আমি টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম বলিয়া আমাকেই বা কতভাবে আদর করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল “গুরুপ্রিয়া বহিন তোমার জন্মই মাকে দর্শন করিতে পারিলাম।” তাহাদের দর্শনের ব্যাকুলতাও আগ্রহ দেখিয়া উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইল। অনেক লোক জন্মা হইয়া গেল। মার চরণের ফল সব আমি লুটাইয়া দিতে লাগিলাম। মা একটু নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন, দলে দলে লোক মার চরণ স্পর্শ করিতে লাগিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! কাহারও ব্যাকুলতার

গাড়ী দাঁড়াইল না। নির্দিষ্টসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।
কাশ্মীরী রমণীগণ মার গায়, মাথায় ফুল ছিটাইয়া দিতে
লাগিল।

—:~:—

দশম অধ্যায়।

—:o:—

১২ই চৈত্র, শুক্রবার।

আজ ভোর ৬।০টার আমরা দিল্লী পৌঁছিলাম। অনেকেই
ফ্রেশনে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চাবুর বাসায় তাঁবু খাটান
হইয়াছে। মাকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। ধীরে ধীরে
নকলকে খবর দেওয়া হইল। মা তাঁবুতে আসিয়া কিছু
পরেই শুইয়া পড়িলেন। অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন।
স্বরেনবাবুর স্ত্রী (যিনি সিমলার কীর্তনের প্রসঙ্গ তুলিয়া-
ছিলেন, আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,

“আমি আমার গোপালকে দেখে চ’লে যাই।” তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা বাধা দিতে পারিলাম না—তিনি মাকে জড়াইয়া ধরিলেন, মা মুখের কাপড় তুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কতভাবে মাকে আদর করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি আবার মেয়েদের কীৰ্তনের প্রস্তাব করিলেন। ইনি এখানে দলের মধ্যে বয়োবৃদ্ধা, কাজেই অনেকেই দিল্লী আগমন; তথায় ইহাকে সম্মান করেন; ইনিও মেয়েদের ভক্ত সমাবেশ। নিয়া সৎপ্রসঙ্গে অনেক সময় কাটান। ধীরে ধীরে অনেক লোক আসিতে লাগিল, মাকে উঠাইয়া ভোগ দেওয়া হইল। সামান্য একটু খাইলেন, তারপর গিয়া ছোট্ট বিছানাটিতে বসিলেন। ছোট তাঁবু, লোক ধরে না, তাঁবুর চারিধারে পর্দা খুলিয়া দেওয়া হইল। তবুও সকলে মার কাছে আসিয়া চরণ স্পর্শ করিতে পারিল না। মা মেয়েদের বলিতেছেন, “শুধু মুখে বসিয়া থাকিতে নাই, নাম কর।” তখন মেয়েদের মধ্যে কিছুক্ষণ নাম হইল। মা বলিয়া দিতেছেন। হারাণবাবুর স্ত্রী মেয়েটি, বেশ নাম করিলেন। সন্ধ্যাবেলায় মাকে একটু সময়ের জন্য হরিসভায় নিয়া যাওয়া হইল। দুর্গাদাসবাবু, পঞ্চুবাবু, হারাণবাবু, চারুবাবু, পঞ্চজবাবু প্রভৃতি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাই মা মোটরে গেলেন না, হাঁটিয়াই চলিলেন। তথায় ৭ম বার্ষিক উৎসব ৭দিন ব্যাপী চলিতেছে। আজ তথায় পাঠক পাঠ করিয়াছেন। মা যাইতেই অনেকেই আসিয়া

মার চরণধূলি নিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক তথায় থাকিবার পর আবার সকলে মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত অনেকেই মার কাছে বসিয়া রহিলেন। পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলে ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। মার বিছানার চারিদিক ঘিরিয়া কম্বল বিহাইয়া আমরা শয়ন করিলাম।

১৩১ চৈত্র, শনিবার।

আজ দোলপূর্ণিমা। মা উঠিবার পূর্বেই অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। আজ তাহারা মার চরণে ফাগুচূর্ণ দিবেন, মার কাছে কীর্তন করিবেন। মা উঠিতেই সকলে মারও ভোলানাথের চরণে ফাগুচূর্ণ দিয়া প্রণাম করিলেন। কেহ বা চন্দন ও তুলসীপত্র দিতেছেন। মেয়েরা কাপড় ও সিন্দুর আনিয়া সকলে নানা জিনিষ দিয়া মাকে আজ পূজা করিতেছে। মালা দিয়া মাকে সাজাইয়া দিল। শেষে মেয়েরা মাকে নিয়া দোল খেলিতে লাগিল। মা একবার মেয়েদের দলে বাহিরে যান, একবার ছেলেদের কাছে তাঁবুর ভিতর কীর্তনে আসেন। মেয়েদের নিয়াও মা কীর্তন করাইতে লাগিলেন। সকলে আবার মুখে দিলে মা আমাকে দিয়া একখানা আয়না নিয়া সকলের মুখের কাছে ধরিতেছেন। হাসিয়া বলিতেছেন, “তোমরা রং দিতেছ, আমারও তো একটা কাজ করা দরকার, আমি

ভোগাদের স্বরূপ দেখাইতেছি।” এই বলিয়া হাসিতেছেন।

কিন্তু এই কথায়, ‘যে কত গভীর তত্ত্ব তাহা অনেকেই হয়ত বুঝিলেন না। সকলে মার কাপড়ে আবির ঢালিয়া দিল, মা হাসিয়া হাসিয়া এক একজন করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তাহাতে মার কাপড়ের আবিরে সেই

দিল্লিতে দোল-পূর্ণিমার
উৎসবে মার আনন্দ দান।
কর্ণেতেই কুপা হয়,
সংকর্ষ করাই কুপা
সাপেক্ষ ; প্রারব্ধ কন্ম
কিরূপে কাটে।

রাজা হইয়া যাইতেছে। মা হাসিয়া
উঠিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ভাগ্যী
দেখিয়া সকলেই হাসিতেছেন। আবার
মেয়েদের কীর্তন চালাইতে বলিয়া
ছেলেদের কাছে আসিতেছেন।

সকলেই মার পায় আবির ঢালিয়া

দিতেছেন। এইভাবে বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কীর্তন ও
খেলা চলিল। তারপর ধীরে ধীরে সকলে বিদায় নিলেন।
মাকে স্নান করাইয়া দিলাম। পরে মার ভোগ হইল।
পঞ্চুবাবু সপরিবারে প্রাণ ভরিয়া মার সেবা করিতেছেন।
দেবাত্মন হইতে গোপালজী, হরিরাম বোশী আসিয়াছেন।
খুবই আনন্দ কোলাহলে দিন কাটিতেছে। হারাণবাবুর
বাসায় উদয়াস্ত কীর্তন, তিনি মাকে একবার নিজ বাসায়
নিয়া গেলেন। সেখানে পাঞ্জাবীদের নিয়া হারাণবাবু
কীর্তনে খুব নাচিয়া আনন্দ করিতেছেন। কিছু সময় তথায়
থাকিয়া মা তাঁবুতে ফিরিলেন। মনোজবাবু তাহার বাসায়
মাকে নিয়া যাইবার জন্ত আসিয়া বসিয়া আছেন। মাকে

নিয়া গেলেন, আমরাও সঙ্গে গেলাম। মনোজবাবুর বাসার কাছেই একটি পুরাতন হনুমানের মন্দির। মা দু'বার আসিয়া এই মন্দিরে ছিলেন। যতীশ গুহ ও রণকে মা বলিলেন, “ঘাওনা তোমরা হনুমানের মন্দিরটি দেখ নাই, দেখিয়া আইস।” মা মনোজবাবুর বাসা হইতে তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। অনেকে আসিয়া মাকে ঘিরিয়া বসিলেন একটি মেয়ে সুন্দর কীর্তন করিল। শুনিলাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে। একটি ভদ্রলোকের সহিত মার কথা হইতেছে, ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, “মা আমাদের কিছুই হইতেছেন কেন? কৃপা বলিয়া কি কিছুই নাই?” মা বলিতেছেন, “হাঁ কৃপা ছাড়া ত চলিতেই পারা যায় না। কিন্তু কৰ্ম্মেতেই যে কৃপা। কৰ্ম্ম চাই। যেমন একজন হাত বাড়াইয়া দিতেছে, আর একজন হাত বাড়াইয়া নিতেছে।” তাই কৰ্ম্ম ও কৃপা এক সময়েতেই; কৰ্ম্মই ভ কৃপা, কৃপা না থাকলে সৎকৰ্ম্ম কোথায়?” ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, “মা. প্রারদ্ধ ভোগ করিতেই হয় নাকি? কৰ্ম্মফল কি নামজপে ক্ষয় নয় না?” মা বলিতেছেন— দেখ প্রারদ্ধ কৰ্ম্ম কেমন ভোগ হয়, জীবন্মুক্তদেরও ভোগ হয়; যেমন ইলেকট্রিক পাখার সুইচটা বন্ধ করিয়া দিলেও কিছু সময় চলে,—জীবন্মুক্তদেরও প্রারদ্ধ ভোগ সেই রকম আর কি? তাহাতে জীবন্মুক্তদের কিছু বন্ধন থাকেনা। আবার দেখ তুমি হয়ত অনেক কাজ জমাইয়া নিয়াছ,

একা শেষ করিতে বহু সময়ের দরকার ; এই সময়েতে তোমার পরিচিত লোকেরা কয়েকজন আসিয়া তোমার এই অবস্থা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তোমার কাজগুলি করিয়া দিল—তুমি অল্প সময়ের মধ্যেই অবসর পাইলে । জপাদিতে ও ফল হয়, শীঘ্র কৰ্ম্মবন্ধন হইতে অবসর পাওয়া যায় ।” এইভাবে হাসিয়া নানা কথা বলিতেছেন । সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন । রাত্রিতে আবার মাকে হরি সভায় নিয়া গেল । তথায় সুধীর সরকার কীর্তন করিতেছেন । বহু লোক সমবেত হইয়াছে । যাওয়া মাত্রই অনেকে আসিয়া মার চরণ স্পর্শ করিল । সুধীরবাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে বলিল, “দিদি, ডাকিলে যে মা আসেন আজ তাহা দেখিলাম । উনি বলিতেছিলেন, “মা আজ আসিবেন না ।” আমি বলিতেছিলাম, “ডাকিলে নিশ্চয়ই মা আসেন, দেখি আসেন কিনা । এই ভাবিয়া আমি মাকে ডাকিতেছিলাম, দেখুন মা আসিয়া উপস্থিত ।” এদিকে মার হরিসভায় যাওয়ার সময় ; সকলের কথাবার্তায় যাওয়া শ্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল । কিন্তু ঘটনাচক্রে মার যাওয়ার কোন বাধা হইল না । রাত্রি প্রায় ১২টার সকলে বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন ।

১৪ই চৈত্র, রবিবার ।

আজও প্রাতে মা উঠিবার পূর্বেই বহু লোক আসিয়া বসিয়া আছেন । মা উঠিয়া সকলের সহিত কথাবার্তা

বলিতেছেন। কথাচ্ছলে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিতেছেন। হারাণবাবু বলিলেন, “মা, তুমি প্রায় এক বছর পর আসিলে। আমাদের ত কিছুই হইল না। নামে দেখিতেছি কিছুই হয় না। এত কীর্তন করি, নাম করি——যখন করি তখন আনন্দ পাই, কিন্তু আবার ঘরে গেলেই যেই সেই।” মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতেছেন, “দেখ, চট্টগ্রামে টককে খেড়ে বলে, তোমরা ঔষধও খাও আবার খেড়েও খাও, তাই ফল পায় না। এট বলিয়া ছেলে মানুষের মত হাসিতে লাগিলেন। সকলে শুদ্ধ হইয়া রহিল। কেহ কেহ বলিল, “মা ঠিকই বলিতেছেন, আমরা খেড়েও খাই, ঔষধও খাই, তাই ফল পাই না।” আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, আলোচনা হইবার জন্য আলোচনা কর।” যতক্ষণ লোচন আছে, ততক্ষণই সৃষ্টি আছে। যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণই সৃষ্টি দুপুরে ভোগের পর মা আধঘণ্টার জন্য মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া পড়িয়া যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণ রহিলেন। বলিলেন, আধঘণ্টা পর সৃষ্টি। আমাকে ডাকিও। তাঁবুতে অনেকে বসিয়া আছেন। পূর্ব-পরিচিতা নানীমা, কন্যা পুত্রবধূ সহ আসিয়াছেন। সুরেশবাবুর স্ত্রী (টুনুর মা), আসিয়া মাকে ‘গোপাল গোপাল’ বলিয়া কত আদর করিতেছেন। মা ও তার কোলে শিশুর মত শুইয়া আছেন। ইনিই সোমবার মাকে নিয়া মেয়েদের কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন। হাসি

ও কথাগুলো কত সুন্দর সুন্দর কথা হইতে লাগিল। ছেলে-মেয়েদের নিয়া আমি সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে লাগিলাম। আধঘণ্টা হইতেই মা উঠিয়া বসিলেন। বেলা প্রায় ৪।০টার সময় মাকে ইঞ্জিনিয়ার চিন্তামণি পান্ডু তার বাসায় নিয়া গেলেন। সেখানে খোলা জায়গায় মাকে নিয়া সকলে বসিলেন। ছোট ছোট মেয়েরা গান করিল। তারপর কিছুই জল খাবারের ষোঁগাড় করিল, মাকে একটু খাওয়াইয়া, দেওয়া হইল; সকলে প্রদাদ পাইলেন। সন্ধ্যার সময় মাকে পুনরায় তাঁবুতে নিয়া আসা হইল। একটু পরেই আবার মাকে হরিসভায় নিয়া যাওয়া হইল। তথায় নাম কীর্তন হইতেছিল ভোলানাথও কীর্তনে যোগ দিলেন। সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ করিলেন। সেখান হইতে রাত্রি ৯টার মাকে নিয়া সকলে তাঁবুতে ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক। তাই মা গাড়ীতে না আসিয়া হাঁটিয়াই সকলের সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁবুতে না পৌঁছিতেই আবার এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে কীর্তনে মাকে নিতে, তাহারা মোটর নিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব হইতেই তাহারা মাকে একবার যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। হারাণবাবু সেই বাড়ীতে নাম করিতে গিয়াছেন। হারাণবাবুর মেয়েও মাকে নিতে আসিয়াছে। মাকে নিয়া সকলে তথায় গেলেন। কীর্তনের আসরে বৃন্দাবন সাজান হইয়াছে। পাঞ্জাবীদের সহিত হারাণবাবু

গোপী-সাজে নাচিতেছেন। শুধু নাম কীর্তন হইতেছিল। ভোলানাথ পরিশ্রান্ত বলিয়া ঘান নাই, আমরা ২৩জন মার সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু আবার মোটর পাঠাইয়া ভোলানাথের সঙ্গে বাকী সকলকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। ভোলানাথ কীর্তনে নাচিতে লাগিলেন। খুব আনন্দ হইল; নাম হইতেছিল—জয় রাধে, জয় রাধে—জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন। আবার নাম—জয় গোবিন্দ, গোপীনাথ, গোপীজন-বল্লভ ইত্যাদি নামে আসর জমিয়া উঠিল, নামের ধ্বনিতে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল, সকলেই নাচিয়া নাচিয়া আনন্দে নাম করিতেছেন। একবার গিয়াই ঘুরিয়া আসার কথা ছিল, কিন্তু রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। মাকে পাঠাইয়া সকলেই খুব আনন্দে বহুক্ষণ কীর্তন করিল। গৃহকর্তী নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলে সোমবার দিন মেয়েদের কীর্তনে যোগ দিবেন বলিয়া দিলেন। ১২টায় তাঁবুতে ফিরিয়া আসা হইল। শুইতে প্রায় রাত্রি ২টা হইল।

১৫ই চৈত্র, সোমবার।

গত কল্যাঈ ডাক্তার জে, কে, সেনের বাড়ীতে মাকে নিয়া বাইবার কথা ছিল। আজ প্রাতে ৭টায় তিনি মোটর নিয়া আসিলেন। হারাণবাবুও সপরিবারে আসিয়া বসিয়া আছেন; যা উঠিলেন। সকলকে নিয়া ডাক্তারের বাড়ী

চলিলেন। সেখানে গিয়া বাগানে গাছঘরে বসিলেন। মা বলিতেছেন, “তুমি ত ডাক্তারী কর, এবার একটু মনের ডাক্তারীটা কর।” তিনি বলিতেছেন, “চেষ্টা ত করি, কিন্তু বিশেষ কিছু হয় না।” মা বলিলেন, “বেশী সময় দাও, আর তোমরা ত জান রোগ ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ পথ্য ঠিক ঠিক ভাবে খাওয়ান দরকার। সেইরকম নিয়মমত তাঁর নাম করিয়া যাও, ফল পাইবেই। দেখ, আমি ত তোমাদের মেয়ে, ছেলেমানুষ; তবে শুনি, যে কোন কোন সময় শিশুদের নাক্ষী মানে, বলে যে ও ছেলেমানুষ মিথ্যা বলিবে না, বাহা

দেখিয়াছ ঠিক ঠিক বলিবে। সেইরকম আমার কথা বিশ্বাস কর; আমার কথাও তোমরা বিশ্বাস কর, তোমরা নাম কর—নিশ্চয়ই ফল পাইবে।”

একটা ভাল জিনিষ পাইলে সকলেরই ইচ্ছা হয়, তার নিজের ঘরের লোক সকলেই তাহা ঘেন পায়। আমারও ঘরের লোক তোমরা সকলেই, কাজেই কথা হয় তোমরা সকলে নাম কর, আর সেই আনন্দ পাও।” ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মার সহিত একান্তে কথা বলিবেন। মা তাহার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইলেন। তাহার অবস্থা বড় সুন্দর। সংসারে থাকিয়াও ভাবটি সুন্দর। তিনি তাহার নিজের সুন্দর সুন্দর অবস্থার কথা বলিয়া মাকে বলিতেছেন, “মা, আমার এসব বিশ্বাস হয় না, কারণ আমি ত সাধন-ভজন কিছুই করি নাই, আমার এসব আসিবে

কেন?” মা বলিলেন, “মা, তুমি এখন কিছুই বিশেষ না করিলেও তোমার সংস্কার ভাল আছে, তাই এখন একটু ধ্যান করিতেই তুমি এসব পাচ্ছ। তোমার কথা শুনিতে বেশ আনন্দ।” ডাক্তার বাবুর স্ত্রী উপনিষদাদি পড়িয়া বাহা বুঝিয়াছেন তাহা পণ্ডে লিখিয়াছেন, সেই বই ২১৩ খানা মাকে দিয়া দিলেন। আমরা অনেক বেলায় সেখান হইতে ফিরিলাম। ডাক্তারবাবুকেও মা বলিয়া আসিলেন, “তুমি অন্ততঃ কিছু সময় এই গাছঘরে গাছ হয়ে বসে থেকো। সেই ধ্যানে বসিও।” তাঁবুতে ফিরিয়া দেখি অনেকেই মার অপেক্ষা করিতেছেন। মা আসিয়া তাঁবুতে বসিলেন, মেয়েরা গান করিল। পঞ্চুবাবুর একটি মেয়ে নাচের সাজ পরিয়া নাচিল। কথাবার্তার প্রায় বেলা ১টা বাজিল। মাকে ভোগে বসান হইল। ভোগের পর মা একটু শুইলেন। অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, মা উঠিলেন।

মেয়েরা সব একত্র হইয়াছে; বেলা প্রায় ৩টা, মা কত কথা বলিতেছেন। সুরেশবাবুর স্ত্রী মার মা. তিনিই গীতা সমিতি করিয়া মেয়েদের সব উপদেশ করেন; তাহাতে মেয়েদের বেশ উন্নতি হইতেছে, মা বলিলেন। মেয়েরাও সব তাঁর প্রশংসা করিতেছেন। মা বলিতেছেন, “তোমাদের ভাগ্যি যে তোমরা এ রকম সজ্জ পাইতেছ।” এইসব নানা কথা হইতেছে। বেলা ৪টায় ওখলার কালীবাড়ী মাকে

নিয়া যাওয়া স্থির হইয়াছে। মাকে টুনুর মা দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা তাহার কোলে গোপালের মতই শুইয়া হাসিতেছেন। টুনুর মা গোপালের মা হইয়াছেন। মা বলিলেন, “জ্যোতিষকে, অখণ্ডানন্দকে ডাক—আমার মাকে দেখিয়া যাক।” তাহারা আসিলে মা বলিতেছেন, “এই দেখ আমার মা, আমাকে গোপাল বলে—ইনি গোপালের মা হইয়াছেন।” সকলে বলিল, “বেশ ত, ইনি আমাদের দিদিমা হইলেন।” মা বলিলেন, “আমি মার সঙ্গে একটা ছবি তুলিব, সকলকে আমার মা দেখাই।” তখনই একজন বলিলেন, “ফটোগ্রাফার এখানেই উপস্থিত আছেন।” মা বলিলেন, “তোমরা ত আমাকে কিছু বল নাই।” যাক, তখন গোপালের মার কোলে গোপাল শুইয়া আছে—মা দুধ খাওয়াইতেছে—এইভাবে ফটো তোলা হইল। এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বলরাম করা হইল, তিনি ও মার কাছে বসিয়া আছেন। এই লীলাখেলার পরে সকলে মাকে নিয়া ওখলাতে চলিল। একটা বাস, ২খানা মোটর ভর্তি হইয়া চলিল। ভক্তেরা খোল-করতাল নিয়া বাইতেছেন, তথায় কীর্তন করিবেন। বাসেই কীর্তন শুরু হইল। ভক্তেরা প্রাণ খুলিয়া নাম ধরিলেন—মা, মা মা, মা মা। ওখলাতে পৌছিয়া মার ফটো তোলা হইল। পরে সকলে মিলিয়া, কীর্তন করিতে লাগিলেন। শুধু মা, মা, মা, মা নাম চলিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দলবল ঐ নাম নিয়া নাচিতে নাচিতে

মাকে নিয়া ওখলা হইতে রওনা হইলেন। মধ্যে মধ্যে মা বাম হাতখানি ছুলাইয়া ছুলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। হারাণবাবু প্রভৃতি নাচিয়া নাচিয়া মা, মা করিতে করিতে রওনা হইলেন। বাসে আসিয়াও নাম চলিতে লাগিল। পথে চিন্তামণি পাণ্ডুর বাড়ীতে যাওয়া হইল—কীর্তন চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ৮।০টা পর্য্যন্ত তথায় খুব কীর্তন হইল। পরে ফল-মিষ্টি দিয়া মার ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। কীর্তন করিতে করিতে সকলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় ভক্তদের মুখে প্রাণখোলা মা, মা ডাকে আকাশ, বাতাস পবিত্র হইয়া উঠিল। বড়ই মিষ্টি লাগিতেছিল। তাঁবুতে আসিয়া অনেকে বিদায় নিলেন; আবার যাহারা সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, তাহারা আসিয়া মার কাছে বসিলেন। কথাবার্তা চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল—সকলেই বসিয়া আছেন। ১১টায় প্রায় সকলে বিদায় নিলেন। পরে মার একটু ভোগ দেওয়া হইল। মা শুইয়া ছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিতেছেন, “আজ শরীরটার শুইবার ভাব নাই। আমরা ২।৪ জন সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া পরে তাঁবুতে ফিরিলেন। কিন্তু রাত্রিতে চুপ করিবার ভাব বড় হইল না। রাত্রিতে রণ হঠাৎ ‘মা, মা’ বলিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। কয়দিন যাবতই তাহার কেমন একটা ভাব চলিতেছিল; রাত্রিতে উঠিয়া মার

কাছে বসিয়া থাকে। আজ ভয়ানক ভাবে কাঁদিতে লাগিল। মা চুপ করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। আজ মথুরা হইতে জ্যোতির্বিকাশ (নরসিং) ও আর একটি প্রফেসার সপরিবারে আসিয়াছেন। তাহারা মার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন।

১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

অতি প্রত্যুষেই হারাণবাবু সস্ত্রীক মার কাছে আসিয়াছেন। তাঁর স্ত্রী মার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হঠাৎ মা চাদরখানা নিয়া উঠিয়া পড়িলেন। হারাণবাবুর স্ত্রীকে বলিলেন, “চলত মা, আমরা যাই।” এই বলিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহির হইতেই হারাণবাবু বলিতেছেন, “এই সময় মোটরে বেড়ান বেশ।” আমি বলিলাম, “মা আপনার মোটরে যাবেন বলেই এসেছেন।” মাকে নিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেলেন। প্রায় ৮টার মা টাঙ্গা করিয়া ফিরিলেন। শুনলাম, ফিরবার পথে হঠাৎ মোটর নালার ধারে পড়িয়া যায়। হারাণবাবু বলিলেন, “মা না থাকিলে আজ জীবন শেষই হইত। একটু জোরে গাড়ীখানা পড়িলেই সব শেষ হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া যেন ধীরে ধীরে গাড়ীখানা গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।” তখনই সুধীরবাবু গাড়ী নিয়া হাজির, তাঁহার বাসায় নিয়া যাইবেন। আমরা তাঁর বাসায় গেলাম। অনেকে একত্র হইয়াছেন। নাম কীর্তন হইল। মাকে চন্দন, মালা পরাইয়া দিল। সুধীরবাবু

বিলাত ফেরত, তিনি সিমলাতে প্রথম প্রথম মার কাছে বড় আসিতেন না ; শেষে মার ভাবটুকু দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, অনেকবার বীরেনদাদার কাছে বলিয়াছেন, “আমি বড়ই হতভাগ্য, এতদিন মা সিমলার আছেন, আমি আসি নাই, এত সুযোগ আমি নষ্ট করিয়াছি, এখন বড়ই কষ্ট হইতেছে।” আজ বাড়ীতে নিয়াই সুখীরবাবু প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিয়া বলিলেন, “মা, শুধু একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি কাল রাত্রি ২টায় তোমাকে যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহা কি সত্য ? আমার মনে হয়, তাহা সত্য।” মা কথা কাটাইয়া বলিলেন, “স্বপ্নে কত দেখা যায়, তবে অনেক সময় স্বপ্ন সত্যও হয়।” সুখীরবাবু বড়ই গম্ভীর লোক। তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। অনেকক্ষণ তাঁর বাসার কীৰ্ত্তন হইল। সুখীরবাবু তাঁর গুরুদেবের প্রদত্ত একখানা গীতায় মার হাতের লেখা রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু মা অনেক সাধ্য-সাধনায় একটা বিন্দু দিয়া দিলেন। বলিলেন, “যদি কখনও লিখিবার ভাব হয়, তবে তখন ইহাদের (আমাকে দেখাইয়া দিলেন) বলিয়া দেও, লেখা পাঠাইয়া দিবে, এখন লিখিবার ভাবই নাই।” কীৰ্ত্তনাদির পর বেলা প্রায় ১১০টায় আমরা তাঁবুতে ফিরিলাম। আসিয়া দেখি আমেরিকাবাসী একটি লোক মার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তিনি অনেককাল হইতেই মার কথা শুনিয়া মার সহিত দেখা করিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। ইনি

সাধু দর্শন করিবার জন্মই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। অনেক সাধু সঙ্গও করিয়াছেন। ডাল-রুটি একবেলা খান। চা পর্য্যন্ত খান না। মাকে দেখিয়া বলিতেছেন, “আমি মার সঙ্গেই থাকিব।” একজন বলিলেন, মার সঙ্গে থাকিলে কাপড় পরিতে হইবে।” সাহেবটি বলিতেছেন, “মা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।” মার ফটো তুলিল। বেলা ১২টা বাজিয়া যায়। মার ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের পরই মাকে গুরুদ্বার মন্দিরে মেয়েদের কীর্তনে নিয়া যাওয়ান হইল। প্রকাণ্ড হল, বহু স্ত্রীলোক মার সঙ্গে কীর্তন করিবার জন্ম একত্র হইয়াছেন। ধীরে ধীরে কীর্তন জমিয়া উঠিল। খুব আনন্দ হইল। বেলা ৫টায় মা ফিরিলেন। সেখানে সকলে মাকে একটু উপদেশ দিবার জন্ম ধরিল। মা বলিলেন, “আমি ত কিছু লেখাপড়া জানিনা, বল বলিলেই বলিতে পারি না ; কথায় কথায় কথা হইলে, যাহা আসিবে বলিব।” গোপালের মা কথা উঠাইলেন, পরে মা বলিতে লাগিলেন, “দেখ, আমরা এই নাম কীর্তন করিলাম, ইহার অর্থ কি ? কেন নাম করা হয় ? নামের গুণ এই যে তাহা নামীকে আনিয়া দেয়। দেখনা, মাকে মা বলিয়া ডাকিলেই মা আসিয়া কাছে দাঁড়ায়। যাহাকেই নাম ধরিয়া ডাকিবে, সেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে। নামেরই এই গুণ। তাই নামীকে পাইবার জন্ম নামই আশ্রয় করিতে হয়। আর দেখ, আগুনের স্বভাবই এই যে—সে সব জিনিষকেই নিজের

স্বরূপ করিয়া দেয়। ভিজা কাঠও যদি আগুনের কাছে থাকে তাহাও আগুনের গুণে শুকাইয়া শুষ্ক হইয়া উঠে—

নাম করিলে নামীর সঙ্গ শেষে আগুনের স্বরূপই হইয়া যায়। হয় ও তাঁহাকে পাওয়া সেইজন্মই তাঁর সঙ্গ করিলেই (অর্থাৎ তাঁহার নাম করিলেই তাঁহার সঙ্গ করা হয়) তাঁহাকে পাওয়া যায়। আর

ছেলে-মেয়েদের বাল-গোপাল, কুমারীতে দেবী-রূপে সেবা করিলে সেই সংসারে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গ করার সেবা তাঁহার নিকট আরও একটা উপায় এই যে, পরমপিতা পৌছায়।

পরমপতিকেও কেহ দেখে না, তাই ঘরে ঘরে সেই পরমপতিই পতিরূপে আছেন, এইভাবে চিন্তা করিতে ছেলে-মেয়েদের বাল-গোপাল ও কুমারীদের দেবীরূপে মনে করিতে হয়। পতি, পুত্র-কন্যার সেবা করিলেও সেই সেবা তাঁহার নিকট পৌছায়। এই ভাবেও তাঁর সঙ্গ করা হয়। আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা একটু বেশী সময় তাঁর সঙ্গ কর, তাঁর নাম কর। ছেলে-মেয়েদের জন্ম ত তোমরা কতই কর; এই মেয়েটার জন্মও একটু করিও— এই আমার প্রার্থনা।” হাতজোড় করিয়া ছলছল চোখে সকলের কাছে যখন এই প্রার্থনা মা মধ্যে মধ্যে করিতেন, সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, আর স্বীকার করিয়া যাইতেন, তাঁহারা বেশী সময় নাম করিবেন। কীর্তনাদির পর মা তাঁবুতে ফিরিলেন। জ্যোতিবিকাশ ও সঙ্গীয় প্রফেসারটি

তখনই মথুরায় রওনা হইলেন। দুর্গাদাসবাবুর বাতের অসুখ, তিনি আসিতে পারেন নাই। মা তাহাকে গাড়ী করিয়া নিয়া আসিতে বলিলেন। তিনি মার আহ্বানে মহা আনন্দিত হইয়া মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁবুতে অনেকেই বসিয়া আছেন। বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি মাকে আজ সন্ধ্যা ৭।০টার হিন্দু ধর্ম মহাসভাতে কীর্তনে নিয়া যাইবেন। সেখানে আজ বহুলোক মার দর্শনে একত্রিত হইবেন। মা একটু তাঁবুর বাহিরে গিয়াছেন, দুর্গাদাসবাবু তাঁবুর ভিতরে বসিয়া আছেন—তিনি জানেন, মা ফিরিয়া তাঁবুতে আসিবেন। মধ্যে মধ্যে তিনি মা, মা বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু মার আর তাঁবুতে ফিরিয়া আসা হইল না, বাহির হইতেই বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি মাকে ধরিয়া মোটরে তুলিয়া নিলেন। কারণ ৭।০টা বাজিবার আর দেৱী নাই। ৭।০টার কীর্তন আরম্ভ করার কথা হইয়াছে। মাকে গাড়ীতে আমি বলিলাম, “দুর্গাবাবু ভিতরে বসিয়া আছেন।” মা অমনি বলিলেন, “তাই ত, তোমরা আমাকে বাহির হইতেই নিয়া আসিলে, সে মনে ব্যথা পাইবে। পায়ের যত্ন নিয়া আসিয়াছে। আমি ফিরিয়া যাইব তাহার ধারণা ছিল।” তখন গাড়ী হইতেই মা ডাকিয়া বলিতেছেন, “বাবা, আমি কিন্তু যাই।” তারপর আমাকে বলিলেন, “বাবা বুঝিল, তার এই মেয়েটার কিছুই বিশ্বাস নাই, ঘরে বসিয়ে রেখে চলে এলাম। তুমি একটা কাজ করিও, কীর্তনের পর বাবাকে একটু লুটের প্রসাদ ও

একটা আমার গলার মালা পাঠিয়ে দিও।” মা কীর্তনের ঘরে উপস্থিত হইলেন। উপরে মেয়েরা বসিয়াছেন, নীচে কীর্তনের সকলে বসিয়াছেন। মাকেও নীচে বসান হইয়াছে। মেয়েরা অনেকে মাকে ঘিরিয়া নীচেই বসিলেন। আজ ভক্তেরা মার বন্দনা—‘জয় হৃদয়-বাসিনী শুদ্ধা-সনাতনী শ্রী আনন্দময়ী মা’ এই প্রথম আরম্ভ করিলেন। পরে মা, মা নামে কীর্তন চলিল। অনেকক্ষণ ভক্তেরা মহানন্দে মা, মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনিতে বায়ুমণ্ডলও পবিত্র হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর ভক্তেরা অগ্নি নাম ধরিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত মা তথায় থাকিলেন। পরে তাঁবুতে ফিরিলেন। তাঁবুতেও ২৪ জন মার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। মা আসিতেই একটি হিন্দুস্থানী পণ্ডিত মাকে মালা ও ফল-মিষ্টি দিয়া পূজা করিলেন। রাত্রি প্রায় ১টার সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন।

১৭ই চৈত্র, বুধবার।

ভোরেই সকলে মাকে নিয়া “পুষাতে” চলিল। পঞ্চজ-বাবু ৬টায় মোটর নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। “পুষাতে” অনেকে মার দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন। সকলে ভোরে মাকে পাইয়া মহা আনন্দ পাইলেন। সেখানে গুরু-গুলিকে দেখিলে কৃষ্ণের গোচারণের কথা মনে হয়। ভারি সুন্দর চেহারা। সেখান হইতে মা রায়সাহেব

স্বরেশবাবুর (গোপালের মার), বাড়ীতে গেলেন। রায়-
সাহেব মার কাছে আসেন না, মা আমাকে তাঁহার বাসায়
পাঠাইয়া নিজে মোটরে রহিলেন। তিনি আর কি করেন,
মার কাছে আসিলেন। মাও “বাবা, বাবা” বলিয়া ডাকিতে
লাগিলেন। তিনি হাতজোড় করিয়া মাকে প্রণাম করিলেন।
তাঁর স্ত্রী বলিলেন, “এই যে আমার গোপাল, তুমি একটু
আদর কর।” তিনি বলিলেন, “তুমি কর”। মা বলিলেন
“বেশত, আমিই বাবাকে একটু আদর করি,” এই বলিয়া
বাবার গায়ে একটু হাত দিলেন এবং শিশুর মত হাসিতে
লাগিলেন। স্ত্রী এত মার কাছে যায় বলিয়া নাকি ইনি
বকুনী দিয়াছিলেন। পরে শুনলাম, আজকার ব্যাপারের
পর আর স্ত্রীকে বকুনী দেন নাই।

সেখান হইতে দুর্গাবাবুর বাসায় গেলেন, যাওয়ার কথা ছিল।
দুর্গাবাবুকে দেখিয়াই মা বলিলেন, “বাবা, তোমাকে কাল ফেলে,
না বলেই আমি চলে গেলাম, তুমি বকুনী দেবে বলে আমার
ভয় হইছিল। আমি যে তোমাদের ভয় করি।” এই
বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দুর্গাবাবু মার সঙ্গে খুবই
আদর আবদার করেন। দেখিলাম দুর্গাবাবুর এখন আর
রাগ নাই। মা বলিলেন, “কাল যদি লুটের প্রসাদ না
পাঠান হইত, তবে বাবার চেহারাখানা দেখতে পেতে।”
এই বলিয়া আবার ভুবন-ভুলান হাসি হাসিতে লাগিলেন।

রসময়ীর রসের অভাব নাই। দুর্গাবাবু গলিয়া গেলেন।
সেখানে ফটো তোলা হইল।

সেখান হইতে মাকে রায়-বাহাদুর সতীশবাবুর বাসায় নিয়া
যাওয়া হইল। কিছু সময় থাকিয়া মাকে তাঁবুতে নিয়া আসা
হইল। সেখানে অনেকে বসিয়া আছেন। মা সকলকে নিয়া
বসিলেন, সকলের কথায় মা নাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে
সকলেই নাম করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। মার
ভোগ হইল। লোক সংখ্যা কমিতেছে না। ধীরে ধীরে
বাড়িয়াই চলিল। এবার মেয়েদের দিয়াও মা নাম
করাইলেন। সন্ধ্যার পর মাকে পিনাক-পাণির বাসায় কীৰ্ত্তনে
নিয়া গেলেন। প্রথমে চৌকীর উপর বাহিরে, মার বসিবার
জায়গা করা হইয়াছে, বারান্দায় কীৰ্ত্তনের জায়গা হইয়াছে।
মা চৌকীতে বসিতে রাজী হইলেন না। পরে মাটিতে
বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে আবার
হারাণবাবু প্রভৃতি আপত্তি করিলেন। মা নীচে বসিয়া
থাকিবেন, তাহারা বারান্দায় কি
করিয়া বসিবেন। মাকে একখানা
পিনাক-পানি নামক
জরনৈক ভঙ্গলোকের
নাস্তিকতা, বিশেষ
ভক্তিতে পরিবর্তিত।
জলচৌকী আনিয়া দেওয়া হইল।
পরে গল্প শুনিলাম, পিনাক-পাণির খুব
কষ্ট হইয়াছিল যে মা ঘরে যাইবেন না। শেষে চৌকী
আনিয়া মার জায়গা করিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাও
হইল না, শেষে, যখন মা মাটিতে বসিবেন, বারান্দায়

বসা সকলের আপত্তি হইল, তখন পিনাক-পাণি দেখিলেন এমন কোন জিনিষ নাই, বাহা মাকে বারান্দা বরাবর করিয়া বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরে হঠাৎ মনে পড়িল পূজার ঘরে ঠাকুর বসানো একখানা চৌকী আছে। তিনি আর দ্বিধা না করিয়া তখনই সেই চৌকীখানা মাকে আনিয়া দিলেন। ঠাকুর মাটিতে রাখিয়া আসিলেন। তিনি নিজেই এই কথা বলিয়া বলিতেছেন, “এই চৌকী-খানা মা যেন ঘটনাচক্রে নিলেন। কিন্তু তাহাতেই আমার প্রাণ শান্ত হইয়া গেল। মা নিজের চৌকী নিজে নিলেন।” এই পিনাক-পাণি মহা নাস্তিক ছিল। মার সঙ্গে উল্টা তর্ক করিতেন, শেষে এমন অবস্থা হইল যে, পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, “মা, আমার ভার তুমি নেও।” প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্বের মার সঙ্গে ইহাঁর দেখা হইয়াছিল।

শশীবাবুর এক পত্র আজ পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, “দিদি, এই নূতন স্থানে কি করিয়া মার ছবি প্রতিষ্ঠা করিব, উৎসব করিব, বড়ই চিন্তা ছিল। কিন্তু উৎসবের পূর্বের আশ্চর্যের বিষয়, অচেনা লোকও রাস্তা হইতে আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে। এমন উৎসব এখানে আর হয় নাই। আরও একটা কথা শুন—উৎসবের সময় মার আসনের ছবিখানায় মা পরিষ্কার হাঙ্গিয়াছেন। ইহা শুধু

আমি দেখিরাছি এমন নয়; গিরিজাবাবু, জটুর দাদা এবং আরও অনেকে দেখিরাছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।”

যাক্, কীর্তনের পর তাঁবুতে আসা হইল। চারুবাবু, হারাণবাবু সঙ্গীক এবং পঙ্কজবাবু প্রভৃতি ৩৪ জন রাত্রি ২৥০টা পর্য্যন্ত মার কাছে কাটাইলেন। হারাণবাবু বলিতেছেন, “মাগো, তুমি জগদগুরু, একটা কিছু পথ্য বলিয়া দাও।” আবার বলিতেছেন, “মা, বুঝি সবই, আমরা কত অপরাধী—তবুও তোমার কৃপার ভিখারী হইয়া আসিরাছি।” রাত্রি প্রায় ৪টার মা ও আমি শুইলাম।

১৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

ভোরেই হারাণবাবু সঙ্গীক উপস্থিত এবং আরও ৪৫ জন আসিয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৮টার মাকে মনি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী নিয়া গেল। তাহার স্ত্রী বেশ পূজাদি করে। সে স্বপ্নে দেখিরাছে, পূজার ঘরে মা দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন আর ভোলানাথ কীর্তনে নাচিতেছেন। তাই তিনি, মা ও ভোলানাথকে চিনিরাছেন। সেদিন কীর্তনের পর বউটি বাড়ী গিয়া ২ঘণ্টা অন্ত্রানের মত পড়িয়াছিল। মা বলিলেন, “বেশত, তোমরা এ বাসায় একটু নাম কর।” তাই হইল, সকলে মিলিয়া খুব নাম করিলেন, ভোলানাথ খুব সুন্দর নাচিলেন।

বেলা প্রায় ১০টায় মা তাঁবুতে ফিরিলেন! ১২টায় ভোগ হইল। অনেকেই আসিয়াছেন। আজ বেলা ৪টায় বাবা মাকে এরোপ্লেনে উঠাইবেন বলিয়া নিয়া গেলেন। ৫৬ বৎসর যাবত বাবার বিশেষ আগ্রহে মা রাজি হইয়াছেন। বাবা, ভোলানাথ, মা, আমি ও জ্যোতিষদাদা উঠিলাম। দলবল নীচে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া আছেন। ১৫ মিনিট ঘুরিয়া আমরা নামিলাম। সেখান হইতে দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী নিয়া গেল, সেখান হইতে তাঁবুতে ফিরিলাম। লোকে লোকারণ্য। আজ বীরেন কীর্তনের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৭১০ টায় কীর্তন আরম্ভ হইল, মা একপাশে মেয়েদের নিয়া দাঁড়াইয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। খুব সুন্দর কীর্তন হইল। মার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মা জানাইয়াছেন, আগামী কল্যাই ভক্তদের অফিস রাত্রি ১০টায় বেরিলি রওনা হইবেন। যাইতেও ভুল। সকলে খুব আপত্তি করিতেছেন। আজই মা যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না। কীর্তনের পর নরেন্দ্র চৌধুরী সপরিবারে বসিয়া আছেন এবং আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় সপরিবারে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ১১০টা বাজে—কাহারও যাওয়ার নামও নাই। বেশ আনন্দে কথাবার্তা হইতেছে, যেন দিনের বেলা। সচ্চিদানন্দ খেলাও মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। সকলের অফিস আছে, মা যাইতে বলিতেছেন, কিন্তু কাহারও উঠিবারও যেন ক্ষমতা

নাই। কি এক আনন্দে যেন সকলের দিন কাটিতেছে। সকলেই বলিতেছেন, “অফিসত চিরদিনই আছে, মাকে কবে পাইব। যেটুকু পারি সজ্জ করিয়া নেই।” বাহারা কখনও সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে আসেন নাই, তাহারাও মাকে দেখিয়া পাগল হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সকলে বিদায় নিলেন। আজ যে স্থানে সার্মিয়ানা টাঙ্গাইয়া কীর্তন হইল, আগামী কল্য মেয়েদের কীর্তন সেখানে হইবে স্থির হইয়াছে।

—: 0 :—

একাদশ অধ্যায়

—: * :—

১৯শে চৈত্র, শুক্রবার।

আজ রাত্রি ১০টার গাড়ীতে মা (বেরিলী রওনা হইবেন) স্থির হইয়াছে। সকালবেলা পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী আসিয়াছেন। আমরা যাঁর বাসায় আছি তাঁহার নামও বেরিলী যাত্রা। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। মা ইহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতাইয়া দিলেন। পঞ্চাননবাবুর মেয়েটি খুব সুন্দর গান করে। প্রায়ই পঞ্চাননবাবু সপরিবারে আসিয়া-

মেয়েটিকে দিয়া গান শুনাইয়া যান। মা তাঁহার স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সকলকেই মা মা বলিয়া ডাকেন। কিন্তু এক একজন কেমন সে সম্বন্ধটা ধরিয়া বসেন। এই পঞ্চাননবাবুর স্ত্রী প্রথম দিন আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়াছিলেন; কিন্তু মা যখন মা মা বলিয়া ডাকিলেন তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। বলিতেছেন, “তুমি যে আমার মেয়ে, আমি তোমার নাম, ‘মহামায়া’ রাখিলাম।” এই ঘটনার পর হইতে আর তিনি মাকে প্রণাম করিতেন না। বলিতেন, “তুমি যে আমার মেয়ে, তোমাকে প্রণাম করিলে তোমার অকল্যাণ হইবে। যশোদা ত কৃষ্ণকে প্রণাম করেন নাই।” এই বলিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেন এক একভাবে এক একজন মজিয়া আছেন। আর সকলেই মনে করিতেছেন, মা আমাকেই বুঝি বেশী ভালবাসেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অনেকেই মার কাছে বসিয়া আছেন। ১২টার পরই মা নামিয়া ভিতরে গেলেন। আঙ্গণে বহু স্ত্রীলোক কীর্তনে উপস্থিত হইয়াছেন। মধ্যস্থানে মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছে। খুব সুন্দর কীর্তন হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে মেয়েরা কীর্তন করিতেছেন। স্ত্রী কণ্ঠের সঙ্গীলিত নামের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বেলা ৫টা পর্য্যন্ত নাম চলিল। পরে কীর্তন বন্ধ হইল। অনেকে আজ মার ফটো তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া

আসিল। মা আজ চলিয়া যাইতেছেন, কাজেই সকলেই বিষাদ মুখে মার কাছে বসিয়া আছেন। সকলেই বুঝিয়াছেন আজ আর মাকে রাখা যাইবে না।

যাঁহার। একান্তে কথা বলিতে চাহেন; এর মধ্যেই সময় করিয়া মা সকলের বাসনাই পূর্ণ করিলেন। রাত্রি ৯টায় মাকে নিয়া সকলে স্টেশনে চলিলেন। পঞ্চাননবাবু (যাঁহার বাসায় আমরা ছিলাম) তিনি কাঁদিয়াই আকুল; স্টেশনে গেলেন না, বলিতেছেন, “আমি মাকে আনিতে যাব, এখন যাব না।” হুহুলাক মার সঙ্গে স্টেশনে আসিয়াছেন।

আজ গাড়ী ছাড়িতে একটু দেরী হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন, “গাড়ীও আজ আমাদের দুঃখ দেখিয়া দয়া করিয়াছে।” সকলের প্রাণের বেদনার গাড়ীর একটু দেরী হইলেও গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল। প্রণাম করিয়া সকলে গাড়ী হইতে নামিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নরেন্দ্র চৌধুরী সপরিবারে মার সহিত খানিক দূর যাইবেন বলিয়া টিকিট কিনিয়াছেন। তিনি আলিগড় পর্যন্ত গেলেন। রাত্রি ১টায় আমরা আলিগড়ে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা বেরিলী চলিলাম। নরেন্দ্রবাবু সারারাত্রি তথায় কাটাইয়া ভোরের গাড়ীতে দিল্লী রওনা হইবেন।

২০শে চৈত্র, শনিবার।

ভোরে বেরিলী পৌঁছিলাম। মহারতন মেয়েদের নিয়া স্টেশন হইতে মাকে ধর্মশালায় নিয়া আসিলেন। কাহাকেও সঠিক খবর দেন নাই, কারণ ভীড় বেশী হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমরা পৌঁছিবার কিছু পরেই এক উকিলের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মহারতন বলিল, “তুমি কি করিয়া খবর পাইলে যে মাতাজী আসিয়াছেন?” “সে জবাব দিল, “আমি ভাই কাল রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে মা আজ বেরিলী পৌঁছিবেন, সেই জন্তই আসিয়াছি।” এই ভাবে আরও কয়েকজনের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিলাম, তাহারা মাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে। এখানকার মেয়েরা বড় সুন্দর কীৰ্ত্তন করে। বাঙ্গালী নয়, অগ্গাঢ় দেশীয় মেয়েরা সব একত্র হইয়া মাকে নিয়া বসিল।

ফুলের মালায় মাকে সাজাইয়া দিল। তারপর নিজেরাই তবলা করতাল, হারমনিয়াম নিয়া বসিয়া গেল সুন্দর কীৰ্ত্তন হইল। ভোলানাথ মাঝখানে ভাবে বেশ নৃত্য করিলেন। মা ধূপ ও ফুল দিয়া সকলকে আরতি করিতে আদেশ করায়, আমিও যশপালের (মহারতনের) একটি মেয়ে আরতি করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক কাজই মার সর্বদা সুন্দর হওয়া চাই। বেলা প্রায় ১১টার ভোগ

হইল। বৈকালে আবার মেয়েরা কীর্তন করিল। সন্ধ্যা-বেলায় মোটরে মাকে বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হইল। একটা বাগিচা আছে, খুব সুন্দর সাজান। মার সহিত আমরা ৫৬ জন তথায় গিয়া অনেকক্ষণ ছিলাম, পরে মা ধর্মশালায় ফিরিলেন। আমেরিকানটি সঙ্গে সঙ্গে আছে, তাহার কি সব প্রশ্ন আছে, মার কাছে মীমাংসা করিয়া যাইবে। তাই মা আবার তাহাকে ও জ্যোতিষদাদাকে নিয়া বাহির হইলেন। রাত্রি ১০টার মা ফিরিলেন।

মার দ্বারা প্রশ্নের
সমাধানে আমেরিকান
সাহেবের সম্ভটি।

অনেক বসিয়া ছিলেন। মা আসিয়া বলিলেন, “সাহেবটি বেশ আসন করে ক্রিয়াদি বেশ করে”—তাহার প্রশ্ন শুনিয়াই মা বুঝিয়াছেন। যতীশ গুহ আমেরিকানটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে তো?” সে খুব আনন্দের সহিত বলিল, “আমি খুব সুন্দর জবাব পাইয়াছি, এমন সুন্দর জবাব আমি আর কখনও পাই নাই।” রাত্রি প্রায় ১১টার সকলে বিদায় নিলেন। এখানকার বাঙ্গালীদের কাহাকেও দেখিলাম না, অত্যাশ্চর্য দেশীয় লোকই মার কাছে আসিল।

২১শে চৈত্র, রবিবার।

সকালবেলায় মেয়েরা কীর্তন করিল। কথা হইয়াছে দিল্লী হইতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা সব আসিয়া এখানে

কীর্তন করিবেন। তাহাদের টেলীগ্রাম আসিল, কীর্তনের দল রবিবার ভোরে এখানে পৌঁছিবেন, ভোলানাথের মহা আনন্দ। আজ বৈকালে মাকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় নিয়া গেল। তথাও মাকে নিয়া মেয়েরা কীর্তন করিল। এখান হইতে মহারতন মাকে তাহার বাসায় নিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৯টায় আসিয়া ধর্মশালায় পৌঁছিলাম। অনবরতই মেয়েরা কীর্তন করিতেছে। বঙ্কিমবাবুর চিঠি

কক্সবাজারের তাঁবুতে
মা যেখানে শুইতেন
সেই স্থানে ভক্তদের
কীর্তন ঘর করার
জন্ত ব্যস্ততা।

কক্সবাজার হইতে আসিয়াছে। তাহাতে
লিখিয়াছে, মা তথায় তাঁবুতে যে স্থানে
শুইতেন, সে স্থান সকলে ইট দিয়া
বাঁধাইয়া দিয়াছে। সকলেই তথায়
যান, মার কীর্তনঘর উঠাইবার জন্ত
সকলেই ব্যস্ত। তাহার চিঠিতে

সকলের মার অভাবে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন
তাই শুনিতে শুনিতে আমাদের ও চোখে জল আসিল।

২২শে চৈত্র, সোমবার।

ভোরেই প্রায় ১৭১৮ জন মার ভক্ত স্ত্রী, পুরুষ আসিয়া
পৌঁছিলেন। এখানকার লোকেরা তাহাদের খুব যত্ন করিলেন।
ধর্মশালায় এক ঘর সাজাইয়া বেলা ১২টায় কীর্তন আরম্ভ
হইল। সকালে এখানকার মেয়েরা একত্র হইয়া তাহাদের
কীর্তন শুনাইল। মা সকলের মধ্যেই ঘুরিতেছেন, কখনও

গিয়া বিছানায় বসিতেছেন। কয়জাবাদ হইতে লক্ষ্মীরাণী ও পানীর ছেলের বউ, তার বোন সহ মার দর্শনে আসিয়াছেন। মহা আনন্দশ্রোত চলিতেছে। মহারতন সকলের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দুপুরের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল। কীর্তন হলের পাশের হলটায় মেয়েদের নিয়াও কীর্তন বেরিলী ধর্মশালায় কীর্তন, করাইতেছেন। এক নাম চলিল— দিল্লী ও অগ্ন্যন্ত স্থান হইতে “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, আগত ভক্তদের কীর্তন। হরে-কৃষ্ণ হরে-রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।”

ঝম্ ঝম্ কীর্তন চলিল। ভারি সুন্দর কীর্তন হইল। ধর্মশালার লোকে লোকারণ্য। যে আসিতেছে নামে যোগ দিতেছে। পুরুষরা খাইতে আসিলে সেই ঘরে মা মেয়েদের নিয়া কীর্তন করিলেন। মা সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছেন, মধ্যে মধ্যে বাম হাতখানি উঠাইয়া হেলিতে হেলিতে তুলিতে তুলিতে চলিতেছেন। চোখের কি সুন্দর ভাব। কখনও এক একজনের গলা জড়াইয়া জড়াইয়া তালে-তালে নাচিতেছেন। কখনও সকলের হাত ধরাধরি করিয়া গোলাকৃত করিয়া নাচিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর ধ্বনিতে ধর্মশালা আনন্দময় হইয়া উঠিল। ফুলের মালা ও চন্দনের ছড়াছড়ি। বৈকালে ভোলানাথ কীর্তনে নাচিতে লাগিলেন। রাত্রি ৮টা অবধি এই ভাবে কীর্তন চলিল। পরে আনন্দময়ীর জয়ধ্বনি, ভোলানাথের জয়ধ্বনি দিয়া কীর্তন শেষ হইল। দিল্লীযাত্রীরা আজই রাত্রি ১০টার গাড়ীতে রওনা হইবেন। সময় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু

কেহই মার নিকট হইতে উঠিতে পারিতেছেন না। বখন আর থাকা চলে না, তখন বাধ্য হইয়া সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। আজ রাত্রি ১০টায় বতীশগুহও কলিকাতা রওনা হইলেন।

২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজও মা উঠিবার পূর্বেই মেয়েরা আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিল। মা বারান্দায় শয়ন করেন, আমরাও মারের শয্যার চারিদিকে শয়নের স্থান করিয়া নেই। মা সকালে উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়াছেন, মেয়েরা আসিয়া কীর্তন করিতেছেন। অনেক ফুল ও মালা মার উপর পড়িয়াছে। ফুল ও মালা দিয়া মাকে প্রণাম করিয়া, করিয়া সকলে কীর্তনে বোগ দিতেছেন। মা উঠিয়া বসিলেন। খুব জোর কীর্তন চলিল। বেলা প্রায় ৯টায় কীর্তন শেষ হইল। মাকে উঠাইয়া মুখ ধোয়ান হইল। পরে একটু দুধ খাইয়া মা আবার গিয়া তাঁর চোটে বিছানাটুকুতে বসিলেন। মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতেছে। ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, সুন্দর সুন্দর মেয়েরা সাজ-সজ্জা করিয়া আসিয়াছে। নামের তালে, তালে নাচিতেছে। হাতে খরতাল বাজাইতেছে। কেহ কেহ তবলা বাজাইতেছে। মা মাঝখানে ছোট মেয়েদের দিলেন, তারপর বয়স্ক স্ত্রীলোকেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম কীর্তন করিতেছে। তাহারা বখন নাচিয়া নাচিয়া

দুই হাতে খরতাল বাজাইয়া নাম করিতেছিল, তখন দেখিয়া বাস্তবিকই খুব আনন্দ হইতেছিল। গত কল্যের কীর্তনে এখানকার বাঙ্গালী এবং অগ্ৰ্য্য দেশীয় লোকেরাও বোঁগ দিয়াছেন। শুনিলাম এখানেও কীর্তনাদির দল আছে। একটা স্থানে নাকি এক বৎসর অখণ্ড নাম চলিয়াছিল। পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেরাই এই অখণ্ড নাম রক্ষা করিয়াছে। সেই কীর্তনের পরই এখানে গ্রামে গ্রামে কীর্তনের প্রচলন হয়। কাল কীর্তনের পর মাকে এখানকার ভদ্দলোকেরা কেহ কেহ বলিতেছিলেন, “মা, আপনার এই কীর্তনে সহরে কীর্তনের প্রচলন করিবে।” আজ সকালে মেয়েরা ফুলের মকুট ও অগ্ৰ্য্য গহনা দিয়া মাকে সাজাইল। মাও ছেলে-মানুষের মত হাসিতেছেন। আমাকে ডাকিয়া দেখাইলেন।

এইভাবে খেলায় খেলায় বেলা প্রায় ১২টার মার ভোগ রান্না হইল। মার ও ভোলানাথের খাওয়ার পর অনেকেই প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এতদেশীয় মেয়েরা মার মুখের প্রসাদ খাইবার জন্ত ব্যস্ত। মাকে এখন আর ইহার দূরে দূরে রাখেনা—মার হাত ও পা বা পিঠ নিয়া টিপিতে বসিয়া বায়। মোটকথা মার স্পর্শ-সুখ হইতেও এখন ইহার বঞ্চিত থাকিতে চায় না বা পারে না। প্রথম প্রথম ইহার দূরে বসিয়া ফুল দিয়া পূজা করা বা আরতি করা, প্রণাম এই সবই করিত; স্পর্শ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু মার

মার আকর্ষণী শক্তিতে
সকলে মার নিকটে
থাকিতে চায়।

আকর্ষণী শক্তিতে এখন সে দূরত্ব-
টুকুও চলিয়া গিয়াছে। ১০।১৫ জনই
হয়ত মার হাত পা বা শরীরটা নিয়া
টিপিতে বসিয়া গেল। কেহই নিজের

নিজের জায়গা ছাড়িতে রাজি নয়। কি এক আকর্ষণী
শক্তিতে সকলে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা নিজেরাও যেন সব
সময় বুঝিতেছে না। এই আনন্দে সকলে মাতোয়ারা হইয়া
আছে। ভোলানাথকে নিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খুব
ব্যস্ত। তাহারা ভোলানাথকে ছাড়িতে চায় না। তিনি
ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসেন। ভোগের পর মাকে একটু
কাপড় ঢাকা দিয়া বলিলাম, “তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর।”
মা ছোট্ট শিশুর মত তাই করিলেন। সকলে ভোলানাথের
সঙ্গে সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে বসিয়া গেল। কিন্তু মা
শুইয়া থাকায় খেলা বেশীক্ষণ চলিল না। মা শুইয়া থাকিলে
সকলেই যেন চুপচাপ হইয়া পড়ে। আনন্দ শ্রোত কমিয়া
যায়। কিছু পরেই মা উঠিয়া বসিলেন। আবার কীর্তন চলিল।
অনেকে একান্তে মার সঙ্গে কথা বলিবেন, তাই মাকে এক
বাসায় নিয়া গেল—বিহারী লালের বাসায়, ইনি ইম্পিরিয়াল
ব্যাঙ্কের এজেন্ট। রাত্ৰিতে মা ফিরিলেন। বাঙ্গালীরা
আসিয়া মার কাছে কীর্তন করিল। রাত্ৰি প্রায় ১২টায়
সকলে বিদায় নিলেন। নরেন্দ্রবাবু আজ দিল্লী ফিরিলেন।

মার সঙ্গ ছাড়িয়া কেহই ঘাইতে পারেন না, তাই যেটুকু থাকিতে পারেন থাকিয়া যান।

২৪শে চৈত্র, বুধবার।

আজও সকালে মেয়েরা সব কীর্তন করিল। “জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর” কীর্তনের পর অনেকে মাকে নিয়া একান্তে কথা বলিলেন। তারপর মহারতন মাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। দুপুর বেলা মাকে নিয়া ফিরিলেন, অনেক কাপড় কিনিয়া আনিয়াছেন। আর মাকে একখানি লাল সিল্কের সাড়ী পরাইয়া, সিল্কের জামা, রুমার ও লাল জুতা দিয়া সাজাইয়া আনিয়াছেন। মা সেই পোষাক দিক্কাঁতের বাড়ী দেখাইতে গিয়াছেন। দিক্কাঁতের স্ত্রী ধর্মশালাতেই মার ভোগ রান্না করিতেছিল। মা ধর্মশালায় আসিয়া সকলকে সেই পোষাক দেখাইতেছেন। একটি বাঙ্গালী যুবক মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “মা যেন আজ মোহিনী সাজে সাজিয়াছেন।” সত্যি, এ পোষাকে যেন মার রূপ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সবই সুন্দর। সকলে মিলিয়া আনন্দ করার পর মা সেই পোষাক ছাড়িয়া ফেলিলেন ও শুইয়া পড়িলেন। আজ লক্ষ্মী ও দিক্কাঁতের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) স্ত্রী মার ভোগ রান্না করিয়াছে। ফয়জাবাদ হইতে বাহারা আসিয়াছেন, তাহারাও মাকে নানা তরকারী রান্না করিয়া দিলেন, মার ভোগ হইল। ভোগের পর মা গিয়া আবার কিছু সময়

কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। মেয়েরা সব বসিয়া আছেন, মা ভোগের পরই লক্ষ্মীকে বলিলেন, “লক্ষ্মী, আজ রান্না করিতে তোমার কোন জায়গা পুড়িয়া গিয়াছে কি?” লক্ষ্মী বলিল, “না মা, কোন স্থানতো জ্বলিয়া যায় নাই।” মা কিছু বলিলেন না। মা উঠিয়া বসিলেন, আবার আনন্দশ্রোত চলিল। মা জ্যোতিষদাদাকে বলিলেন, ‘কেহ কি ট্রেন ফেল করিয়াছে?’ জ্যোতিষদাদা বলিলেন, “না” কিন্তু পরদিন শুনলাম—নরেন্দ্রবাবু ট্রেন ফেল করিয়া ষ্টেশনে পড়িয়াছিল। মাকে আজ বৈকালে দ্বারকাপ্রসাদ উকিলের বাসায় নিয়া গেল। সেখানে মেয়েরা কীর্তন করিবে। বাগানের ভিতর খুব বড় একটা জায়গা ঘেরাও করিয়া তাহার ভিতর জায়গা করিয়াছে। মাকে তাহারা রেশমের পীতবর্ণের ধূতি পরাইল। ফুলের গহনা দিয়া সাজাইল। মা হাসিয়া হিন্দীভাষায় বলিতেছেন, “বরতো সাজাইলে, এখন বধু কোথায়?” মার এই কথায় মেয়েরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেক মেয়েরা আজ পীতবর্ণের সাদী পরিয়াছে। মা দেখিয়া বলিলেন, “তোমাদের কি পূর্ব হইতে ঠিক ছিল নাকি?” মাকে, ভোলানাথকে বসাইয়া ফটো নেওয়া হইল। পরে আমাদের নিয়া একটা গ্রুপ তোলা হইল। তারপর মাকে বসাইয়া মেয়েরা যুগ্মর পরিয়া একে একে নাচিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গান চলিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রী মিসেস্ দক্ষীতও পীতবর্ণের সাদী যুগ্মর পরিয়া নাচিতেছেন। গানের ভাবটি

এই যে, “হে ভগবান, আমার আরজি শোন। আমি সংসারে ভাসিয়া বাইতেছি। হে দীন-দয়াল, তোমার যেমন মরজী (ইচ্ছা) হয় কর।” এমন সুন্দরভাবে মাকে লক্ষ্য করিয়া, মার দিকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া এই গানটির সঙ্গে সঙ্গে নাচিলেন, বড়ই মিষ্টি লাগিল। নাচের পর মাকে প্রণাম করিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল। পীতবর্ণের সাড়ীপরা

মেয়েরা মাকে মাঝখানে রাখিয়া
নানারূপ অভিনব বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন।
ভক্তদের মার নিকট কীর্তন
ও আরতি। নামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। চক্রা-

কারে সকলে ঘুরিতেছে। কখনও হাত ধরিয়া, কখনও হাততালি দিয়া নাচিতেছে—সবাই একসঙ্গে ঐভাবে নাচিতেছে। অত্যাণ্ড অনেকে বসিয়া বসিয়া নামে বোগ দিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—মাও মধ্যে মধ্যে কাহারও গলা ধরিয়া, কাহারও হাত ধরিয়া নাচাইতেছেন ও একটু একটু নাচিতেছেন। , সুন্দর সুন্দর পোষাক, গলায় মালা, কপালে চন্দন—মা স্বয়ং উপস্থিত, কীর্তনে নানা নাম হইতেছে—কখনও “জয় গুরু, জয় মা ; জয় গুরু, জয় মা,” কখনও “গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়,” কখনও “রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত-পাবন সীতারাম,” কখন “হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, সীতারাম জয় রাধেশ্যাম।” এইরূপে নামে ধনি উঠিয়া যেন আকাশ, বায়ুমণ্ডল সব পবিত্র করিতেছে। প্রকৃতিরোগীও যেন মুগ্ধ

হইয়া এইসব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। কীর্তনের পর মা ও ভোলানাথকে বসাইয়া আরতি করিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আরতির গান ধরিল। দেবীর আরতি গান—ভাবার্থ এই, “মা তরা, তোমার পার কেহ পায় না। চারি বেদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সব তোমারই নাম করিতেছে; কিন্তু পার পাইতেছে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।” আরতির পর ফল ভোগ হইল। মাকে আজ বাঙ্গালীরা তাহাদের কীর্তনে নিয়া যাইবে, মোটর দাঁড়াইয়া আছে। তখনই মাকে মোটরে নিয়া গেল।

আমরা মার সঙ্গে বাঙ্গালীদের কীর্তনে গেলাম। সেখানে সকলে মাকে পাইয়া খুব আনন্দ করিল। যাহারা পূর্বে মার দর্শন পায় নাই তাহারা আজ মাকে দর্শন করিল। বাঙ্গালীমহলে এখানে মা বিশেষ পরিচিতি নন। শুধু এক প্রফেসার দাশগুপ্তের স্ত্রী গতবার মাকে দেখিয়াছেন, তিনি এবারও আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম একটু ভদ্ৰভাবে চুপচাপ থাকিতেন। আজ দ্বারকা প্রসাদের বাসায় কীর্তনের পর মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন, “মা, কাল আবার যাব, তোমাকে আমার বাসায় নিয়া আসিব। তোমাকে ছাড়িয়া যেন ঘরে থাকিতে পারিতেছি না।” আমি হাসিয়া বলিলাম, “এ কয়দিনতো বেশ ভদ্ৰভাবে দূরে দূরে চুপচাপ ছিলেন, আজ বুঝি মার আকর্ষণী শক্তিতে জড়াইয়া পড়িলেন।” তিনিও হাসিয়া উঠিলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত কীর্তন হইল। পরে মাকে ফল ভোগ দিল। একটি ছেলে বলিতেছে “মা, এসব খাইতে হইবে।” মা বলিলেন, “বেশ, তোমরা সব আন, সব খাইয়া ফেলিতেছি, একটুও খালাতে থাকিবে না।” ছেলেরা সব মাকে ঘিরিয়া বসিল। আমাকে হাতে হাতে সব দিতে বলিলেন। খালা খালি হইয়া গেল। মা হাসিয়া বলিলেন, “দেখ, খালাতে আর নাই, সব খাইয়া ফেলিয়াছি।” একথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। মা রাত্রি ১২টার ধর্মশালার ফিরিলেন। মহারতন মেয়েদের নিয়া বাসায় ফিরিল।

লক্ষ্মী ও ফয়জাবাদ হইতে তাহার সঙ্গে বাহারা আসিয়াছেন, তাহারা মার কাছেই শুইয়া পড়িল। সকলকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছেন। এতদেদ্বীয় একটি স্ত্রীলোক বলিতেছিল, “বাসায় থাকিতে পারি না। দেখুন, আমার ছেলেটির খুব অসুখ ডাক্তার আসিয়া আমাকে বাসায় না দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল যে এমন ছেলে রাখিয়া তাহার মা কোথায় গিয়াছে। কখনও আমাকে এভাবে যাইতে দেখে নাই। চাকরদের জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও আমার খবর কিছু দিতে পারে নাই; কারণ, আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়াই ধর্মশালায় চলিয়া আসিয়াছি। মেয়েদের যদি বলি, তোমরা একজন থাক— তাহারাও কাঁদিতে বসিয়া যায়। মার যে কি শক্তি, ছেলে বুড়ো কাহাকেও ঘরে

থাকিতে দিতেছেন না।” এই রকম নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল।

যশপাল জ্যোতিষদাদাকে বলিতেছিলেন, “সহরেতো মার বিরুদ্ধে নানাকথা উঠিয়াছে।” জ্যোতিষদাদা বলিলেন, “কি রকম?” তিনি বলিলেন, “আমি আজ ডেপুটির বাড়ী গিয়াছি— ডেপুটিসাহেব বলিতেছেন, “দেখুনতো কি বিপদেই পড়িয়াছি; অফিস হইতে ঘরে আসিয়াছি, দেখি স্ত্রী ঘরে নাই। শুনলাম মাতাজীর কাছে ধর্মশালায় চলিয়া গিয়াছে। মাতাজী আসার পর হইতেই ঘরে ঘরেই এই অভিযোগ।” এইভাবে মার লীলা চলিতেছে।

২৫শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

মা সকালে উঠিয়াছেন। অনেকে একান্তে আলাপ করিলেন। ভজন, কীর্তন হইল, মার আরতি হইল। পরে সকলে মাকে নিয়া বসিয়াছে, কথাবার্তা হইতেছে। আবার সচ্চিদানন্দ খেলার বসিল। সঙ্গে হার জিতের নাম কীর্তন ও জপ চলিল। বেলা প্রায় ২টার মার ভোগ হইল। ভোগের পর মা গিয়া শুইয়া পড়িলেন। সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। কাহারও বলা কওয়া নাই, বাহার ইচ্ছা প্রসাদ পাইতে বসিয়া যাইতেছে। মা শুইয়াছেন, কেহ কেহ এই অবসরে তাড়াতাড়ি বাড়ী

হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিতে চলিল—যাহাতে মা শুইয়া থাকিতে থাকিতে ফিরিয়া আসিতে পারেন। কেহ কেহ বাড়ী বাইতেই রাজী নয়।

এইখানেই যাহা হয় খাইয়া মার কাছে গিয়া বসিয়া আছেন। আজ সকালেই লক্ষ্মী, মাকে আসিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন “মা, আমার কাল একটা আঙ্গুল জ্বলিয়া গিয়াছিল ;
 মার দূরদৃষ্টি।

কাল টের পাই নাই। তাই তুমি বখন কাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি বলিয়াছিলাম, কিছু জ্বলে নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছি আঙ্গুলে ফোঁকা পড়িয়া রহিয়াছে।” আজও বৈকালে মাকে প্রফেসার দাশগুপ্তের বাসায় নিয়া গেলেন তথা হইতে এ দেশের এক ভদ্রলোকের বাড়ী মেয়েদের কীৰ্ত্তনে নিয়া গেল। তথায়ও মাকে ময়ুর পাখা, ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাজাইল। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত কীৰ্ত্তন চলিল।

তারপর মহারতনের বাসায় মাকে নিয়া গেল ; তথায় এঁখানকার বেগমসাহেব মার সহিত একান্তে মিলিবেন। আমি সঙ্গে গেলাম। মা সেখানে যাওয়ার পরই বেগমসাহেব আসিলেন, সঙ্গে আরও দুটি স্ত্রীলোক। একটি নাচ গান করে। মার কথা বেগমসাহেব মহারতনের কাছে শুনিয়াছিলেন। সিভিল লাইনেই নবাবের বাড়ী, মার সঙ্গে বেগম রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কথাবার্তা বলিলেন। নিজের সাংসারিক

ছুঃখ ও জানাইলেন। আবার সাধন ভজনের কথা ও বলিলেন। বেগমটি বেশ শুদ্ধভাবে থাকে। রাত্রি ১২টায় মা ধর্মশালায় ফিরিলেন। খাওয়া দাওয়া কিছুই হইল না, রাত্রি ১১০টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন।

২৬শে চৈত্র, শুক্রবার।

ভোরে এক ডেপুটির স্ত্রী মাকে গঙ্গায় নিয়া যাইতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। মাকে নিয়া নৌকায় বেড়াইবেন। প্রায় ৬১০টায় সকলে গঙ্গায় চলিলাম, মোটরে কীর্তন চলিতেছে। মেয়েরা গান করিতেছে—
 গানের মর্মার্থ এই, “মা আমরা তোমার শরণ নিয়েছি, তুমি আমাদের উদ্ধার করিও।” আবার একগান হইল, তাহার মর্মার্থ এই যে, “সকলে মার চিন্তা কর, মার নাম কর মার নাম বিনা কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না ইত্যাদি।” প্রায় ৯১০টা অবধি নৌকায় কীর্তন চলিল। তারপর মাকে আর এক বাসায় নিয়া গেল। সেখান হইতে এক মন্দির ও বেগমসাহেবের কুঠি হইয়া মা ধর্মশালায় ফিরিলেন। আগামীকাল্য নৈনিতাল রওনা হইবার কথা আছে। প্রায় ১১০টায় মা ফিরিলেন। খাওয়া দাওয়া তখন কিছুই করিলেন না। বহুলোক আসিয়াছেন, মা বসিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া বতটা সম্ভব গায়ের কাছে গিয়া বসিতেছে। এই কদিনের মধ্যে

গৃহস্থ পরিবারই বাসার সঙ্গে বড় সম্পর্ক রাখিতেছেন না। সকলের চেহারাতেই যেন একটা শুষ্কভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাঠারও মাথায় তেল নাই, চিকুণী ও দিবার সময় নাই, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম খুবই অনিয়ম মত চলিতেছে। তবুও যেন সকলে আনন্দে আত্মহারা। প্রতিদিনই প্রায় ২।১ বাসায় কীর্তন চলিতেছে। সকলেই তথায় একত্র হইতেছেন। বাঁয়া, তবলা, খরতাল (পাঞ্জাবী মেয়েরা কীর্তনের সময় বাজায়) নিয়া মেয়েরা সব কীর্তনে বসিয়া গেল। মার বসিবার স্থানই বা কত সাজাইয়া রাখে।

প্রতি বাড়ী বাড়ীই কীর্তনে মাকে নিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন; কিন্তু সময় নাই বলিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণকরা অসম্ভব। আজও আবার মাকে গঙ্গায় বেড়াইবার জন্ত সদলবলে নিয়া বাইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট বিহারীলাল আসিয়াছেন। ৪।৫খানা মোটর ভর্তি হইয়া

সকলে গঙ্গায় গেলেন। নৌকায় ভক্ত সহ গঙ্গার উপর নৌকায় ভ্রমণ ও কীর্তন। বেড়ান হইল। বহু স্ত্রীলোক ও ভদ্রলোকেরা সঙ্গে আছেন। কীর্তনাদি হইল। মাকে ফুলের মালায় সাজাইয়া

আবার সকলে সেই প্রসাদী মালা নিজেদের মধ্যে বিলি করিল। বিহারীলাল কিছু জল খাইবার উত্তোগও করিয়াছিল। মেসিনে বরফ ও দুধ মিলাইয়া তৈয়ার হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে গঙ্গা হইতে জমিদার মিহির প্রসাদের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেল। তথায়ও মেয়েরা কীর্তন করিবে। খুব সুন্দর করিয়া কীর্তনের স্থান সাজান হইয়াছে। মেয়েরা খুব কীর্তন করিল। আজও ফুলের মালায় মাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া মার চারিদিকে নাচিয়া নাচিয়া প্রায় ২০।২৫ টি কুমারী কীর্তন করিতে লাগিলেন। বয়স্কারা বাজনা নিয়া একধারে বসিয়াছেন। মেয়েরা মাকে বলিতেছেন, “মা, উঠিয়া আস। তুমি আমাদের কৃষ্ণ, আমরা সব গোপিনী”। আর একদিনও তাহারা এইভাবে মাকে উঠাইয়া নিয়া গোপিনী সাজিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিয়াছে।

আজ আর মা উঠিলেন না। তাহারা তখন মার চারিদিকে এমন সুন্দরভাবে কখনও চক্রাকারে কখনও অর্দ্ধচক্রে সারি সারি দাঁড়াইয়া আরও কত রকম ভাবে ঘুরিয়া মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তন করিতে লাগিল; আবার একইভাবে সকলে ঘুরিতে ঘুরিতে মার চরণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, কখনও একভাবেই সকলে একই সময় প্রণাম করিতেছে। মাকে উঠাইয়া আনিবার জ্ঞান আর তাহাদের ব্যস্ততা নাই। তাহারা যেন সেই সময়ের জ্ঞান একভাবে মাতিয়া গিয়াছে। আলোয় আলোয় স্থানটা সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তার মধ্যে এই লীলা দেখিলে সাধারণতঃ সকলেরই বৃন্দাবনের কথা মনে জাগে। আমার

ত খুবই জাগিতেছিল। এমন সুন্দর আমি আর দেখি নাই।
 কি অপূর্ব ভাব! এই দেশীয় মেয়েদেরও যেন কেমন একটা
 স্বাধীন ভাব। সঙ্কোচের বড় ধার ধারে না। আজও
 মেয়েরা কীৰ্ত্তনের তালে তালে গোল হইয়া হাত ধরাধরি
 করিয়া সকলে নাচিতেছে। তাহাদের রং বেরংয়ের শাড়ী
 পরা। আলোকের মধ্যে ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল।
 রাত্রি প্রায় ১০টার মা ধর্মশালার ফিরিলেন। বিহারীপুর
 হইতে বাঙ্গালীরা মার কাছে কীৰ্ত্তন করিতে ধর্মশালার
 আসিয়া কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন।

মা আজ ১২টার গাড়ীতে চলিয়া যাইবেন, তাই সকলেই
 উপস্থিত হইয়াছেন। অনেকের চোখের জল পড়িতেছে।
 লক্ষ্মীরাণীও আজ দেহাছুন চলিয়া যাইতেছেন। রাত্রি প্রায়
 ১০টা বাজিল, রওনা হইবার সময় হইল। মা হঠাৎ
 মেয়েদের নিয়া কীৰ্ত্তনের ঘর হইতে অগ্ন এক ঘরে আসিয়া
 বসিলেন। দুইখানা শাড়ী ফুলের মালা ও মিষ্টি মার কথা
 মত আনা হইল। মা আমাকে লক্ষ্মীকে দিয়া মহারতনও
 বিহারীলালের জীকে ঐ কাপড়, মালা ও মিষ্টি দেওয়াইলেন।
 পরে তাহাদের বলিলেন, “তোমাদের আজ বন্ধুত্ব পাতান
 হইবে।” এই বলিয়া দুইজনকেই বলিলেন, “তোমরা শাড়ী
 বদল কর, মালা বদল কর, মিষ্টিও পরস্পরকে খাওয়াইয়া
 দেও।” পরে বলিলেন, “এবার আলিঙ্গন কর।” মার

কথামত তাহারা তাহাই করিতেছেন। এবার মা বলিলেন, “মহারতনের নামও আমিই মহারতন রাখিয়াছিলাম, তোমার নাম প্রেমরতন”।

তখন মহারতন ও প্রেমরতন একত্র হইয়া মার চরণে প্রণাম করিলেন। মা বলিলেন, “তোমরা আজ ধর্মের বন্ধু হইলে। ঐদিকে বাইবার সাহায্যই দুইজন দুইজনকে করিবে।” সকলকে মিঠাই ও মালা বিতরণ করা হইল। সকলে মহানন্দে হাততালি দিলেন। এই খেলা শেষ হইতেই যাওয়ার ডাক পড়িল। ৪।৫ খানা মোটর ভরিয়া সকলে স্টেশনে চলিল। ১১টায় লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন, সঙ্গে শেরসিং সপরিবারে গেলেন। শেরসিং (চৌধুরী সাহেব) মার দর্শনের জন্য দেরাদুন হইতে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। অনেকেই কাদিতেছেন, কেহ কেহ মার সঙ্গে নানা কথা বলিতেছেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা পুনঃ পুনঃ মার ও ভোলানাথের জয়ধ্বনিতে স্টেশন মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। বিহারীবাবুর স্ত্রী মার জন্য নূতন বিছানা নিয়া আসিয়াছেন। বেরিলী হইতে নৈনিতাল তিনি নিজেই গাড়ীতে তাহা পাতিয়া যাত্রা সমৃদ্ধিশালী দিলেন। ট্রেনের কিছু দেরী হইতেছে, পরিবারের মেয়েদের রাত্রি প্রায় ১টায় গাড়ী ছাড়িল। যাত্রা সময়ে ব্যাকুলভাবে স্ত্রীলোকেরা কাদিতে কাদিতে অস্থির। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনে তাহাদের চেহারার অনেক দোড়াইয়া যাওয়া।

সকলেই পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। ভোগ-বিলাসের চিহ্ন প্রায় লুপ্ত দিনরাত একটা নেশায় কাটাইয়াছেন। আজ সেই আনন্দের খনি চলিয়া যাইতেছে, তাই সকলের প্রাণই কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা বলিল, “মা, আমরা আগামী শনিবার তোমার কাছে যাইয়া কীৰ্ত্তন করিয়া আসিব”। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কয়েকটি মেয়েছেলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর দৌড়াইয়া চলিল। আমরা নিষেধ করিতেছি, কিন্তু কেহ শুনিতোছে না; একজন আর একজনকে বলিতেছে, “ছুটিয়া চল”। প্রাণপণে ছুটিতেছে—কিসের আশায়? মাকে তখন তাহারা দেখিতেও পাইতেছে না, দৌড়িয়া দেখিবে সে আশাও নাই। তবুও পাগলের মত ছুটিয়াছে।

এই গাড়ীতে মা আছেন, বহুদূর পারি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইব—এই তাহাদের প্রাণের কথা। কি সুন্দর প্রেম, ইহার তুলনা নাই। অল্প বয়সের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়েরা—সর্ববিদা ভোগ বিলাসে প্রতিপালিত; আজ রাত্রি ১টায় ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহার আকর্ষণে ছুটিয়াছে? যিনি এই বালিকাদের প্রাণে এই স্বর্গীয় প্রেমের আভাষ এত অল্প সময়েই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। শুধু প্রণামেও যেন প্রাণের ভাব কিছু ব্যক্ত হইবে না—কিমে যে হইবে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না;—বোধহয় ধারণাও

করা যায় না। ক্রমেই মেয়েরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল।
গাড়ী ছুটিয়া চলিল। রাত্রির গায় অন্ধকারে তাহারা মিলাইয়া
গেল। আমারও প্রাণের ভিতরটা আলোড়িত করিয়া
দিয়া গেল।

দ্বাদশ অধ্যায় :



২৭শে চৈত্র, শনিবার।

ভোর ৬টার আমরা কাঠগুদাম পৌঁছিলাম। এখান
হইতে মোটরে নৈনিতাল বাইতে হয়। প্রায় ১১০ ঘণ্টা
কি ২ ঘণ্টার রাস্তা। আমরা বেলা ৮টা ৮১০টার নৈনিতাল
পৌঁছিলাম। দিল্লীর চিন্তামণি পাস্তুর ভাই এখানে তহশিলদার।
তিনি এবং আরও কয়েকজন মোটরের কাছে উপস্থিত ছিলেন।
মাকে রিক্সাতে ধর্মশালায় নিয়া যাওয়া হইল। প্রায় এক
মাইল ব্যবধানেই ধর্মশালা। মোটর হইতে নান্নিয়াই সম্মুখে
তালিতাল (Lake) দেখিলাম। এক মাইল ব্যাপী তালিতাল।

ঐ উঁচু পাহাড়ের উপর এমন সুন্দর জলাশয় দেখিয়া ভারি আনন্দ হইল। চারিদিকেই পর্বতমালা আকাশস্পর্শ করিতেছে। পাহাড়ের গায় গায় বাড়ী ঘরগুলি বেশ সাজান। সবচেয়ে শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, তালিতালটি। মা ও আমি এক রিক্সাতে গেলাম। মা বলিতে লাগিলেন, “গতবার যখন আসিয়াছিলাম তখন ইহা আরও জলপূর্ণ ছিল, তাই আরও সুন্দর দেখাইত।” আমরা নয়নাদেবীর মন্দির সংলগ্ন ধর্মশালায় আসিলাম। পূর্বেও মা এখানেই থাকিয়া গিয়াছেন। মা পৌঁছিতেই পূজারী, চাকর, চৌকিদার সকলেই মাকে ফুল চড়াইল, প্রণাম করিল এবং মা আমার আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেঘ

করিয়াছিল। তালিতালের উপরেই নৈনিতাল আগমন।

এই ধর্মশালা; একদিকে তালিতাল, একদিকে একটু ময়দান। সেইখানেই সমতলভূমি বরফের মত ঠাণ্ডা। মা আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রান্নার জোগাড় করিতে করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। প্রায় ২টার মার ভোগ হইল। পাহাড়ীরা অনেকেই আসিতে লাগিল। বৈকালে মার সহিত আমরা একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাত্রিতেও লোক আসিতেছে, কিছু সময় থাকিয়াই দলে দলে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছে—আবার একদল আসিতেছে। এইভাবে রাত্রি ৯টা বাজিল। এখানকার এক ভদ্রলোক দেবীদত্ত, ইনি কুমার; শুদ্ধভাবে থাকিয়া সাধন-ভজন করেন, প্রেম আছে। ইনিই আমাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া

দিতেছেন। মার সহিত ইহার অনেক পূর্বেই দেখা হইয়াছে। একবার দেৱাধ্বন হইতে মা জ্যোতিষদাদা, হরিনাম প্রভৃতিকে নিয়া অল্প সময়ের জন্য আলমোড়া হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তখনই দেবীদত্তের সঙ্গে দেখা হয়। পরে হৃষিকেশে মার সহিত দেখা হইয়াছে। ইনি খুবই মার ভক্ত, মার যতটুকু সেবা করিতে পারেন, সেইজন্য বিশেষ আগ্রহ আছে। আজ রাত্রি প্রায় ১০টাতেই আমরা শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু অসময় বলিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল।

২৮শে চৈত্র, রবিবার।

মা সকালে উঠিয়া জ্যোতিষদাদার সহিত একটু বাহির হইয়া তালিতালের ধারে এক বেঞ্চির উপর গিয়া বসিলেন। সকালে একটু রোজ উঠিয়াছে। একটু পরেই ঘরে আসিয়া বসিলেন। কয়েকদিন যাবত মার সর্দি হইয়াছে। সামান্য একটু খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন। দলে দলে স্ত্রীলোক পুরুষ আসিতেছে। আমরা সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে বসিলাম, মেয়েরা খুব আনন্দ পাইল। একটি মেয়ে আসিল, তাহার নাম মোহিনী; সকলে মুন্নি বলিয়া ডাকে—এই দেশেরই মেয়ে, বিধবা, পিতৃমাতৃ হীনা, কেহই নাই। দেবী দত্তই এই মেয়েটিকে দেখাশুনা করেন, আর মেয়েটির খুল্লতাভ ভগ্নী আছে, তাহার কাছেই থাকে। মার আদেশ মত গতবার হইতেই মৌন, ও পূজা পাঠ করে। মেয়েটির

ভিতরে খুব আনন্দ আছে, সর্বদাই হাসিতেছে—হাসিলে যেন সমস্ত শরীর দিয়াই হাসিতেছে মনে হয়। সে খেলায় খুব আনন্দ পাইল। আমিই খেলা শিখাইয়াছি, তাই আমাকে “গুরু, গুরু” বলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু খেলায় আমিই হারিতেছি, সেই পুনঃ পুনঃ জিতিয়া বাইতেছে। এই নিয়া খুব হাসাহাসি হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, “শিষ্যা এমন শক্তিশালিনী যে গুরুর সব বিজ্ঞা হরণ করিয়া নিয়াছে।” পুরুষের দল আসিতেই মেয়েদের খেলা বন্ধ হইয়া গেল। মা পুরুষদের খেলিতে বলিলেন। আমেরিকার সাহেবটি বেরিলী হইতে আলমোড়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আজ আবার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাকেও এই খেলায় যোগ দিতে হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। শীতের ও খুব জোর হইল। মার সঙ্গে সকলে একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিতেই দলে দলে এখানকার লোকেরা মার কাছে কীর্তন করিতে আসিল। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে বিদায় হইল।

২২শে চৈত্র, সোমবার।

আজ একটু বেলায় মা উঠিয়াছেন। একটু দুধ খাইয়া হাঁটিতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিলে ভোগ হইল। মা একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। একদিন কথায় কথায় একটি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মা দীক্ষা দেন না কেন?”,

মার কাছে এই কথা উঠাইতে মা বলিলেন, “দেখ, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ও একটা বাঁধন সত্য, কিন্তু এই শরীরের সে “আত্মায় আত্মায় তো সব এভাবে হয় না। আত্মায় বাঁধন আছেই। দীক্ষা আত্মায়তো সকলের সহিত বাঁধন দিয়া নূতন বাঁধন কি আছেই—আবার নূতন করিয়া কি করিব?”

বাঁধন করিব?” আজ ভোগের পর বলিতেছেন, “আজ দেখিতেছিলাম একজনের দেহান্ত হইয়া গিয়াছে—” বলিয়া একজনের নাম বলিলেন। আবার বলিলেন, “কত সময় কতজনকে দিয়া কত কি দেখি, কত দিকে কি হইয়া যায়।” আমি বলিলাম, “আমার যেমন একজনকে দিয়া একটা স্বপ্ন দেখিলে, আর একজনের হইয়া যায়; তোমারও তাই হয় নাকি? তুমি যে একজনের কথা বল, আর একজনের হয় দেখি।” মা হাসিয়া বলিলেন, “যাহা দেখি ঠিকই দেখি, বলিবার সময় অনেক সময় অণু রকম করিয়া বলা হয়; তাই ঠিক ধরিতে পার না।” মা ভীড়ের মধ্যে ও কখনও শুইয়া পড়েন; হয়তো বলিয়া রাখেন, আমাকে ১ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা পর উঠাইয়া দিও,—এই বলিয়া কাপড় মুড়ি দেন। ঠিক এক ঘণ্টা পর মাই হঠাৎ উঠিয়া গেলেন, কি পার্শ্বস্থ লোকেরা মাকে উঠাইয়া দেয়। মা আজও উঠিয়া বসিলেন। সচ্চিদানন্দ খেলা কিছুক্ষণ চলিল। পরে মাকে নিয়া আমরা নৌকা ভ্রমণে বাহির হইলাম। তালিতালটি দীর্ঘে এক মাইল, প্রস্থে আধ মাইল, তাহার মধ্যে

প্রায় ঘণ্টা খানেক নৌকায় বেড়ান হইল। আজ বেশ রোজ উঠিয়াছে। নৌকা হইতে নামিয়া মা আবার রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। সন্ধ্যার পূর্বের ধর্মশালায় ফিরিলেন। আমেরিকান সাহেবটি সঙ্গে সঙ্গে আছেন, ইনি আগামীকল্য দেয়াতুন যাইবেন। আরও অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছে। বাঙ্গালী মাত্র একটি ছেলে আসিয়াছে। ওখানে বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়। ছেলেটি মার এই বাঙ্গালী দল পাইয়া ভারী খুসী। মা ২।১ জনকে বলিতেছেন, “তোমরাও ত চাকুরী কর, প্রতিদিন নিজের নিজের ডিউটি পূরণ কর, সময় হইলে পেন্সন পাইবে। সেই রকম ঐদিকের কাজও নিত্য নিয়মিত ভাবে করিয়া গেলে পেন্সন মিলে, সেই পেন্সন আর শেষ হয় না। এই পেন্সনতো যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে মিলিবে” ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণ কথায় সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেন। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া সকলেই প্রায় মাকে দর্শন করিয়া যায়। আবার কর্পূরাদি দ্বারা আরতি করে, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর গান করে। তাহাদের কোন কথাবার্তা নাই—আরতি করিয়া ফুল ছড়াইয়া, কিছু মিষ্টি ছড়াইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় নেয়। পাহাড়ীরা কীর্তন করিল। শীত বেশী বলিয়া ৯টায়ই তাহারা সকলে বিদায় নিল। দেবী দত্ত আমাদের বাহা দরকার সব শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০টায় বিদায় হইল।

৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজও একটু বেলায় মা উঠিয়াছেন। উঠিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমেরিকানটি আজ দেৱাতুলন যাইতেছে, মাকে সে একটি ঘড়ি দিয়া গেল। জ্যোতিষদাদা মার গায়ের একটি জামা তাহাকে দিলেন, তিনি ও মহা খুসী হইয়া তাহা নিলেন। তিনি আমেরিকা যাইতেছেন, বলিয়া গেলেন; এক বৎসর পর কারবারের সব গোলমাল মিটাইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিবেন। ঘড়িটি মাকে দেওয়ার পর মা বলিলেন, “ঘড়িটি যেমন এইভাবে টিক্‌টিক্‌

আমেরিকান সাহেবকে তাহার দেশযাত্রা কালীন উপদেশ—“তোমাকে এক অখণ্ডের চিন্তায় একই ভাবে লাগিয়া থাকিতে দেখিতে চাই।”

করিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছে, আমি তোমাকেও সেইরূপ সেই এক অখণ্ডের চিন্তায় একই ভাবে লাগিয়া থাকিতে দেখিতে চাই। বাহিরের গণ্ডগোলে যেন সেই চিন্তা ভাঙ্গিয়া না যায়।” মার এই কথায় সাহেব মহা

খুসী হইয়া হাতজোড় করিয়া মার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। ভোগের পর মা একটু বিশ্রাম করিলেন। পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ আসিয়া ঘরখানি পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মা উঠিয়া বসিলেন। কিছু সময় সচ্চিদানন্দ খেলা চলিল। পরে মাকে সকলে বিশেষ অনুরোধ করিয়া সিনেমা দেখাইতে নিয়া গেলেন। সেখান হইতে মাকে পূর্ববৈ নিমন্ত্রণ করিয়াছিল

এবং নিতে আসিয়াছে। মার কোনটাতেই আগ্রহ, নিগ্রহ নাই—মার ত' আমার একই ভাব। মা বলিলেন, 'আজ পালা হইতেছে "প্রভুকে প্যারী" (টকি)।' প্রায় রাত্রি ৮টার আমরা ফিরিলাম। ধর্মশালার নিকটেই সিনেমা হইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ১০টার সকলে শুইয়া পড়িলেন। এখানে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট মার সঙ্গে আজ ২৩ দিন বাবত দেখা করিতে আসিতেছেন সকলেই মাকে পাইয়া মহা আনন্দিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

—: * :—

১লা বৈশাখ, ১৩৪৪, বুধবার।

মা একটু সকালে উঠিয়াই বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছু বেলায় ফিরিলেন। একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়ার পর মা তালিতালের দিকে কোঠাখানায় বসিয়া আছেন। উপস্থিত ২৪ জনের সহিত আলাপ করিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টা, বলিতেছেন, "এখন শুইব।" খাওয়ার পর

শুইবার জন্য অনুরোধ করিলে মা খাইতে ইচ্ছা নাই প্রকাশ করিতেছেন। শেষে আমাদের অনুরোধে বসিয়া রহিলেন। খাওয়ার পর শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ৪টায় উঠিলেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। প্রায় ৫টায় মাকে নিয়া ধর্মশালায় ফিরিলেন।

রৌদ্র নিয়ম মত উঠিতেছে বলিয়া আজ ২৩দিন যাবত শীতও কমিয়া গিয়াছে। একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সপরিবারে আসিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বেরিলীতে মার দেখা হইয়াছিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রী মার জন্য কাঁচা কলা ও মোচা নিয়া আসিয়াছেন। বলিতেছেন, “আমার এ সামান্য জিনিষটুকু মার ভোগে দিবেন। শ্রীদামের সামান্য তণ্ডুল”—এই বলিয়া হাতজোড় করিয়া কতই না বিনয়ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। বলিলাম, “প্রেমের জিনিষ কখনও সামান্য হয় না। আজও রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা শয্যাগ্রহণ করিলাম। মা সারারাতই একবার বসেন, একবার শুইতেছেন। বলিতেছেন, “শুইবার ভাবই নাই”।

২রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠিয়া মা একটু হাঁটিতে বাহির হইয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদা সঙ্গে গিয়াছেন। প্রায় ৮টায় ফিরিয়াই

বলিতেছেন, “আজ এখনই বাহা হয় আমাকে খাওয়াইয়া দেও”। তাই হইল। তাড়াতাড়ি একটা শাক ও চাটুনী করিয়া দিলাম—রুটি করিয়া দিলাম। মা তাহাই একটু খাইলেন। বেলা প্রায় ১১টার মা শুইয়া পড়িলেন। মুন্নি ও আরও অনেক স্ত্রীলোক, পুরুষ দুপুরে আসিয়াছেন। মা কিছু পরেই উঠিয়া বসিলেন। কৃষ্ণপাশ্ব (তহশিলদার) প্রভৃতি সকলে সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে বসিয়া গেল। এতদেশীয় আরও ২৩টি ভদ্রলোক এবং জ্যোতিষদাদা খেলিতে বসিয়াছেন। কৃষ্ণপাশ্ব খেলার হারিয়া গিয়া জপ করিতে বসিয়া গেল। জপ আর শেষ হয় না। একমনে সে বহুক্ষণ জপ করিল। জয়ীদল কীর্তন করিতেছে। খেলায় বেশ একদিকে নাম কীর্তন ও একদিকে চোখ বুজিয়া কালি নাম জপ করিতে বসিয়া যায়, দেখিতে বেশ লাগে। বৈকালে ডাক আসিল। হাতে চিঠি নিয়াছি, কয়েকখানা খামের চিঠি। মা নৈনিতালে থাকিয়া কৃষ্ণনগরের ভক্তদের নিবেদন অনুভব। বলিতেছেন, “কৃষ্ণনগরে থাকিয়া বে ভোলানাথ দীক্ষা দিল, আজ ২৩দিন যাবত তাহার স্ত্রীর কথাই আমার খেয়ালে আসিতেছে”। খাম খুলিয়া দেখি তাহারই চিঠি। মোহিনী মোহন বন্দোপাধ্যায়—তিনি সম্প্রতি নদীয়া বদলি হইয়া গিয়াছেন। লিখিয়াছেন, “আমার স্ত্রী ও আমি তোমাকে 'দেখিবার জন্ম' ব্যস্ত হইয়া আছি। কবে দর্শন

দিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি”। মা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরা বুঝিলাম, বাস্তবিকই মোহিনীবাবুর স্ত্রী মাকে হয়তো খুবই মনে করিতেছেন, তাই মার প্রাণেও সাড়া দিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্বের মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। এখানে মহারতনের ছেলে ও বিহারীলালের ছেলে পড়ে, আজ তাহারা মার দর্শনে আসিয়াছে। তাহারা কিছুকণ সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মা ধর্মশালায় ফিরিয়াছেন। কৃষ্ণপাশ্চ তাঁহার পরিচিত এক ভদ্রলোককে নিয়া আসিল। শুনিলাম তিনি পুলিশ বিভাগের একাউন্টেন্ট। কৃষ্ণপাশ্চ একটি সুন্দর সত্য ঘটনা মাকে বলিলেন। ঘটনাটি এই— এই সঙ্গীয় ভদ্রলোকের একটি ছেলে গতকল্য পিতার নিকট আবদার করিতেছিল, যে তাহাকে ব্যাড্মিন্টন খেলার জিনিষ কিনিয়া দিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গেল ৩।০ টাকার জিনিষ কিনিতে হইবে। ভদ্রলোকটি বলিলেন, এত টাকা হাতে নাই, কিনিয়া দিতে পারিবে না। সেই ছেলেটি তখন তাহাদের ঘরে যে শিব স্থাপিত আছেন, সেই শিবজীর কাছে

পূর্বেদিন একটি বালকের
শিবজীর নিকট প্রার্থনায়
অদ্ভুতভাবে প্রার্থনায়
জিনিষ প্রাপ্তি।

গিয়া হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিল,
“হে শিবজী, তুমি আমাকে খেলার
এই জিনিষ দাও। আমি ভালমত
পড়াশুনা করিব, দুফটামী করিব না।”
কাল রাত্রিতে এই ঘটনা হইয়াছে।

আজই প্রাতে এই ভদ্রলোকের উদ্ধতন কর্মচারী এক সাহেবের এক চিঠি পাইয়াছেন। সেই চিঠি তিনি মাকে দেখাইবার জন্য নিয়া আসিয়াছেন। সাহেবটি লিখিয়াছেন, “আমার কাছে তুমি ৬০০ টাকা পাইতে, আজ আমি এই সঙ্গে ১০০ টাকার একটি নোট পাঠাইতেছি, তোমার ৬০০ টাকা নিয়া বাকী ৩০০ টাকা দিয়া তুমি তোমার ছেলেকে কিছু খেলার জিনিষ কিনিয়া দিও।” এই পত্র পাইয়া ভদ্রলোকটি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। মার কাছে এই ঘটনাটি বলিবার জন্য আসিয়াছেন। মা বলিলেন, “এখনই তুমি তোমার ছেলের জন্য খেলার জিনিষ কিনিয়া নিয়া যাও।” ভদ্রলোকটি মাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “মা, আজ ২৪ বৎসরের মধ্যে কখনও এই সাহেব আমাকে একটি পয়সাও দেন নাই।” মা বলিলেন, “আজও তিনি দেন নাই, যিনি দিবার তিনি দিয়াছেন।” সেই ভদ্রলোকটি পুনঃ পুনঃ মার চরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আজ-কালকার দিনেও এইরূপ প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। শুনলাম—এই শিবটি তাহারা একটা শব্দ শুনিয়া ছাতে উঠিয়া গিয়া পাইয়াছিলেন। পাহাড়ীদের সরল বিশ্বাস দেখিবার জিনিষ। এই যে আমরা নয়নাদেবীর মন্দিরের পাশে আছি, (একটি রাজাল এখানে একটি কালীমূর্তিও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন) প্রায় সারারাত্রিই এখানে ঘণ্টাধ্বনি কি গান চলিতেছে। ভোরবেলা হইতেই দেখা য়ায়—কেহ কেহ তাতে স্নান করিয়া

মন্দিরের চারিদিকে হাতজোড় করিয়া স্তব পাঠ করিতেছে।
 আবার অল্প বয়স্ক ছেলের দল কোটপ্যাণ্ট পরা—ভোর হইতে
 সারাদিনই মন্দিরে যাতায়াত আছে—বাহির হইতে হাতজোড়
 করিয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে, ঘণ্টা বাজাইতেছে। বৈকালে
 মাকে একটু দুধ ফল খাওয়াইয়া দিয়াছিলাম। রাত্রিতে আর
 কিছুই খাইলেন না। তালের দিকে লম্বা ঘরখানিতে
 আপনমনে হাঁটিতেছেন। শুইবার সময় হইলে বলিতেছেন,
 “তোমরা এই ঘরের দরজাটি খুলিয়া রাখিও। সবদিন
 বিছানায় পড়িয়া থাকিবার ভাব থাকে না। তখন আমি
 একা একা উঠিয়া এই ঘরে আসিয়া হাঁটিব। আর যদি পড়িয়া
 থাকি পড়িয়া থাকিব।” তাহাই হইল—দরজা খুলিয়া রাখা
 হইল।

৩রা বৈশাখ, শুক্রবার।

মা একটু সকালে উঠিয়াই জ্যোতিষদাদার সহিত বেড়াইতে
 বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আজও তাড়াতাড়ি
 রুটি খাইতে বসিয়া গেলেন। প্রায় ১১টার আজ আমাদের
 সকলেরই খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল। মা খাওয়ার পর একটু
 হাঁটিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। লোকজন তখন বিশেষ
 কেহই ছিল না। খানিক পরেই মা উঠিলেন। আজও
 প্রতিদিনের মত উপস্থিত সকলের সহিত কিছু সময় কথাবার্তা
 বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। নানা দেশীয়



শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ।

স্ত্রীলোকেরা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পেশোয়ার, মাদোয়ারী, নৈনিতাল, মথুরার সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই আছেন। রাত্রি ৯।১০টার মধ্যেই সকলে বিদায় হইলেন।

৪ঠা বৈশাখ, শনিবার।

আজও সকালে জ্যোতিষদাদার সহিত মা একটু বেড়াইয়া আসিলেন। পরে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করিয়া আমরা ৪ মাইল দূরে “ভূমিয়া ধারা” চলিলাম। সেখানে এক ভদ্রলোকের এক বাগানবাড়ী আছে। মাকে গতবার নিয়া গিয়াছিল, এবারও নিয়া গেল। আমরা টাঙ্গ করিয়া পার্বত্য প্রদেশের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। সেখানে গিয়া পাহাড়ের গায় গাছের ছায়ায় বসা হইল। একটা কাপড় বিছাইয়া সকলে তাহার মধ্যে বসিলাম। মা কিছু সময় শুইলেন। মালিক প্রথমে একরকম পাহাড়ী ফল ও পেঁপে কিছু পাঠাইয়া দিলেন। পাতায় পাতায় করিয়া খাওয়া হইল। তারপর কিছু লেবু মাথিয়া লেবুর খোসায় করিয়াই চাকর সকলকে দিয়া গেল। তারপর আলু পুড়িয়া দিল, পাশে ধনিয়া পাতা, লক্ষা ও লবণ একত্র মিশাইয়া গুড়া করিয়া দিয়াছে। গাছের পাতা ছিঁড়িয়া, কিছু সঙ্গে দিয়া দিয়াছে— তাহার মধ্যে খাইতে হইবে। তারপর গরম দুধ আনিয়া দিল। পাহাড়ের গায় বসিয়া বসিয়া বেশ পাহাড়ীদের আতিথেয়তা গ্রহণ করা হইল। মালিক মাকে বলিলেন, “মা,

আপনি আদেশ করিলে এখানে আপনার একটা আসন (আশ্রম) করিয়া দেই। অতি সুন্দর স্থান। আপনি যখন ইচ্ছা হয় আসিয়া থাকিবেন।” স্থানটি নির্জন সন্দেহ নাই। চারিদিকের দৃশ্যও সুন্দর। একটা স্থানে একটা ছেঁড়া নিশান টাঙ্গান দেখিয়া মা সেখানে গেলেন। কি এক দেবতা স্থাপিত আছে। অর্থাৎ দুইখানা পাথর সিন্দুর মাখা, দুধ দিয়া স্নান করাইয়াছে, তাহারও চিহ্ন আছে। চারিদিকে পাথরের বেড়া দিয়া ঘেরাও করা। একটি ছোট ঘন্টা ও টাঙ্গান আছে। মা সেই ঘন্টাটি নিয়া কিছুক্ষণ খেলিলেন। সেই স্থানে কিছু সময় বসিলেন। ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, ভোলানাথ নৈনিতাল ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার মা উঠিলেন। মা হঠাৎ কি এক শব্দ করায় আমি বলিলাম, “মা, এখানেও কাহারও সহিত (সুক্ষ্মশরীরী) তোমার দেখা হইল নাকি?” মাও কাপড় মুড়ি দিয়া শুইতে শুইতে বলিলেন, নিশ্চয়ই, গতবারও দেখা হইয়াছিল, এবারও নিয়া আসিয়াছে। শুয়ে শুয়ে ভালভাবে দেখবো।” এই বলিয়া ভালভাবে শুইলেন। রাস্তায়

ভূমিরধারা নামক স্থানে
মার সুক্ষ্মশরীরী সঙ্গে
সাক্ষাৎ।

ফিরিবার সময় টাঙ্গাতে আমি জিজ্ঞাসা
করিলাম, “মা, এখানে সুক্ষ্মশরীরী
যাঁহারা আছেন, তাহাদের কোন রকম
বাসনা পূর্ণ করিতেই কি তুমি

গিয়াছিলে? তাঁহারা কি তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন?”
মা বলিলেন, “ধর না তাই।” আমি বলিলাম, “তাঁহাদের

ইচ্ছা হইলে তাঁহারাতো সর্বত্রই তোমার সহিত দেখাশুনা করিতে পারেন।” মা বলিলেন, “না, কেহ কেহ এক জায়গায়ই থাকেন। স্থানের আকর্ষণে সেই স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে বাইতে পারেন না।” সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা নৈনিতাল ধর্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে একটি ইংরেজ মহিলা মাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। গতকল্য তাহার টেলিগ্রাম অসিয়াছে, তিনি আজ আসিয়া পৌঁছিবেন। একটা হোটেলে উঠিবেন। মা ফিরে আসবার একটু পরেই ইংরেজ মহিলাটি মাকে দর্শন করিতে আসিলেন, হাঁটু গাড়িয়া হাতজোড় করিয়া মার নিকট বসিলেন। পরে একধারে গিয়া বসিলেন। জানিলাম তিন বৎসর যাবৎ তিনি এদিকে কাজ করিতেছেন। তার বিশ্বাস ভগবানের চিন্তা করিতে পারিলেই আর কোনও কাজের আবশ্যক হয় না। বেশ শান্ত মূর্তি মাও পরে বলিয়াছেন বেশ কাজ করে একটু ফলও পাইতেছে। অখন্দানন্দজী ও জ্যোতিষদাদা ইংরেজ মহিলাটিকে মার কথা বুঝাইয়া দিতেছেন; এঁর বয়স ৪২ বৎসর। মার বয়স ৪১ বৎসর শুনিয়া বলিলেন, “আমার মা আমা হইতে এক বৎসরের ছোট।” ১০টার সকলেই বিদায় নিলেন।

মা সেবাসমিতির ঘরটাতে বসিয়াছেন, কথা হইতেছে সাধকদের নানাস্তরের। আমিও জ্যোতিষদাদা আছি। মা বলিতেছেন, “অবস্থা কত রকমের আছে তাহা সকলে

ধরিতে না পারিয়া অনেক ভুল করে। এই যে কৌর্ভনাদিতে ভাব হয় এও কত রকমের। কখনও হয়, নাগের ধ্বনিতে শরীরে একটা তরঙ্গ ওঠে পরে তাহাতে অবসাদ বা ক্লান্তি আসে, তাহাতে সাধক জড়বৎ খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকে। দেখ কতগুলি অবস্থা আছে—প্রথম হয় রূপের নেশায় ভরপুর—যেমন কৃষ্ণরূপে আত্মহার্য, কৃষ্ণের পূজায়, কৃষ্ণের নামে ঢল ঢল অবস্থা। আর একটু উপরের অবস্থা যেমন কাল মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণের মূর্তি জাগিয়া উঠিল অথবা বাহ্য

ভাবের নানা স্তরের
অবস্থার বিবরণ।

দেখিতেছে মনে করিতেছে আমার
কৃষ্ণেরই রূপ। তখন আমার কৃষ্ণ
এই ভাবটি আছে। চিত্তশুদ্ধি হইলেই

একলক্ষ্য হইয়া একের রূপে মজিয়া যায়। একটা অবস্থা—রূপের নেশায় ঢল ঢল অবস্থা, সেই ভাবটা কমিলেই কাল আসে। আর একটা অবস্থা—বাহ্য দেখে তাহাতেই প্রিয়তমের ছায়া দেখিয়া আনন্দ পায়, তখনও মূর্তির উপর লক্ষ্য আছে। আরও অবস্থা—জড়বৎ শরীর তখন পড়িয়াই বেশী থাকে। একটু উঠিলেই জড়বৎ হইয়া যায়। আবার এইও হয়—ব্রহ্মভাব; তখনই সাধক সাধ্য এক হইয়া যায়, তখন আর বিশেষ মূর্তির প্রতি লক্ষ্য নাই। এক ছাড়া কিছুই নাই, এইভাবে জাগিয়া ওঠে। আরেকটা হলো এই সবিকল্প সমাধি তখন একসত্তা বোধ, আর কিছুই নাই। আরও অবস্থা—নির্বিকল্প সমাধি তখন আর কিছুই নাই। অথবা কি আছে কি নাই, নাই বল্লেও বলা হয় না,

আছে বল্লেও বলা হয় না। কতরকম, বলা 'আর কতটুকু হয়—এক একটা দিকের কথা বলা হচ্ছে মাত্র।" তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইসব অবস্থা একটার পর একটা আসিবেই ত?" বলিলেন, যদি কোন একটা অবস্থা ধরিয়া বসিয়া থাকা না যায় তবে একটার পর একটা আসিবেই, কিন্তু যদি একটা অবস্থা ধরিয়া থাকা হয় তবে ঐখানেই বন্ধ হইয়া থাকা হয়।" আবার বলিতেছেন,—“আবার একটা স্তরে দাঁড়াইলেই যেটা ছাড়িয়া গেল, তাহারও ছায়া থাকিবে; আবার যে স্তরটা পরে আসিতেছে, তাহারও আভাষ পূর্বস্তরে থাকিতেই পাওয়া যায়। কাজেই একটা স্তরেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটা অবস্থাই খেলা করে, লক্ষণ দেখিয়াই বোঝা যায়—কোন স্তরে আছে।" তারপর নিজের কথায় বলিতেছেন, “এ শরীরটার কথা ছাড়িয়া দাও। এ শরীরটা ত কত খেলাই খেলছে, তোমাদের দৃষ্টিতে মহাভাবের প্রকাশ দেখেও তার পূর্বের কোন অবস্থাও তো দেখিয়াছ—এই সব যে আমাদের দৃষ্টি।” আবার বলিতেছেন, “নির্বিকল্প সমাধির পর কাহারও শরীর ছাড়িয়া যাইতে পারে।”

এই বৈশাখ, রবিবার।

প্রাতে মা বাহির হইয়াছেন। আজ খুব রুষ্টি আসিল। বেরিলী হইতে ৭জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মার কাছে কীৰ্ত্তন

করিতে আসিয়াছেন। বেলা ১২টা হইতে কীর্তন আরম্ভ করিল, রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কীর্তন চলিল। এখানকার লোকেরাও সব কীর্তনে যোগ দিল। মেম সাহেবটি বেলা ১০টার আসিয়া ঘণ্টা দুই মার কাছে বসিলেন। আবার ৫টার কীর্তন শুনিতে আসিয়াছেন। রাত্রি অনেকক্ষণ পর্যন্ত মার কাছে বসিয়া কথাবার্তা বলিলেন। সবদিকেই মার দৃষ্টি।

ছেলেরা আসিয়াছে কীর্তন করিতে বেলা ১২টার। মা বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন, “কিছু ফুল আনাও”। একখানা চৌকী সেবা সমিতির ঘরে ছিল, বলিতেছেন, “সেই চৌকী-খানায় কয়েকখানা ছবি, ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখ, ধূপ-কাঠি জ্বলাইয়া দেও, মালা গাঁথিয়া সকলকে দেও, চন্দন সকলের কপালে দেও।” এইভাবে কি সব করিতে হইবে, সব বলিয়া দিতেছেন। আরও বলিতেছেন, “এরা এতদূর হইতে কীর্তন করিতে আসিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কাজে যোগ না দিলে তাহারা আনন্দ পাইবে কেন? আমি না বলিলে তোমাদের কিছুই খেয়াল হয় না দেখিতেছি।” আমরাও দেখিলাম, কথা যথার্থ বটে। কোন কাজই আমরা ঠিকভাবে করিতে পারি না। মানবের সবই অসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই। রাত্রি ৮টার কীর্তন শেষ হইলেও ইংরেজ মহিলাটি মার সহিত বসিয়া নানাকথা বলিতেছেন। রাত্রি ১০টার সকলে বিদায় হইলেন।

৬ই বৈশাখ, সোমবার ।

প্রাতে মা হঠাৎ দলবল নিয়া নৌকায় কৃষ্ণপান্ত্রের বাড়ীতে চলিলেন । কৃষ্ণবাবু দলবল সহ মাকে বাসায় নিয়া কীর্তন করিতে চাহিয়া ছিলেন । কিন্তু কাল তাহা হয় নাই, আজ খবর না দিয়াই মা চলিলেন । হঠাৎ মাকে দলবল সহ পাইয়া তিনি মহা আনন্দিত হইলেন । আজ রামনবমী । কৃষ্ণবাবুর আঙ্গিনায় খুব কীর্তন হইল । বেরিলীর দলবল সহ সেখানেই মার ভোগ হইল । ইংরেজ মহিলাটিও তথায় মার কাছে বসিয়া কীর্তন শুনিলেন । ইনি প্রত্যহ দুইবেলাই মার কাছে আসেন । অনেকক্ষণ বসিয়া থাকেন । কখনও চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকেন । কখনও নানা কথাবার্তা বলেন । ইনি অরবিন্দ ঘোষের নিকটও পণ্ডিচারীতে মার কথা শুনিয়াছেন বলিলেন ।

অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় নাকি বলিয়াছেন, “মা আনন্দময়ী খুব উচ্চস্তরে অবস্থান করিতেছেন ।” মাকে ইংরেজ মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমার এখন কি কি করিতে হইবে ? কি ভাবে থাকিতে হইবে বলিয়া দিন ।” মা বলিয়াছেন, “আচ্ছা, পরে সে সব কথা হইবে ।” প্রায় ২টার আমরা পান্ত্রের বাসা হইতে ধর্মশালায় নৌকাতেই ফিরিলাম । ঘাটে নৌকা লাগাইতেই দেখি তালের পারেই

নয়নাদেবীর মন্দিরের সম্মুখে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে।
 বহুলোক ও পণ্ডিতরা একত্র হইয়াছেন। আজ রামনবমী,
 তাই এই আয়োজন। আজ কয়দিন যাবতই অল্প অল্প
 যজ্ঞাদি হইতেছিল। মা পৌঁছিতেই পণ্ডিতরা মাকে বলিলেন,
 “আমরা এইস্থানে যজ্ঞ করিব, আপনি একটু এইখানেই
 বসুন।” মা ও ভোলানাথ তথায় বসিলেন। মার জন্মই
 নাকি যজ্ঞ আরম্ভ হয় নাই, পণ্ডিতরা অপেক্ষা করিতেছিল।
 তাল-যজ্ঞ আরম্ভ হইল। খানিক পরে মা উঠিয়া আসিলেন।
 সঙ্গে সঙ্গে বালকও বালিকার দল আসিয়া মার কাছে
 জমা হইল। মা হাততালি দিয়া
 রামনবমী দিবসে নয়না- তাহাদের কীর্তন করিতে বলিলেন।
 দেবীর মন্দিরের সম্মুখে তাহাদের কীর্তন আরম্ভ
 তালের পারে মাকে সকলে মিলিয়া মহানন্দে কীর্তন আরম্ভ
 সম্বোধন করিয়া করিল। মা আমাকে বলিলেন, “ঘরে
 পণ্ডিতদের যজ্ঞ। বাহা আছে, ইহাদের দেও।” ফল
 কাটিয়া দেওয়া হইল। খানিকক্ষণ বালক ও বালিকাদের
 সঙ্গে খেলা করিয়া মা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা
 প্রায় ষ্টোয় মা উঠিয়া বসিয়াছেন। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা
 অনেকেই আসিয়া মাকে ফুল ফল চড়াইতেছে, আরতি
 করিতেছে। প্রায় প্রত্যহই তাহাদের এই এক কাজ হইয়াছে।
 যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এতদেশীয় স্ত্রীলোকেরা
 এক থালায় করিয়া ফুল, চন্দন, কর্পূর ও কিছু মিষ্টি লইয়া
 দেবতার মন্দিরে মন্দিরে যাইয়া তাহা চড়াইয়া আসে। অর্থাৎ

এইসব দিয়া পূজাদি করে। পূজা অর্থাৎ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে তাহা দেবতার মাথায়, গায় ছিটাইয়া দেয়। কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করে। বাঙ্গালীদের মত পূজার এত নিয়ম নাই। নয়নাদেবীর মন্দিরে যে সব পাহাড়ী স্ত্রীলোক পূজাদি করিতে আসে, তাহারা মাকেও ঐভাবে পূজাদি করিয়া যায়। মা উঠিয়া বসিতেই মেমসাহেবটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাণ্ডা বলিয়া মার গায়ের একখানা আলোয়ান তাহাকে দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন, “গায়ের আলোয়ান দিয়া তোমার কথা মনে করাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে না।” এই কথায় মা ও মেমসাহেব দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মেমসাহেবটি একান্তে কথা বলিবার জন্ত মাকে নিয়া গেলেন, জ্যোতিষদাদা সঙ্গে গেলেন। সন্ধ্যার পরে তাহারা ফিরিলেন। শুনিলাম মাকে তিনি নিজের কি ভাবে কি করা দরকার তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ধর্মশালায় ফিরিয়া মেমসাহেব বিদায় নিলেন। বেরিলীর দলের কয়েকজন আজ বেরিলীতে ফিরিয়া গেলেন।

এই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

প্রায় ৬টায় মা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। একটু বেলা হইলে ফিরিলেন। রোদ্রে বসিয়াই মার মুখ হাত ধোয়াইয়া দিলাম। কয়েকজন পাহাড়ী কিছু ফল মিষ্ট

নিয়া মার কাছে আসিয়াছে। তাহা সকলকে দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ৯০টার সময় গতকল্যের বন্দোবস্ত অনুযায়ী মাকে দেবী দত্ত তাহার বাসায় নিতে আসিলেন। ইনি চিরকুমার, ইহার এক প্রেস আছে (কিং প্রেস)। আমরা সকলে মার সঙ্গে তাহার বাসায় গেলাম। ইনি একটা ঘর আশ্রমের মত গুরুর আদেশানুযায়ী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রোজ হোমাদি করেন। একটি নেপালী সাধুও সেই ঘরে আছেন। মা ও আমরা সেই ঘরে গিয়া বসিলাম। মেমসাহেবটিও তথায় মার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ তথায় বসা হইল। গতকল্য হইতেই মার হাসির ভাবটা জাগিয়াছে। কোন উপলক্ষ্য হইলেই হাসিটা আরম্ভ হইতেছে। সেই হাসিতে সর্ব্বাঙ্গ হাসিতেছে। দেবী দত্তের বাড়ী গিয়াও সেই হাসি আরম্ভ হইল। মেমসাহেব সেই হাসি দেখিয়া মহাখুসী। বলিতেছেন, “একদিন আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমার পা হইতে একটা হাসির ফোয়ারা উঠিয়া যেন মাথা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সেই হাসিতে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গেল।” মা শুনিয়া বলিলেন, “এইত চাই। তাইতো এই (নিজের শরীর দেখাইয়া) হাসির সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে।” কিছু সময় থাকিয়াই মা ধর্ম্মশালায় আসিবার জন্ত উঠিলেন। মেমসাহেবটিও মার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালায় আসিলেন। মা রোদ্রে বাহির হইতেই

তিনি দৌড়াইয়া গিয়া মার মাথায় ছাতা ধরিলেন। মাকে রিক্সায় উঠাইয়া দিয়া তিনি আমাদের সহিত হাঁটিয়া ধর্মশালায় আসিলেন। অনেকক্ষণ মার কাছে চোখবুজিয়া বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ১২টায় তিনি হোটেল চলিয়া গেলেন।

বেলা ঠিক ৫টার আবার মেমসাহেব মাকে দর্শন করিতে কলিকাতা হইতে আগত আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে মার ভোগ এক ইংরেজ মহিলার হইয়া গিয়াছে। মা একটু বিশ্রাম তাহার পথের সহায়ক করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। আজ কয়েকজন সাধুর ফটো মেমসাহেব কয়েকখানা ছবি নিয়া আছে মা বলায় সেই ফটো মার কাছে দেখান। আসিয়াছেন। তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের রমণ সাধুর ছবিও আছে। ঈজিপ্টে

কবরের কাছে একটা আত্মার ছবি উঠিয়াছে। তাহা মেমসাহেব মাকে দেখাইতে নিয়া আসিয়াছেন। শুনলাম গতকল্য মা নাকি তাকে বলিয়াছিলেন, “তোমার এ পথের সহায়ক কয়েকজনের ফটো তোমার কাছে আছে।” সে স্বীকার করিয়াছিল, তাই আজ সে সেইসব মহাত্মাদের ফটো নিয়া আসিয়াছে। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, এই রকম ছবি দেখিয়াছিলেন কি না?” মাও স্বীকার করিলেন। বৈকালে মেমসাহেব মাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। পাহাড়ের উপর দিকে যাওয়া হইল। আজ মেমসাহেব মার দেওয়া আলোয়ানখানি বাঙ্গালী মেয়েদের মত গায় জড়াইয়া মার সঙ্গে বেড়াইতে

বাহির হইয়াছেন। কিন্তু সামলাইতে পারিতেছেন না।
পড়িয়া বাইতেছে। সন্ধ্যায় ধর্মশালায় ফিরিলাম। অনেকে
উপস্থিত হইয়াছেন। দিনদিনই দর্শনার্থী লোক বাড়িতেছে।

৮ই বৈশাখ, বুধবার।

আজ বিশেষ কোন ঘটনা নাই। মা হঠাৎ সকালে
বলিলেন, “ভোলানাথ ও তোমাদের সকলকেই বলিতেছি—
আমার স্বাভাবিক চলিত ভাবে তোমরা বাধা দিলে শরীরটা
কেমন সুন্দর একরকম হয়ে যায়। খাসের গতিই আরেক
রকম হয়।” আজ দুপুরে পাহাড়ী মেয়েরা আসিয়া মার
কাছে সুন্দর সুন্দর ভজন করিয়া নাচিতেছে। বেশ লাগিল।
দিন দিনই মেয়েরা আকৃষ্ট হইতেছে। আজ দুপুরে মা
একটু ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, “আমাকে এই ঘরে বন্ধ করিয়া
দেও, আমি একা থাকিব। যদি কেহ দেখা করিতে আসে,
বলিও সন্ধ্যার পর দেখা হইবে।” তাহাই করা হইল।
সন্ধ্যার পর মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। দলে দলে পাহাড়ী
স্ত্রীলোক পুরুষ আসিয়া মাকে ফুল দিল, আরতি করিল। প্রায়
১০টায় সব বিদায় হইল।

৯ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকালে মা বেড়াইয়া আসিয়া একটু দুধ খাইলেন।
১০টায় মেমসাহেব আসিয়া ১টায় ফিরিয়া গেলেন। তারপর
মার ভোগ হইল। আজও পাহাড়ী মেয়েরা আসিয়া মার

কাছে ভজন ও নৃত্য করিল। মাও তাল দিতে লাগিলেন, করতাল বাজাইতে লাগিলেন। তাহাদের গান পুনঃ পুনঃ শুনিতে চাহিয়া তাহাদের খুব আনন্দ দিলেন। বেলা ৫টার তাহারা চলিয়া গেল। আজ মেমসাহেব মাকে নিয়া প্রায় তিন মাইল দূরে পাহাড়ের একস্থানে বেড়াইতে যাইবেন; আমরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মা এবং অগ্গাণ্ড, অনেকে ডাঙিতে গেলেন। কেহ কেহ হাঁটিয়া চলিলাম। বেশ নির্জন স্থান। সন্ধ্যার পূর্বে আমরা ফিরিলাম। রাত্রিতে সামান্য একটু খাইয়া মা কতক্ষণ হাঁটিতে লাগিলেন। আগামী কল্য আমাদের আলমোড়া যাওয়া স্থির হইল।

চতুর্দশ অধ্যায় :

—: * :—

১০ই বৈশাখ, শুক্রবার।

সকালে মা একটু হাঁটিয়া আসিলেন। অনেকেই মার দর্শনের জন্ম আসিয়া বসিয়া আছেন। তারমধ্যে মধ্য প্রদেশের একজন ডেপুটি পোর্ট মাস্টার জেনারেল সস্ত্রীক আসিয়াছেন। গতকল্যই মার কাছে তাহারা রাত্রিতে প্রথম আসিয়াছেন। ইহারা বেরিলা নিবাসী। ছুটিতে নৈনিতাল আসিয়াছেন। কাল রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী মার সঙ্গে একান্তে বসিয়া অনেকক্ষণ কি আলাপ করিয়া গিয়াছেন। আজ প্রাতে রেশমের কাপড়-চাদর ও নানারকম ফল মার জন্ম নিয়া আসিয়াছেন। স্ত্রীলোকটি বলিতেছেন, “কি আশ্চর্য্য, কালই আপনাকে প্রথম দেখিয়াছি, সারারাত আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। আর রাত্রিতে কেবলই মনে হইয়াছে কখন সকাল হইবে, আপনার কাছে আসিব। আপনার কি এক আকর্ষণ শক্তি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” মা একটু হাসিয়া বলিলেন, “মেয়ের জন্ম মারতো অস্থির হইবারই কথা।” এই রকম এবং

নৈনিতাল হইতে আল-
মোড় গমন সঙ্গে ইংরেজ
মহিলার মার প্রতি
আবেগপূর্ণ প্রদ্বার
নিদর্শন।

আরও তাহাদের সাধন-ভজনের কথা
জিজ্ঞাসা করিল। ফল, মিষ্টি ইত্যাদি
প্রতিদিনের মত বিলাইয়া দেওয়া
হইল। বেলা প্রায় ১২টার আমরা
আলমোড়া রওনা হইলাম। ইংরেজ

মহিলাটিই মার সঙ্গে মিলিয়া আলমোড়া বাইবার প্রস্তাব
করেন। তিনিই নিজের খরচে একটা বাস ভাড়া করিয়া
মার সহিত সকলকে নিয়া চলিলেন। মার প্রতি তিনি খুবই
আকৃষ্ট হইয়াছেন। মোটরেও তিনি সামনের আসনে না
বসিয়া মার কাছে বসিলেন। তাহাতে কত আনন্দ প্রকাশ
করিতেছে। একটা ছোট এটাচি কেসের ভিতর মেমসাহেবর
খাবার, কাঁটা-চামচ প্লেট আছে, মাকে সব দেখাইলেন।
মা হাসিয়া বলিলেন, “আমি ইহা চুরি করিব।” জ্যোতিষদাদা
মেমসাহেবকে এই কথা বুঝাইয়া দিতেই, তিনি অমনি হাতজোড়
করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বাস্কেট মার কোলে দিয়া বলিলেন,
“মাকে চুরি করিতে দিব কেন, আমিই দিয়া দিতেছি।
মা যা চাহিবেন, আমি তাহাই দিতেছি। মা বাহা চাহিবেন,
আমি তাহাই দিব—মাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।”
মা অমনি বলিলেন, “আমি বাহা চাহিব তাহাই দিবে ত?
তোমরা বুঝাইয়া বল—মা সমস্ত মনটা চাহিতেছে।” বুঝাইয়া
দিতেই মেমসাহেব হাসিয়া হাতজোড় করিয়া মার দিকে
চাহিয়া বলিতেছেন, “নিশ্চয়, নিশ্চয়,”—এই বলিয়া ইসারায়

নিজের টুপী ধরিয়া মার পায়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। আমরা ১২টায় রওনা হইয়া পার্বত্যশোভা দেখিতে দেখিতে বেলা ৬টায় আলমোড়া পৌঁছিলাম। বেলা ৩টায় মেমসাহেব মোটরে বসিয়া বিক্ৰুট খাইবেন, হাতজোড় করিয়া মার কাছে অনুমতি চাহিলেন। মা কিছু খাইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা অস্বীকার করিলেন। বেলা প্রায় ৪টায় মাকে মেমসাহেব অতি শ্রদ্ধার সহিত একটা কমলা খুলিয়া একটু খাওয়াইয়া দিলেন, পরে নিজে খাইলেন।

সন্ধ্যার সময় আমরা নন্দাদেবীর মন্দিরে গেলাম। পূর্বেরই দেবীদত্ত লোক পাঠাইয়া এই মন্দিরে মার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আলমোড়ার সহরের দৃশ্য বড় সুন্দর। মোটর হইতে আসিতেই দেখিলাম, অর্দ্ধচন্দ্রের মত পাহাড়ের গায় উপরের দিকে সাজান সহর, নীচের অংশটা শুধু ক্ষেত। গমই বেশী হয়। পাহাড়ের মাথায় সহর আর ক্ষেত জমি এত থাকায় একেবারে খোলা দেখাইতেছিল। ফাঁক ফাঁক বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর। সহরের মধ্যে মোটর ঢুকিতেই একদল অল্প বয়স্কা মেয়ে রাস্তাদিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মাকে দেখিয়া হাত উঠাইয়া প্রণাম করিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারা ইতিপূর্বের মাকে দেখে নাই। আমরা মন্দিরে পৌঁছিতেই দেখি ঐ মেয়েরা তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাকে ঘিরিয়া বহুলোক তখনই জমা হইয়া গেল,

মেয়েরাও বসিল। মেমসাহেবটীও সঙ্গে আছেন। তিনিও মার কাছে বসিয়া আছেন। বাহিরে গালিচা বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মেমসাহেবের জন্ম ডাক-বাংলায় জায়গা করা হইয়াছে। ঐ মেয়েদের সহিত মা আলাপ আরম্ভ করিলেন। পরে আমাদের ডাকিয়া বলিলেন, (আমরা ব্যবস্থা করিতে ভিতরে ছিলাম) ঐ দেখ কৈলাশের নিকটবর্তী স্থানের বাসিন্দা। এখানে পড়াশুনা করিতে আসিয়াছে। আমিও কথাবার্তা বলিয়া দেখিলাম, বেশ সরল সোজা স্বভাব। কেহ কেহ ৩৪ বারও কৈলাশে গিয়াছে। আজ রাত্রিতেই

কৈলাশ যাওয়ার রাস্তায়
স্থিত গারবিয়ানের পাঠার্থী
মেয়েরা মাকে সম্ভাষণ
এবং কৈলাশে লইয়া
যাওয়া আবেদন।

নারায়ণ স্বামীর সহিত কয়েকটা মেয়ে
নিজেদের বাড়ী ফিরিতেছে, নারায়ণ
স্বামীর তথায় একটা আশ্রম আছে
(সারদা আশ্রম)। গারবিয়ান
মেয়েদের বাড়ী; কৈলাশ হইতে

৪।৫ দিনের রাস্তা। মেয়েরা বলিল, তাহারা তাহাদের পণ্ডিত
শ্রীনিবাসের কাছে মার একখানা ফটো দেখিয়াছিল, হঠাৎ
মোটরে মাকে দেখিয়া একটা মেয়ের প্রাণ আকুল হইয়া
উঠিল, কেমন মনে হইল এই সেই আনন্দময়ী মা। অমনি
অজ্ঞাতসারেই যেন তাহার হাত দুইটা উঠিয়া গেল, সে
মাকে প্রণাম করিল, তাহাকে দেখিয়া সকলেই সঙ্গে সঙ্গে
প্রণাম করিয়াছে। মাকে পাইয়া তাহাদের কত আনন্দ,

মাকে তাহারা কৈলাশ নিয়া বাইতে চাহিল। ভোলানাথের
বহুদিন হইতেই কৈলাশ যাওয়ার ইচ্ছা, তিনি আজ রাত্রিতেই
বাইতে প্রস্তুত; মেয়েরা যত্ন করিয়া নিয়া বাইবে। পরে
দেখা গেল যে জুনমাসের পূর্বের কৈলাশের রাস্তা খোলা
হয় না। তাই সম্প্রতি যাওয়া বন্ধ হইল। বাংলাদেশে
জন্মোৎসবে যাওয়ার কথা আছে। তথা হইতে ফিরিয়া বাহা
হয় হইবে স্থির হইল। পাহাড়ীরা তখনই কত ফুল ফল
নিয়া হাজির, কেহ কেহ বৈকালে কেহ কেহ দুপুরে মার
খবর পাইয়াছে, মাকে পাইয়া যেন তাহারা সাক্ষাৎ ভগবতী
দর্শন করিল এই ভাব। ফুলে ফুলে মাকে ঢাকিয়া দিল।
রাত্রি প্রায় ১০টার সকলে বিদায় নিল। মা বিশ্রাম
করিবার জন্য শুইয়া পড়িলেন।

১১ই বৈশাখ, শনিবার।

প্রাতে মা বিছানা ছাড়িবার পূর্বেই বহুলোক মাকে
ঘিরিয়া বসিয়াছেন। এখানকার বিশিষ্ট লোকেরাও আসিয়াছেন।
মা উঠিয়া বসিলে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। একজন বলিল,
“মা জড় সমাধি কি? সমাধি ত
জড় সমাধি জড়ের শব্দ
নয়; চিন্তার ক্রিয়া ভিতরে
থাকে।
চৈতন্যের খেলা। তাহা আবার জড়
হইবে কেন?” মা বলিলেন, “জড়
সমাধির পূর্বেও আরও অনেক অবস্থা
আছে। দেখ, সাধারণতঃ তোমরা এই যে বাইরের কথাবার্তা

বলিতেছ এর মধ্যে যদি কেহ ঐ দিকে একমন হইয়া তাহার চিন্তায় বসিতে পারে, তবে স্থিতি অনুযায়ী শরীরটা ত জড়বৎ হইবেই, মনটাও কোন সময় জড়বৎ হইয়া যায়। এটা ত এই মনের খেলা। এমন একটু ভাব আসার পরও যখন সে আবার তাহার পূর্ব ভাবের মধ্যে আসে, তখন তাহার মন ও শরীরের গতি একটু পরিবর্তিত বোধ হওয়া স্বভাব। আর জড় সমাধি যেখানে বলা হয়, সেইখানে পূর্ণ সমাহিত অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জড়বৎ একটা অবস্থায় স্থিতিলাভ করাও তাহার স্বাভাবিক গতি। উহাকে জড় সমাধি বলে। সমাধি রাজ্যের ইহাও একটা প্রকাশ। সবিকল্প সমাধি, ইহা যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, জড় সমাধির প্রকাশও তাহারই একটা স্বভাবের প্রকাশ। চৈতন্যের ক্রিয়া ভিতরে থাকে। কিন্তু তখনও পূর্ণ চৈতন্যের খেলাটা প্রকাশ হয় না বলিয়া এইরূপ প্রকাশ। পূর্ণ চৈতন্যের সাড়া পেলে জড় কথা আসে না। একমাত্র চৈতন্যেরই খেলা যে। এর মধ্যেও আরও অনেক কথা। ইহাও একদিকের একটুকু কথা যে।”

একজন প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা মা শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এসব কি সত্যই আছে, না কল্পনা মাত্র?” মা বলিলেন, “সব আছে।” উপস্থিত আর একজন বলিলেন, “তাহাদের হাত, পা আছে শুনি, ইহা কি সত্য? তাহাদের কি ঐ মূর্তি?”

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
কল্পনা নয় ; সবই আছে
মা বলিলেন, সব সত্য, যতক্ষণ দৃষ্টি,
ততক্ষণ সৃষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই
তিন মূর্ত্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। কল্পনা
যদি বল তবে তো তোমরাও কল্পনা, সবই কল্পনা। যেমন
অমুক জমিদারের অমুক গ্রাম বলা হয়, সেই রকম ব্রহ্মলোক,
শিবলোক ও বিষ্ণুলোক আছে। আবার হাসিয়া বলিতেছেন,
“সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব সময়ই হয়।”

আজই দুপুরবেলা জ্যোতিষদাদা একপাশে শুইয়া নাক
ডাকাইতেছেন অথচ সেইখানেই এতগুলি মেয়েলোক বসিয়া
ভজন গান করিতেছিল। মা হাসিয়া বলিলেন, “এই দেখ
এত নিকটে এত শব্দ কিন্তু জ্যোতিষ কিছুই শুনিতে
পাইতেছে না ; সাধারণ ঘুমেই যদি এই অবস্থা হইতে পারে,
সেই দিকে গিয়া যদি অবস্থার পরিবর্তন হয় তবে কত কি
হইতে পারে। জাগতিক কোন ব্যাপারই তাহার কাছে
পৌঁছায় না, এই দেখ তাহার একটু প্রমাণ।” এই সব
কথাবার্ত্তার পর সকলে বিদায় নিলেন।

দুপুরে মেয়েরা সব আসিয়া ঘর ভরিয়া গেল। আশ্চর্য্যের
বিষয় সকলের প্রাণেই একটা এই ভাব জাগিতেছে যে সাক্ষাৎ
ভগবতী। তাহার ফুল দিতে দিতে কালিকা, জগদম্বা বলিয়া
বলিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মার গায় পুষ্পসৃষ্টি করিতেছে !

এ দেশীয় মিঠাই বাতাস। ফল এক একবার জমিতেছে আবার বিলি হইয়া যাইতেছে। কৈলাশের নিকটবর্তী স্থানের মেয়েরা ও আসিয়াছে, তাহারা কেহ এখানে মিশনস্কুলে পড়ায়, কেহ পড়ে। মেয়েরা দুবেলাই আসিতেছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে নাম নন্দা; ইহারা বেশীর ভাগই ছাত্রী। নন্দা মেয়েটি নিজের জীবনের কথা মাকে বলিল, বেশ সুন্দর কাহিনী। সে বলিতেছে, “মা আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তার পূর্বে আমাদের ঐ দেশ হইতে আর কেহ এদিকে আসে নাই।

আমার পিতা আমাদের দুই বোনকে পড়াইবার জন্ত এখানে নিয়া আসেন, তখন আমার ১৩ বৎসর বয়স। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত আমি ঘরে বসিয়া বসিয়া পড়িতাম, বাহির হইতাম না ভয়ে। স্কুল পরিদর্শন করিতে যখন ইনস্পেক্টর আসিতেন, আমি টেবিলের নীচে গিয়া লুকাইয়া থাকিতাম, তিনি জোর করিয়া আমাকে বাহির করিয়া নিয়া আসিয়া কত আদর করিয়া কোলে বসাইতেন। এখন আরও কয়েকটি মেয়ে আমাদের ঐদিক হইতে আসিয়াছে, কিন্তু তখন আমরা দুই বোনই মাত্র আসিয়াছিলাম। আমার বোনটি এখানে আসিয়াই মারা যায়।” মেয়েগুলির বেশ ভদ্র ব্যবহার ও নম্র স্বভাব। ট্রেনিং ও শিক্ষা দেওয়া হয়। গান বাজানা ও করে। মার কাছে ভজন করিয়া শুনাইল। ২১টি গান আমি

বাংলা দেশের মেয়েদের
 মত পশ্চিম দেশীয়
 মেয়েরাও মার কাছে
 কাছেই থাকিতে চায়।

লিখিয়া নিলাম। দেখিলাম বাংলা
 দেশের মত এখানকার ছোট ছোট
 মেয়েরা ও মার কাছে বসিবার
 সুযোগটুকু ছাড়িতে চায় না। একবার

বসিয়া পড়িলে আর কাহাকেও নড়ান যায় না। কেহ মার
 শরীর টিপিতে বসিয়া গেল, মোট কথা যে নিকটে বসিয়া মাকে
 স্পর্শ করিতে পারে। রাস্তায় বাহির হইলেই দুইদিক হইতে
 বহুলোক মাকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করে। অথচ মা
 আর একবার মাত্র হরিরাম প্রভৃতির সহিত এখানে আসিয়া
 একদিন ছিলেন। হরিরামের বাড়ী এইখানেই। মা দেয়াতুন
 হইতে আসিয়া একবার নৈনিতাল ও আলমোড়া গিয়াছিলেন।
 তখন আমরা সঙ্গে ছিলাম না। বৈকালে দেবী দত্তের (তাহার
 বাড়ী এই দেশে) দুইটি ভাইঝি আসিল; মেয়ে দুইটি এমন
 সুন্দর বাংলা বলে শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম, শুনিলাম মাত্র
 ৬ মাস শান্তিনিকেতনে গিয়াছে, এর মধ্যেই তাহাদের এতদূর
 ভাষার উন্নতি হইয়াছে। দেবী দত্ত সকলকে নিয়া একটু
 সহর দেখাইতে বাহির হইল। রামকৃষ্ণ মিশন দেখিলাম,
 শুনিলাম ২৩টি আমেরিকান এই আশ্রমে থাকিয়া সাধন
 করিতেছেন। পাহাড়ের একটু নীচে বসিয়া আমরা আর
 তথায় নাছিলাম না। সন্ধ্যার সময় আমরা ফিরিলাম।
 আমাদের সঙ্গীয় ইংরেজ মহিলাটি একটি আমেরিকানকে সঙ্গে

নিয়া মার কাছে আসিলেন, আমেরিকানটির বেশ খুতী চাদর পরা মাথায় পাগড়ী বাঁধা। মাকে দুইজনেই প্রণাম করিয়া বসিল। মেমসাহেবটি বলিলেন “ইনি আমার একজন বন্ধু।” বাংলা ভাষা জানেনা তাই বিশেষ কিছু কথা মার সহিত হইল না। কিছু পরে তাহারা বিদায় হইলেন।

এই দেশীয় ভদ্রলোকেরা মাকে ঘিরিয়া মন্দিরের মধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন। একটি ভদ্রলোক মাকে বলিতেছেন, “মা যাহারা আত্মজ্ঞানী তাহাদের ত শীত গ্রীষ্ম কিছুই থাকেনা, তুমি কেন কম্বল ব্যবহার কর ?” মা ও হাসিয়া বলিলেন “তুমিও যেমন আমিও তেমনি, কে বলিল আত্মজ্ঞানী ? সেই ভদ্রলোকটি

আত্মজ্ঞানীদের শক্তির কথা। অপরের মনের কথা জানা বিশেষ কিছুই নয়।
বলিল “তোমার কাছে এত লোক আসে কেন ?” মা হাসিয়া বলিলেন “একটা কথা কি জান, আমি জানি সব নিয়াই আমার একটা বাবা,

সকলকেই বাবা বলিয়া জানি বলিয়াই মেয়ের মত এ শরীরটাকে তোমরা সকলেই স্নেহ কর তাই আস, আমিত কিছুই করিনা খাই দাই ঘুরিয়া বেড়াই।” এই বলিয়া শিশুর স্বাভাবিক হাসিতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। সেই লোকটি আবার বলিতেছে “আচ্ছা, যাহারা আত্মজ্ঞানী তাহাদের ত কত শক্তি থাকে, আপনি বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। আমার মনের কথা ত আপনি জানিতে পারেন, তবে আর

প্রশ্ন করিবার আবশ্যিক কি ?” অমনি মা বলিতেছেন “আমার কথা ছাড়িয়া দাও, আমি ত তোমাদের মেয়ে। কিন্তু বরষা বন্ধ করিতে বা মনের কথা জানিতে আত্মজ্ঞানই হওয়ার দরকার হয় না। আর মনের কথা বুঝিয়া উত্তর দিতে বলিতেছ— যাহারা বাহির নিয়া আছে তাহাদের সহিত বাহিরেই কথাবার্তা হয়, যাহারা ভিতরের কথা বুঝিতে পারে তাহাদের সহিত ভিতরে ভিতরেই প্রশ্ন উত্তর হইয়া যাইতেছে। সেটা ত বেশী কথা নয়। যেমন টেলিফোন, এখানে এক যন্ত্র বসান থাকে, যেখানে খবর পৌঁছবে সেখানে এক যন্ত্র বসান থাকে খবরাখবর হইয়া যায়।” হরিরামের জ্ঞাতি এক ভাই জজ, তিনি একান্ত ভাবে মার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, হাতজোড় করিয়া বলিলেন, “মা আপনি আমার প্রাণের কথা বলিয়াছেন, ইহা অতি সত্য কথা।”

যে লোকটি মার সহিত আলাপ করিতেছিল সে বলিল, “আচ্ছা মা মহাত্মাদের দর্শনেই সব হইয়া যায়। আর আপনি সকলকে বলিতেছেন কর্ম্ম কর ফল পাইবে। কেন, আমরা যখন আপনাকে দর্শন করিয়াছি তখন ত আমাদের অমনিই সব হইয়া যাইতে পারে।” মা বলিলেন “সত্যই, দর্শন করিলে সব হইয়া যায়

কর্ম্ম না করিলে মহাত্মা-
দের কুপার অধিকারী
হওয়া যায় না।

কিন্তু দর্শন হইতেছে কই? দর্শন করিবার অধিকারী হইবার জন্মই ত কৰ্ম করিতে বলিতেছি। কৰ্ম না করিয়া কথায় কিছুই হইবে না। মেট্রিক পাশ করে নাই অথচ এম-এ পাশের খবর জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাতে লাভ কিছুই নাই। সকলে একটু কষ্ট কর দেখিবে নিশ্চয়ই ফল পাইবে!” সে বলিল “মহাত্মারাই সব করিয়া দিতে পারেন আপনাকে ভগবান করিয়া দিয়াছেন, আপনি আমাদের কেন করিয়া দেন না?” মা বলিলেন “বেশ তুমি আর কিছু করিতে না পার সর্বদা এটা মনে রাখিও যে মহাত্মারাই আমার বাহা কিছু করিবার করিয়া দিবেন।” সে লোকটা হাসিয়া বলিল, ‘আমার সে শক্তি থাকিলে ত হইতই, কৃপা করিয়া কেন সব করেন না? আমিই যদি সব করিব তবে মহাত্মাদের কৃপার অর্থ কি রহিল?’ তখন জজ সাহেব ধীরে বলিলেন, “আপনি যে এত সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহাও ত তার কৃপাই; এই যে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত এখানে বসিয়া মার কৃপা প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আপনার জাগিতেছে ইহাও ত কৃপাই, ইহা অনুভব করিতেছেন না। আমরা যতই কৃপা পাই না কেন অনুভব করিতে পারি না, কারণ আমরা অধিকারী হই নাই। তাই কৰ্ম করিয়া সেই অধিকারী হইতেই বলিতেছেন।”

সে লোকটি বলিতেছে “আচ্ছা মা, সকালে আপনি বলিয়া ছিলেন সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনিই করিতেছেন। কিন্তু

এই যে সৃষ্টির মধ্যে এত বৈষম্য ইহা কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব
 সৃষ্টি, স্থিতি নয় তাঁহারই মিত্যা, তবে আমাদের এইরূপ খেলা
 লীলা ইহাতে পক্ষপাতিত্ব করাইয়া পরিশ্রান্ত করিবারই বা
 নাই। কর্মফলের ভোগেই ফল কি? আবার কখন কখন
 লোক ভুগিতেছে। আমরা বুঝিয়াও কেন আবার সেই মিত্যা খেলাতেই মজিয়া
 থাকি এ সকলের কারণ কি?” মা বলিলেন “আমরা ঠিক
 ঠিক বুঝি না, ঠিক ঠিক বুঝিলে কখনই খেলায় মজিয়া যাইতে
 পারি না, খেলিতে পারি, কিন্তু মজিতে পারি না। জীবন্মুক্ত
 পুরুষরা ও খেলেন দেখা যায়, কিন্তু সেই খেলায় তাহাদের
 কোনই ভোগ নাই। তাই নূতন কর্মও সৃষ্টি করিতে পারে না।
 প্রারম্ভ বশে সেই খেলা আপনা আপনি হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।
 কুমারের চাক ছাড়িয়া দিলেও কিছুক্ষণ চলে তেমনি। আমরা
 আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যাইবে নিশ্চয় জানি, আমরা কি
 তবুও আগুনে হাত দেই? এইরূপ নিশ্চয় বুঝিলে কেহ
 সেই কাজ করে না। আমরা মুখে মুখে শুনিয়া বা পড়িয়া
 জানি মাত্র, নিশ্চয় বিশ্বাস করি? আর পক্ষপাতিত্ব যে বল,
 আমরা পক্ষপাতিত্ব নিয়া আছি কিনা, তাই পক্ষপাতিত্ব
 দোষ তাঁহাকেও দিতেছি, বাস্তবিক পক্ষপাতিত্ব দোষ কি তাহার
 হইতে পারে? এক ভিন্ন যে আর কিছুই নাই কাহার সঙ্গে
 পক্ষপাতিত্ব অপক্ষপাতিত্ব করিবে? কাহাকেই পরিশ্রান্ত
 করিবেন? তিনি যে নিজেই নানারূপে খেলা করিতেছেন

এই তাহার লীলা। আমরাই যদি এক হাত কন্মলের ভিতর রাখি আবার এক হাত বাহিরে রাখি তাহাতে যেমন এক হাত বলিতে পারে—দেখ আমাকে কেমন गरमे রাখিয়াছে আমাকে ভালবাসে আর এক হাত বলিবে আমাকে ঠাণ্ডা ফেলিয়া রাখিয়াছে—ইহা যেমন আমার পক্ষপাতিত্ব তুমিও সেইরূপই বলিতেছ। বাস্তবিকপক্ষে সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দ সবই একটা ভাবের খেলা মাত্র আর কিছুই নয়। সৃষ্টিটাই একটা লীলাখেলা। যেমন তুমি একবার তোমার মুক্ত শরীরটা নানা পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া ঢাকিয়া লইতেছ, চাকুরী করিতে যাইতেছ, আবার সেই পোষাক ইচ্ছামত ছাড়িয়া মুক্ত হইতেছ; তেমনই তিনি নিজের মাথায় নিজেই আবৃত হইয়া নানা ভাবে নানারূপে খেলা করিতেছেন, ইহাতে পক্ষপাতিত্ব আসিবে কোথা হইতে?” ভদ্রলোকটা বলিতেছেন, “আমরা যে কষ্ট পাই।” মা বলিলেন, “দেখ তুমি মুক্ত ছিলে, নিজেই বিবাহ করিলে, ছেলেমেয়ে হইল, এখন আবার বলিতেছ কিসে মুক্ত হইব, যেমন কাজ করিয়াছ তাহার ফলও এখন ভোগ করিতেই হইবে। আনন্দ পাইলেই নিরানন্দও পাইতে হইবে, যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে নিরানন্দও নাই, যেমন জীবন্মুক্ত অবস্থায় বাহিরের সব কিছু কাজ হইয়া যাইতেছে কিন্তু আনন্দ বা নিরানন্দ কিছুই নাই।” আরও নানা কথায় কথায় ভোলানাথ যে মাথাশূণ্য মূর্তি দেখিয়া মাকে বলায় মা তাহাকে তারাপীঠ যাইতে বলেন এবং

সেখানে গিয়া ভোলানাথ দেখেন বাস্তবিকই সেখানে তারামূর্তির আল্গা রূপার মাথা লাগান হয়, রাত্রিতে খুলিয়া রাখা হয়—
নেই সব গল্পও মা কথায় কথায় বলিলেন। রাত্রি প্রায় ১টা বাজে দেখিয়া অনিচ্ছায়ও সকলে বিদায় নিলেন।
আমরাও শুইয়া পড়িলাম। আগামীকাল্য উত্তরবৃন্দাবন, এখান হইতে ১৪মাইল দূর, মিসেস্ চক্রবর্তীকে দেখিতে যাইবার কথা হইয়াছে।

১২ই বৈশাখ, রবিবার।

১১টায় ডাঙিতে উত্তরবৃন্দাবন যাওয়ার কথা। খাওয়া দাওয়া করিয়া সব প্রস্তুত। মেমসাহেবের ভারতবর্ষীয় সব মহাত্মাদের দেখিবার বিশেষ আগ্রহ। মিসেস্ চক্রবর্তীর ঠিকানা তাহার নিকট আছে। মিসেস্ চক্রবর্তীর সেবায় একটি আমেরিকান আছেন। তিনি প্রফেসর ছিলেন। তাকে, দেখিবারও মেমসাহেবের বিশেষ আগ্রহ। হঠাৎ মেমসাহেব আসিয়া খবর দিলেন—মিসেস্ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে আমেরিকান সাহেবটি থাকেন তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; কাজেই মেমসাহেবের তথায় যাওয়ার আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য সে আসিবে কিন্তু আমাদের আগামী কল্যই নৈমিতাল ফিরিতে হইবে। মেমসাহেব মাকে নিয়া আসিয়াছেন আবার মার সঙ্গেই নৈমিতাল ফিরিতে চান; নতুবা একদিন থাকিয়া তাহাদের দেখিয়া যাইতে পারিতেন। এখানকার একজন

ডেপুটী পোর্টমাস্টার জেনারেল আমাদের সকলের উত্তরবৃন্দাবন
 যাওয়ার খরচ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যাওয়া হইল
 না। মা নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন। কাল হইতেই
 মার খেয়াল, ‘তাহারা নাই—যাওয়া হইবে না,’ কিন্তু বাধা
 দেন নাই। কারণ তিনি বলেন, যতটুকু কৰ্ম্ম হইবার হইয়া
 যাওয়াই দরকার, বাধা দেওয়া ঠিক নয়। সকলটারই একটা
 অর্থ আছে।” তাই তিনি কোনটাতেই বিশেষ আগ্রহ বা
 নিগ্রহের ভাব প্রকাশ করেন না। সাধারণতঃ যখন যে
 বাহ্য করিতেছে, তাহাতেই যোগ দিয়া যান। আজও মেয়েরা
 আসিয়া মার কাছে ঘিরিয়া বসিল; মাকে ফুল ছিটাইয়া
 ঢাকিয়া দিল। ফল মিষ্টি যে বাহ্য পারিয়াছে আনিয়া
 চরণে দিতেছে। উহারা একটি একটি কমলা, কলা ইত্যাদি
 আনিতেছে। পরে মাকে “তুমি দেবী কালিকা, তুমি সর্ব-
 শক্তিময়ী”—এই বলিয়া মার ভজন গান করিতেছে।
 ভদ্রলোকেরাও অনেকেই আসিয়াছেন। নানা কথাবার্তা
 হইতেছে। গতকলের সেই ক্ষুদ্রলোকটিও আসিয়াছেন। মাকে
 বলিতেছেন, “মা, সমাধিতেই বেশী আনন্দ, কি এই যে
 সর্বসাধারণের সহিত বাইরের ব্যবহার চলে, ইহাতে বেশী
 আনন্দ?” মা বলিলেন, “সমাধিতে বেশী আনন্দ বলিয়াই
 সকলে মহাত্মাদের কাছে সেই তত্ত্ব জানিতে চায়। আর
 দেখা যায় ব্যবহারিক জগতে তাহারা বিচরণ করে, তাহাদের
 আনন্দ স্থায়ী হয় না—অশান্তিই তাহারা বেশী ভোগ করে।

আর সাধু মহাত্মা যাঁহারা সমাধিতে বাইতে পারে তাঁহাদের একটা আনন্দের ভাব সর্বদাই থাকে। এমন আনন্দের ভাব থাকে যে তাঁহাদের দেখিয়াও লোকে আনন্দ পায়।” সে

লোকটি বলিল, “তবে আপনি সর্বদা মা—সর্ব অবস্থায়ই সমা- সমাধিতে থাকেন না কেন?” মা ধিতেই আছেন।

এই কথায় খুব হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, “আমি যে তোমার মেয়ে।” অখণ্ডানন্দজী নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন, “মা সব সময়েই সমাধিতে আছেন। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলিতেছেন বা কখনও পড়িয়া থাকেন, কখনও হাঁটেন, চলেন—সব সময়েই মার এক সমাধিস্থ অবস্থা।” মা হাসিয়া বলিলেন, “দেখ, এই কথার প্রমাণ কি? আমি ত তোমাদেরই মত একজন।” সেই লোকটি মার দিকে চাহিয়া, চাহিয়া ধীর ভাবে বলিল, “না তাহা যে নয়—তাহা আপনার চেহারায়ই প্রমাণ দিতেছে।” মা আবার হাসিয়া বলিলেন, “কি রকম তোমার মতইতো আমার হাত, পা মুখ সবই আছে।” কিন্তু সেই লোকটি এই কথাতে যোগ না দিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল। ধীরে ধীরে অনেকে বিদায় নিতেছেন। একটি লোক উঠিয়া দাঁড়াইল বাইবে—মা বলিলেন, “বাবা, তুমি কি চলিলে নাকি?” সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, “হাঁ, মা, আপনি শুইলেন, আমি বাই।” মা হাসিয়া বলিলেন, “শোন, আমি ত সব সময়ই শুইয়া থাকি, তোমার সঙ্গে যে কথা

বলিতেছি—এও শুইয়া আছি।” সে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। কিছু সময় আলাপ করিয়া মাও মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১২টা—স্ত্রীলোকেরা আনিয়া ধীরে ধীরে মাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। মা পড়িয়াই আছেন। প্রায় বেলা ১টার মা উঠিয়া বসিলেন। মেয়েরা সব মাকে নিয়া নানাভাবে আনন্দ করিতেছেন। মা ফুল, ফল কখনও এদিক ওদিক ছুড়িয়া দিয়া শিশুদের সহিত তৃষ্ণামী করিতেছেন। এই আনন্দে মা নাম করিতে বলিতেছেন। বলিলেন, “বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম—খালি জিহ্বা কিয়া কাম। নাম কর, “বল—যব জনম লিয়া, বল রাম সীয়া।”

এইভাবে নানারকম আনন্দ করিতে লাগিলেন। একবার আমি উঠাইয়া প্রস্রাব করিবার জন্য বাহিরে নিয়া গিয়াছি।

মা ফিরিয়া আসিতেই সকলে বলিতেছেন,

মাকে অল্পসময়ের জন্য
ছাড়িয়া দিতেও ভক্তদের
কষ্ট।

“মা, যেমন বর ছাড়া বরযাত্রী, তুমি
চলিয়া গেলে এখানকার অবস্থা সেই
রকম হইয়াছিল। এই দুই মিনিটেই

যেন সব নিরানন্দ হইয়া গিয়াছিল।” একজন বলিতেছেন,
“মা তুমি এক স্বামী, আমরা সব তোমার স্ত্রী।” মা
অমনি হাসিয়া বলিতেছেন, “এত স্ত্রীকে আমি কি খাওয়াইব?”
সকলে হাসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, “মা, তোমার
কৃপাতেই সকলে ঘরে ঘরে খাইয়া আছে।” মা বলিলেন,

“আবার তোমরা সকলে মিলিয়া আমার এক স্বামী, আমি স্ত্রী।” সকলেই অস্বীকার করিয়া বলিল, “না, মা, তা হয় না, তা হয় না। তোমার ছায়ারই আমরা আছি, তুমিই আমাদের স্বামী!” মা হাসিতেছেন, বলিলেন, “এই নেও, আমার যে স্ত্রী হয় তারাতো এই ফল, ফুলই মাত্র পাইবে”—এই বলিয়া নিজের গায়ের ফল, ফুল সব ছিটাইয়া দিতেছেন, তাহা নিবার জন্ম হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মার চরণের ফুল নিবার জন্ম সকলেই হাত পাতিয়া আছে।

এই সব চলিতেছে—এর মধ্যে ডাণ্ডি আসিল। যে ডাণ্ডি উত্তর বৃন্দাবন যাওয়ার জন্ম প্রস্তুত ছিল সেই ডাণ্ডি নিয়া আমরা মার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। ইংরেজ মহিলাটি ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ডেপুটি পোস্ট-মাষ্টার জেনারেল ভদ্রলোক এবং দেবীদত্ত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি আরও অনেকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। শুনিলাম ৪মাইল দূরে কালীমঠ আছে তথায় নিয়া বাইতেছে। রাস্তার সুন্দর দৃশ্য। খানিকটা পথ আবার কাঁটা জঙ্গল ও আছে। কাল ইংরেজ মহিলাটি যে আমেরিকানটিকে সঙ্গে নিয়া মার কাছে

আসিয়াছিলেন, রাস্তায়ই তাঁহার আশ্রম।
 উত্তর বৃন্দাবনে যাওয়া তিনি একান্তে সাধন করিবার জন্মই
 না হওয়ায়, কালীমঠে এখানে আছেন, আরও কয়েকটি স্ত্রী
 গমন ও প্রত্যাবর্তন। পুরুষ তথায় থাকেন। আমরা তথায়

পৌঁছিতেই আমেরিকান সাধুটি কাছে আসিয়া মাকে প্রণাম করিল, এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কালী মঠে চলিল। এবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম বাঙ্গালীদের মত বেশ কাপড় পরিয়াছে, একটা মোটা পাঞ্জাবী গায়—সবই ময়লা। বলিল, “জল বড় দূর, তাই কাপড় পরিষ্কার করা কষ্টকর।” কাপড়খানা ও সেলাই কর। হাতে কাজ করিতে করিতে ময়লা পড়িয়া গিয়াছে। বেশ দেখায়। আমরা কালীমঠে পৌঁছিলাম। বেশ সুন্দর একান্ত স্থান, চারিদিকের দৃশ্য ও বড় সুন্দর। মেমসাহেব মার ফটো তুলিলেন। আবার ভোলানাথ ও মার ফটো, আমার ও মুন্নির সহিত মার ফটো তুলিলেন। পরে ভোলানাথের কথায় ভোলানাথ ও মার মধ্যে মেমসাহেব বসিয়া একটা ফটো সাহেবটিকে দিয়া তোলাইলেন। পরে আবার দলবল ফিরিল। পথে একটি জার্মান চিত্রকরের বাড়ী মেম ঢুকিলেন, শুনিলাম, চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।

একটু পরে বাড়ীর মালিক সস্ত্রীক আসিয়া মাকে ও আমাদের তাহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন। তথায় একটি স্পেনদেশীয় মেয়ে দেখিলাম। শুনিলাম নিজেদের দেশের গোলমাল পড়িয়া মেয়েটি একা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছিল, “পাশ্চাত্য জগত বড় বিস্ত্রী সেখানে শাস্তি পাওয়া যাওয়া না। ভারতবর্ষে আসিয়া আমি বেশ শাস্তি

পাইতেছি। আরও একটি সাহেব U Pতে যেমন পোষাক ভদ্রলোকেরা পরেন, তেমনই পোষাক পরিয়াছেন। শুনিলাম, ইনি উত্তর বৃন্দাবনে মিসেস চক্রবর্তীর আশ্রমে থাকেন। জার্মান দম্পতী, উপোরক্ত স্পেনের মেয়েটি এবং মিসেস চক্রবর্তীর আশ্রমের সাহেবটি সকলেই মাটিতে পড়িয়া বেশ বাঙ্গালীদের মত মাকে ভোলানাথকে প্রণাম করিল। মা ঘরে বাইবেন না, তাই বাইরে বসিবার জায়গা করিয়া দিল। নিজের তৈয়ারী চিত্র মাকে সব আনিয়া দেখাইল। বুদ্ধদেবের, স্বামী সারদানন্দের, স্বামী শিবানন্দের—অনেকের চিত্রই অঙ্কিত দেখিলাম। পরে বাড়ীর কর্তী লেবুর সরবত চাকর দিয়া আনাইয়া সকলকে খাইতে দিলেন। চাকরটিকে নিজেদের প্লেট আনিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পিতলের প্লেট ও পিতলের বাটি গ্লাস আনিয়া অনেকে খাইলেন। বহুক্ষণ তথায় বসা হইল। এই বাড়ী হইতেও চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। বেশ শান্ত স্থান। তথা হইতে আমরা সকলে ধর্মশালায় ফিরিলাম। সাহেব, সাধু ও মেমটি সঙ্গেই আছেন! মেমটি বলিলেন, “৭টার রামকৃষ্ণ মিশন হইতে একটি সাধু মার কাছে আসিবেন, তাই তাহারা ও অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীনিবাস মেয়েদের নিয়া সুন্দর কীর্তন করিলেন। যথা সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সাধু আসিলেন। সঙ্গে ডাক্তারবাবু ও তাহার আমেরিকাবাসিনী পত্নী, ইহারা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিশেষ কিছু কথা হইল

না ; তবে মাকে আগামী কল্য নৈনিতাল ফিরিবার পথে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া গেলেন । ধীরে ধীরে সকলেই বিদায় হইল । আগামী কল্য নৈনিতাল ফিরিয়া কথা । আজও রাত্রি প্রায় ৯টায় জজবাবু ও অন্যান্য অনেকে আসিয়া বসিয়াছেন । কিন্তু মা চুপ করিয়া শুইয়া আছেন । বিশেষ কথা কিছু হইল না । রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিদায় নিলেন । মাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়াই ধীরে ধীরে সকলে উঠিল ।

১৩ই বৈশাখ, সোমবার ।

প্রাতে মা না উঠিতেই নন্দাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে মাষ্টার মহাশয়েরা ছেলেদের দাঁড় করাইয়া স্তোত্রাদি পাঠ করাইতেছেন । মা উঠিয়া বাহিরে গেলেন । ছেলেরা স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্কুলে ফিরিয়া গেল । মা আসিয়া ঘরে বিছানায় বসিলেন । লোকজন আসিতেছে । আমি তাড়াতাড়ি রান্না করিতে ব্যস্ত কথাবার্তা বেশী কিছু শুনিতে পাই নাই । বেলা প্রায় ১২টায় আমরা রওনা হইলাম । গারবিয়াংএর মেয়েরা আসিয়াছে । সকলেই বিশেষ অনুরোধ করিতেছে—মা ঘেন কৈলাশ একবার আসেন, তাহারা মার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সব দেখাইয়া দিবে । মে, জুনে কৈলাশের দরজা খুলিবে । আলমোড়া হইয়াই যাইতে হয় । একরকম কথা হইয়া গেল—যদি সব ঠিক ঠিক মত থাকে, তবে কৈলাশ

যাওয়া হইতে পারে। মেয়েদের বড়ই আনন্দ, মার সহিত

সব ঠিক ঠিক মত	তাহারা ও ডাক্তারবাবুর বাড়ী চলিল।
থাকিলে কৈলাশ	ইনি জগদীশবাবুর একজন ছাত্র মাকে
যাওয়ায় অস্বীকার।	লেবোরেটরী দেখাইবেন ইচ্ছা।

আমরা মোটরে ডাক্তারবাবুর বাড়ী যাইতেই, তাঁহারা স্বামী স্ত্রী গতকল্য যে সাধুটি গিয়াছিলেন (পরে শুনিলাম তাঁর নাম রাম স্বামী) এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আরও দুইটি সাধু (একটি আমেরিকান) মাকে আসিয়া খুব আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু ঘরে যাইয়া তাহার যন্ত্রপাতি দেখিতে মাকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মা হাসিয়া অস্বীকার করিলেন। মাকে ফুল বাগিচায় বসান হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি আরও অনেকে গিয়াছেন। সাধু তিনটি মার কাছে দাঁড়াইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। রামস্বামী আমেরিকান সাধুটিকে দেখাইয়া বলিলেন, “ইনিও কাল আপনার কাছে যাইতে খুবই ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রুগ্ন বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ আপনি এখানে আসিবেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া আসিয়াছেন। নন্দাদেবীর মন্দির অনেকটা দূর, তাই যাইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়— আমি এত বৃদ্ধ কিন্তু আমার যাইতে একটুও কষ্ট হয় নাই, ইহার কারণ কি বুঝিতেছি না।” মা হাসিয়া বলিলেন,

“সবই সেই একেরই খেলা।” তিনি বলিলেন, “তাইতো মা, তবে ভিতরে একটু গলদ থাকিলেই, আর আমরা তাহা বুঝি না। পরমহংসদেব বলিতেন, সূচ সূতা দিবার সময় একটু ভোঁতা থাকিলেই আর দেওয়া যায় না।” মা বলিলেন, “খুবই ঠিক কথা।” একটু পরেই মা রওনা হইলেন। সাধুরা মোটরের নিকটে আসিয়া মাকে উঠাইয়া দিলেন। আমেরিকান সাধুটি হাতজোড় করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “আমার বডই সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম।” রামস্বামীও মাকে ঐরূপ বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, “তোমরা এইরূপ কেন বল? আমি যে তোমাদের মেয়ে, সেইভাবেই দেখিও।” অমনি রাম সাধু বলিলেন, “তাকি হয়? তুমি যে আমাদের মা।”

আমরা নৈনিতাল রওনা হইলাম। মোটর ছাড়িবার সময় কৈলাশের মেয়েরা ৪৫ জন সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তাহারা কাঁদিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বলিতেছে, “এখনই মার সঙ্গে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা লেখাপড়া শিখিয়া মার কাছে যাইয়া কাজে লাগিব।”

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি, ২৩ দিনের দেখায় পার্বত্য বাসিনী এই যুবতী মেয়েরা মার কাছে কি পাইল? ইহারা ঘেরূপ সরল, তাহাতে ইহাদের এই ব্যবহার আশ্চর্য্য

নৈনিতাল যাত্রা ।
পাহাড়ী মেয়েদের মাকে
ছাড়িতে কষ্ট ।

নয় । আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া
আবার আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ
অনুরোধ করিতেছে । বলিতেছে,

“তোমরা কৈলাশ গেলে, আমরা সঙ্গে

গিয়া রাস্তার বরফ সরাইয়া দিয়া তোমাদের পথ পরিষ্কার
করিয়া দিব ।” ইহাদের সরল প্রাণের ভালবাসাটুকু প্রাণে
আঘাত করিল । মার শক্তি দেখিয়া কেবলই মুগ্ধ হইতেছি ।
ইহারা ভাষা পর্যন্ত ভাল করিয়া বোঝেনা—তার মধ্যে এই
কান্না । একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—স্কুলের
ছেলেদের দেখিয়া মার খেয়াল হইল, বলিলেন “সকলকে
একখানা নাম লিখিবার জন্য খাতা কিনিয়া দিয়া যাওয়া হউক ।
প্রাতে তাহাতে ভগবানের নাম লিখিয়া পরে অপর কাজ
করিবে ।” তাই করা হইল—১৪৫ জন ছেলে । সকলকেই
খাতা কিনিয়া দেওয়া হইল । এই খরচ জজবাবু বহন
করিলেন । তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া এই খরচ আর
কাহাকেও দিতে দিলেন না ।

গাড়ীতে বসিয়া মেমসাহেব মাকে প্রশ্ন করিতেছেন—
জ্যোতিষদাদা উভয়কে উভয়ের কথা বুঝাইয়া দিতেছেন ।
মেমসাহেব বলিলেন, “এই যে পশু-পাখী, গাছ-পালা, ইহাদের
মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা আছে এবং মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা
আছে, তাহা কি অভিন্ন ?” মা বলিলেন, “অভিন্নই ত, যেমন

এক শূন্যের মধ্যেই আমরা আছি, শূন্যস্থানটা কাটিয়া ভাগ করা যায়না—ঠিক তেমনই।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা সকলের মধ্যেই যে এক চৈতন্য সত্তা আছে, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন? মা বলিলেন, “ইহা ত অতি স্বাভাবিক কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয়, বৃক্ষগুলি কথা বলিতে পারে। যখন বাতাস বহিয়া যায়, তখন সর্ববভূতেই এক অভিন্ন আমার মনে হয়—গাছগুলি

সর্বভূতেই এক অভিন্ন চৈতন্য; মনুষ্যের মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। যে ভাবে সৃষ্টি, সেই ভাবেই লয়, যেমন যে রাস্তা দিয়া নৈনিতাল যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাস্তায়ই নৈনিতাল আসা।

কথা বলে।” মা বলিলেন, “গাছগুলি কথাও বলিতে পারে, ইহাও সত্য কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, আর পশু-পাখীতে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, তাহা কি একরকমই? পশু-পাখী, গাছ-পালাও কি ভগবানের আরাধনা করিতে পারে? মা বলিলেন,

“দবই ত তাঁর মধ্যে; তিনিই তাকে নিয়েই। মনুষ্য জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, যেমন শিশুরূপী মুখ মানুষকেও শিক্ষার ফলে বিদ্বান করা যায়—কিন্তু গাছ বা পশুকে তদ্রূপ করা যায় না। মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয়। আর ভগবানের আরাধনা গাছ বা পশু মানুষের মতন করিতে পারেনা ইহা ঠিক, তবে তাহাদের শাস্তি ও আনন্দের গতি

নয় । আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া
 নৈনিতাল যাত্রা ।
 পাহাড়ী মেয়েদের মাকে
 ছাড়িতে কষ্ট ।
 আবার আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ
 অনুরোধ করিতেছে । বলিতেছে,

“তোমরা কৈলাশ গেলে, আমরা সঙ্গে

গিয়া রাস্তার বরফ সরাইয়া দিয়া তোমাদের পথ পরিষ্কার
 করিয়া দিব ।” ইহাদের সরল প্রাণের ভালবাসাটুকু প্রাণে
 আঘাত করিল । মার শক্তি দেখিয়া কেবলই মুগ্ধ হইতেছি ।
 ইহারা ভাষা পর্যাঙ্ক ভাল করিয়া বোঝেনা—তার মধ্যে এই
 কান্না । একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—স্কুলের
 ছেলেদের দেখিয়া মার খেয়াল হইল, বলিলেন “সকলকে
 একখানা নাম লিখিবার জন্য খাতা কিনিয়া দিয়া যাওয়া হউক ।
 প্রাতে তাহাতে ভগবানের নাম লিখিয়া পরে অপর কাজ
 করিবে ।” তাই করা হইল—১৪৫ জন ছেলে । সকলকেই
 খাতা কিনিয়া দেওয়া হইল । এই খরচ জজবাবু বহন
 করিলেন । তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া এই খরচ আর
 কাহাকেও দিতে দিলেন না ।

গাড়ীতে বসিয়া মেমসাহেব মাকে প্রশ্ন করিতেছেন—
 জ্যোতিষদাদা উভয়কে উভয়ের কথা বুঝাইয়া দিতেছেন ।
 মেমসাহেব বলিলেন, “এই যে পশু-পাখী, গাছ-পালা, ইহাদের
 মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা আছে এবং মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা
 আছে, তাহা কি অভিন্ন ?” মা বলিলেন, “অভিন্নই ত, যেমন

এক শূণ্যের মধ্যেই আমরা আছি, শূণ্যস্থানটা কাটিয়া ভাগ করা যায়না—ঠিক তেমনই।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা সকলের মধ্যেই যে এক চৈতন্য সত্ত্বা আছে, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন? মা বলিলেন, “ইহা ত অতি স্বাভাবিক কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয়, বুদ্ধগুণি কথা বলিতে পারে। যখন বাতাস বহিয়া যায়, তখন সর্ববভূতেই এক অভিন্ন আমার মনে হয়—গাছগুলি

সর্ববভূতেই এক অভিন্ন চৈতন্য ; মনুষ্যের মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। যে ভাবে সৃষ্টি, সেই ভাবেই লয়, যেমন যে রাস্তা দিয়া নৈনিতাল যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাস্তায়ই নৈনিতাল আসা।

কথা বলে।” মা বলিলেন, “গাছগুলি কথাও বলিতে পারে, ইহাও সত্য কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, আর পশু-পাখীতে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, তাহা কি একরকমই? পশু-পাখী, গাছ-পালাও কি ভগবানের আরাধনা করিতে পারে? মা বলিলেন,

“সবই ত তাঁর মধ্যে ; তিনিই তাকে নিয়েই। মানুষ জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, যেমন শিশুরূপী মুখ মানুষকেও শিক্ষার ফলে বিদ্বান করা যায়—কিন্তু গাছ বা পশুকে তদ্রূপ করা যায় না। মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয়। আর ভগবানের আরাধনা গাছ বা পশু মানুষের মতন করিতে পারেনা ইহা ঠিক, তবে তাহাদের শান্তি ও আনন্দের গতি

আছে— ইহাও সত্য। এর মধ্যে একটু বিশেষ কথা আছে, যেমন জড় ভরত হরিণ হইয়াছিল। বাহার জাতিস্মর থাকে তাহাদের কথা ভিন্ন। এই রকম কখনও গাছ-পালা বা পশু-পাখীও ভগবানের আরাধনা করে; ইহা বিশেষ যদি কোন কারণে কেহ সাময়িকের জন্য পশু-পাখী, গাছ-পালা হইয়া থাকে তবেই এই কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা, এক ওঁ হইতেই জগত সৃষ্টি হইল, আবার তাহাতে লয় হয় কি প্রকারে?” মা হাসিয়া বলিলেন, “যে ভাবে সৃষ্টি হইল, সে ভাবেই লয় হয়। যেমন যেই রাস্তা দিয়া নৈনিতাল হইতে আসিয়াছিলাম, আবার সেই রাস্তা দিয়াই নৈনিতাল যাইতেছি।” উত্তর শুনিয়া মেমসাহেব খুব আনন্দিত হইলেন। মার কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোন অসুবিধা হইতেছে না তো? মায় পায়ের কাছে বাস্ত টানিয়া দিতেছেন, মাকে পা রাখিতে বলিতেছেন। আজও মাকে বৈকালে একটা কমলার একটু খাওয়ারিয়া দিয়া নিজে তাহা খাইতে লাগিলেন। মা মধ্যে মধ্যে শিশুর মতন ২।৪টা ইংরেজী কথা বলিতেছেন। শুনিয়া মেমসাহেবের বড় আনন্দ, মার পরিষ্কার উচ্চারণের প্রশংসা করিতেছেন। প্রায় ৬ মাইল রাস্তা। আমরা বেলা ৬টায় নৈনিতাল পৌঁছিলাম। মোটর দাঁড়াইতেই নৈনিতালের দলবল তথায় উপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা করিলেন। মেমসাহেব রাস্তায় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আলমোড়া মার কাছে

কেমন লাগিল। মা উত্তর দিলেন, সব জায়গায়ই সমান, কোন পার্থক্য বোঝেন না। এই উত্তরে মেমসাহেব বড় সুখী হইলেন। ইনি বেশ বুদ্ধিমতী। আমরা মোটর হইতে নামিয়া তালিতাল হইতে নৌকায় মলিতাল নয়নাদেবীর ধর্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তালের সিড়িতে পাহাড়ী মেয়ের দল মার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। মা আসিতেই আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সকলে মার সহিত উপরে আসিয়া মার সঙ্গে এক কোঠায় বসিল। ভজন আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে সকলে বিদায় হইল। আজ রাত্রি ৯।০টায় সকলে শুইয়া পড়িল। অখণ্ডানন্দ স্বামী নিজের কাজে বসিয়া আছেন।

১৪ই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

সকালে মা বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া একটু দুখ খাইলেন। বেলা ১০টায় মেমসাহেব মার কাছে আসিয়াছেন, মাকে একজন সিল্কের কাপড় চাদর দিয়াছিলেন; মা তাহা মেমসাহেবকে দিয়াছেন, আজ মেমসাহেব তাহা পরিয়া আসিয়াছেন। ঠিকভাবে পরা হয় নাই। মা আমাকে দিয়া আবার তাহাকে ঠিক করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। তিনি কত ভাবে কত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাকে হাতজোড় করিয়া বলিতেছেন—“আপনি আশীর্বাদ করুন, আজ আপনি এই যে পোষাক বাহিরে

পর্যায় দিলেন, ভিতরেও যেন আমি ইহার উপযুক্ত হইতে

পারি।” তাহার বোধ হয় বিশ্বাস

আমেরিকান ভদ্র

মহিলার মার নিকট

সাধু হওয়ার আশীর্বাদ

প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় এই পোষাক পরিলেই

সাধু হইতে হয়। একটি সাধু তাকে

একটি তামার কমণ্ডলু দিয়াছিলেন।

তিনি সেই কমণ্ডলুটি সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। বেশ

দেখাইতেছিল। মাকে ও আমাদের সকলকে আমেরিকায়

যাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভোলানাথকে দেখিয়া

বলিতেছেন,—“এঁকে আমার খুবই ভাল লাগিতেছে। আমি

একটি সাধু দেখিয়াছিলাম, এঁকে দেখিয়া আমার সেই সাধুর

কথাই মনে হইতেছে।” বেলা প্রায় ১টার মেমসাহেব বিদায়

নিলেন। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা মার কাছে নাচ গান করিত ;

আজ মেমসাহেবের কাছেও তাহারা নাচ গান করিল। আবার

বেলা ৫টার মেমসাহেব আসিয়াছেন। তিনি সাড়ী পরিয়াই

আছেন। মাকে নিয়া তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন।

একটু পরেই ফিরিলেন। আজ তাঁহার জলখাওয়ার বন্দোবস্ত

করা হইয়াছে। খুব আনন্দের সঙ্গেই তিনি আমাদের দেশীয়

খাদ্য খাইলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার মাকে প্রণাম করিয়া ও

খাওয়ার জন্ত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় নিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় :

—: * :—

১৫ই বৈশাখ, বুধবার ।

আজও সকালে মা বেড়াইয়া আসিলেন । আজ আমাদের ৬টার গাড়ীতে বেরিলী যাওয়া স্থির হইয়াছে । গতকল্যের একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি । গতকল্য যখন মা রাত্রিতে বিছানায় গিয়া শুইয়াছেন, আমরাও শুইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এর মধ্যে কন্মলের কথা উঠিল । জ্যোতিষদাদা বলিলেন,—“কন্মল যখন প্রচলিত ছিল, তখন শুদ্ধ কন্মল তৈয়ার হইত । এখনকার দিনে কত কি মিশাইয়া দেয়, কিন্তু এখন লেপ তোষকই বেশ । এই কথা নিয়া সকলে মিলিয়া হাসাহাসি হইতেছে । মা বলিতেছেন,—“মরা পশুর লোম কন্মলে দেয় ।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “দেখ, আমি যে কন্মল গায়ে দিয়াছি এর মধ্যে একটা কন্মল যেদিন প্রথম গায় দিলাম, রাত্রিতে শুইয়া আছি দেখি এই সব হোমরা চোমরা এক একটা ছাগল গায়ের কাছে ঘুরিতেছে, একটা আবার মরা ছাগল । ইহাদের গায়ের লোমের কন্মল গায়ে দিয়াছি, তাই ইহারা আসিয়াছে ।”

আবার আজ সকালবেলা মুখ ধোয়াইবার সময় বলিতেছেন,—“আজ গলাটা বেদনা হইয়াছে। কাল রাত্রিতে যখন শুইয়াছিলাম, তখন কোথায় কোথায় গিয়াছিলাম, ঠাণ্ডা লাগিয়া তখন তখনই গলা ব্যথা হইল বুঝিতেছিলাম। প্রাতে বেড়াইতে গিয়া দেখি সত্যই গলা ব্যথা হইয়াছে।” আজ মা প্রাতে একটু দুধ ও ফল খাইয়া রহিলেন। বলিলেন, “আজ আর দুপুরে খাইতে বসিব না। তোমরা কিন্তু সকলে খাইও। আমি যখন হয় খাইব।” তাই হইল। আজ আমাদের ডাক্তার গাড়ীতে বেরিলী যাইবার কথা। আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া তৈরী হইলাম। বেলা প্রায় ৩টা ৩০টার মোটরে রওনা হইয়া কাঠগুদাম পৌছাইতে প্রায় ১১০ ঘণ্টা লাগে। সেখান হইতে ট্রেন ধরিতে হয়। মা প্রায় আড়াইটায় খাইতে উঠিলেন। অনেক মেয়েরা আসিয়াছে; কীর্তনাদি চলিতেছে। মা খাইতে আসিয়াই বলিতেছেন,—“আজ যখন তুমি রান্না করিতেছিলে, আমি শুইয়াছিলাম—দেখিতেছি মূলায় তরকারীর মূলাগুলি সব সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ।” সত্যই ভোলানাথ খাইতে বসিয়াই বলিয়াছেন মূলা বেশী সিদ্ধ হওয়ায় টক হইয়া গিয়াছে। যদিও এগুলি মার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র কথা, কিন্তু আমাদের সংশয় ভরা প্রাণ, তাই এসব সামান্য বিষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া যাই—সংশয় নষ্ট হইয়া আসে। সেইজন্যই আমাদের কাছে মার

প্রত্যেক কথাটাই মূল্যবান। তাই বতটুকু পারি লিখিয়া রাখি। মা যে আমার সর্বস্ব তাহা কেবলই ভুলিয়া বাই। যাক, খাওয়া দাওয়ার পরে বেলা ৩০টার আমরা রওনা হইলাম। পাহাড়ী মেয়েরা মাকে আরাতি করিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছে; গানের মশ্ন এই যে তুমি নির্ভর হইয়া থাকিও—তুমি ভাল থাকিও—ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন আজ তাহারা মেয়েকে দূরে পাঠাইতেছে। আমরা নোকায় মকিতাল হইতে তাকিতাল আসিয়া মোটরে কাঠগুদাম চলিলাম। মেমসাহেব প্রথমে আসিবেন না কথা ছিল, কিন্তু শেষে মার সঙ্গে বেরিলী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ৬০টার কাঠগুদাম হইতে রওনা হইয়া প্রায় রাত্রি ১০০টার আমরা বেরিলী পৌঁছলাম। মেমসাহেব ট্রেনে বেশ একটি কথা বলিলেন। জ্যোতিষদাদা মার কথা যখন মেমসাহেবকে বুঝাইয়া দিতেন, তখন অতি সংক্ষেপেই বলিতেন। বোধহয় মেমসাহেব আর এখন তাহাতে তৃপ্তি হন না। তাই তিনি আজ দাদাকে বলিতেছেন,—“মা এতগুলি কথা বলেন, আর তুমি টুক করিয়া একটু বলিয়া চুপ করিয়া থাক। আমার ইহাতে ভাল লাগেনা।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। বেরিলী পৌঁছাইবার ২।১টা স্টেশন পূর্ব হইতে বেরিলী হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত। কত মালা নিয়া আসিয়াছে। মহারতন, প্রেমরতনও আসিয়াছে। আমরা ধর্মশালায় গেলাম।

রাত্রি প্রায় ১টা অবধি হট্টগোল করিতে করিতে সকলে বিদায় নিল।

১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকাল বেলা হইতে নানা স্থানে মাকে নিয়া ঘোরাঘুরি করিল। হিন্দুস্থানীদের এক মন্দিরে ১৫দিনের জন্ম অথগু নাম স্মরু হইয়াছে, মাকে সেখানে নিয়া গেল। আজ মেমসাহেবকে ধর্মশালায় খাওয়ান হইল। মেমসাহেবকে টেবিল চেয়ারে দেওয়া হইছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বলিলেন, “তা হলে ত হোটেলেই খাইতে পারিতাম। আমি সকলের সঙ্গে মাটিতে বসিয়া খাইব।” তাহাই দেওয়া হইল। পরে মেমসাহেব মার ফটো তুলিলেন। বৈকালে তিনি হোটেলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যায় বাঙ্গালীবাবুরা আসিয়া ধর্মশালায় কিছু সময় কীৰ্ত্তন করিল। পরে সকলে মাকে নিয়া হিন্দুস্থানীদের কীৰ্ত্তন মন্দিরে গেলেন। রাত্রি প্রায় ১২টার দলবল মাকে নিয়া ধর্মশালায় ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ২টার আমরা শুইলাম।

১৭ই বৈশাখ, শুক্রবার।

ভোরে মিসেস্ দীক্ষিত আসিয়া তাহার বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। তিনি নিজেই মোটর চালান; মাকে পাশে বসাইয়া নিয়া গেলেন। এখানে মেয়েরা বেশ স্বাধীনভাবে চলাফেরা

করেন, তাই মাকে নিয়া মেয়েরাই সব বন্দোবস্ত করিয়া নানাভাবে আনন্দ করিতেছেন। কোন রকম সঙ্কোচ নাই। দীক্ষিতের সহিত আরও ২৩জন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। প্রথম দীক্ষিতের বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ভোরে উঠিয়া মার জন্ম একটু খাবার করিয়াছেন, তাই মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। মার ফটো তুলিলেন। পরে একটা বাগানে মাকে মেয়েরা সকলে নিয়া গেলেন। সেখানে মাকে জরির মুকুট দিয়া, জরির পাড়ওয়ালা হলদে রংএর কাপড় চাদর দিয়া সাজান হইল। মাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নানাভাবে মার ফটো তুলিতে চাহিয়াছে। মা দেখিলাম হাসিয়া হাসিয়া ছলে বলে নানারকম ভাবে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল, “আমরা এই ছবি আমাদের নিজেদের কাছে রাখিব”; এ সব বলিতে বলিতে কাহারও চোখে জল। অনেকে মাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। নিজেরা সাজাইয়া নিজেরাই রকমারী করিয়া দাঁড় করাইতে লাগিল, আর আগে হইতে ফটোগ্রাফার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাড়াতাড়ির মধ্যে ফটো তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে পানও চলিতেছে—বাস্তবিকই যেন বৃন্দাবন করিয়া তুলিল। সেখান হইতে ৮১০টায় ফিরিয়া ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় খাওয়ার কথা। তাই সকলে বাধ্য হইয়া এই আনন্দের খেলা শেষ করিয়া ধর্মশালায় ফিরিলেন। তথায় পৌঁছিতেই দেখি গাড়ী নিয়া ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী হাজির। তিনি একান্তে মার

সহিত কথা বলিবেন। তাই মাকে নিয়া গেলেন। তথা হইতে ফিবিয়া ১০।০টায় ইন্কমট্যাক্স অফিসার অবতার কৃষ্ণের বাড়ী গেলেন। দীক্ষিতের স্ত্রী আসিয়া গত কল্যই অনেক অনুন্নয় বিনয় করিয়া রাজি করাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি একটু খাবার বোগাড় করিয়াছেন। তথা হইতে প্রায় ১টায় মা ফিরিলেন। ভোগ হইল। আজ এক বাড়ী হইতে মার ভোগ দিয়াছে, সকলেই প্রসাদ পাইল। খাওয়া দাওয়ার ভীড়ে প্রায় ৫টা বাজিল। ৫।০টায় বিহারীলালের বাড়ী যাওয়ার কথা পূর্বেই স্থির হইয়াছে। ঠিক ৫।০টায় তাহারা মাকে নেওয়ার জন্ত ৩৪খানা মোটর নিয়া উপস্থিত। দলবল সহ মাকে বিহারীবাবুর বাসায় নেওয়া হইল।

মেমসাহেবও সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তাহার থাকিবার জন্ত এখানেও হোটেল ঠিক করা হইয়াছে। বিহারীবাবুর বাসায়ও মাকে কৃষ্ণ সাজান হইল। মেয়েদের গোপিনী সাছাইয়া ফটো তোলা হইল। পরে মেমসাহেব মাকে জড়াইয়া ধরিয়া একখানি ফটো তুলিলেন। ভোলানাথের অনুগ্রহেই এইরূপ ফটো তুলিতে তিনি সাহসী হইলেন। তিনি ইহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর একখানি ফটো তুলিলেন, তাহাতে মেমসাহেব হাতজোড় করিয়া মার পায়ের কাছে হাটুগাড়িয়া বসিয়া আছেন। এখানা মেমসাহেব নিজেই পছন্দ করিয়া করিলেন। কীর্তনের

স্থান অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। পরে অখণ্ডানন্দ স্বামী মার বিভূতি যাহা আপনা আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন। তাহার মৰ্ম্মার্থ এই যে—মার প্রতি একলক্ষ্য হইয়া থাকিতে পারিলে মনের ময়লা অতি সহজেই কাটিয়া যায়। ইহা তিনি অনুভব করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে হরিরামও কিছু বলিলেন। সে মাকে দেখিতে আসিয়াছে। মার ১০ মিনিটের উপদেশের কথা সেই সকলকে জানাইয়া দিল। অনেকে মহানন্দে তখন সেই কাজ নিয়মিতরূপে করিবেন বলিয়া নাম লিখাইয়া দিলেন। নাম লিখাইবার উদ্দেশ্য মার আদেশে যাহারা ১০ মিনিটের সাধন নিয়াছেন, তাহাদের আত্মার উন্নতির জন্ম প্রতি বৎসর জন্মাৎসবের দিন (তিথিতে) যজ্ঞে তাহাদের নামে আহুতি দেওয়া হয়। পরে মেমসাহেবও ইংরাজিতে একটু বলিলেন। হরিরাম তাহা হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া মেয়েদের বুঝাইয়া দিল। তাহার মৰ্ম্মার্থ এই—“আমি সাধু সন্ন্যাসী দেখিবার জন্মই ভারতবর্ষে আসিয়াছি।

যেখানেই যাহার বিশেষ নাম শুনিয়াছি, আমি দেখিতে গিয়াছি। সেইসময় আমি পণ্ডিত্যরীতে প্রথম অরবিন্দ ঘোষের নিকট মায়ের নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম উৎসুক হই। কিন্তু কোনই খবর পাইলাম

না ; কোথায় তাঁহাকে খোঁজ করিব, তাহাই বুঝিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে আমি কলিকাতা বাই। সেখানে মায়ের নাম শুনলাম, মায়ের ঠিকানাও পাইলাম—তিনি নৈনিতাল আছেন। আমি নৈনিতাল আসিয়া মাকে দর্শন করি। দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি এমন সুন্দর মূর্ত্তিই আর দেখি নাই। আমার মনে হয় তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য আসিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ হইলেই চলিয়া বাইবেন। আমি জানি ইনিই আমার একমাত্র মা। আমি তোমাদেরই একজন বোন। কারণ আমাদের একই মা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি হিন্দি বা বাংলার কিছুই জানিনা। কাজেই আমি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখিত। মার সম্বন্ধে তোমাদের সহিত কোনই কথা বলিতে পারিতেছি না। মা অন্তরের সব কথাই বোঝেন এবং তাঁর প্রতি একলক্ষ্য হইয়া থাকিতে পারিলে অন্তরেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়—ইহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি আর আমার মনে হয়, কেহ যদি আমার মত মাকে স্থিরভাবে চিন্তা করিতে পারে, তবে সকলেই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। আমি ভারতেই থাকি বা ইংলণ্ডেই থাকি বা আমেরিকাতেই থাকি—আমার বিশ্বাস মার সহিত আমার বিচ্ছেদ কখনই হইবে না।

আমার শেষ কথা মার চিত্র সর্বদাই আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।” রাত্রি প্রায় ১০টার আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া

আসিলাম। সেখানে বাঙ্গালী ছেলেরা আসিয়া কীর্ত্তন শুরু করিয়াছে। মেমসাহেবও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। আমরা আজ রাত্রি ৪টার গাড়ীতে জামসেদপুর যাইব। মেমসাহেব হৃষিকেশ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় হরিরামের সঙ্গে তাহাকে রাত্রি ১১টার গাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। রাত্রি ১১টায় পুনঃ পুনঃ মাকে প্রণাম করিয়া সকলের নিকট বিদায় নিয়া মেমসাহেব রওনা হইয়া গেলেন। তখন বিহারীবাবুর বাসায় মাকে মেয়েরা আরতি করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর গান করিয়া মায়ের স্তুতি করিতেছিল। তখন চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া মেমসাহেবও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভাষা না বুঝিলেও ভাবটী নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন। মা আজ চলিয়া যাইবেন, তাই অনেক লোকই আসিয়াছেন।

একটি এ্যাডভোকেট আজই মাকে প্রথম দেখিয়াছেন, তিনি মুগ্ধ হইয়া মাকে দেখিতেছেন, তারপর আমার কাছে মার একটি ফটো চাহিয়া বলিলেন, “মার এই চিত্র প্রাণে লাগিয়াই আছে; তবুও সংসারের ছায়ায় যদি তাহা ঢাকিয়া ফেলে, তাই একখানা ছবি চাহিতেছি।” রাত্রি প্রায় ২টায় অনেকে বিদায় নিলেন। অনেকেই মার কাছে মাটিতে পড়িয়াই একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—রাত্রি ৪টায় মাকে উঠাইয়া দিয়া বাড়ী যাইবেন। রাত্রি ৩টায় সকলে

মাকে নিয়া স্টেশনে আসিলেন। ৪টায় সকলকে কাঁদাইয়া
মা জামসেদপুরে রওনা হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায় :

—ঃঃ—

১৮ই বৈশাখ, শনিবার।

ভোরে লক্ষ্মী গাড়ী পৌঁছিতেই অনেকে মাকে দর্শন করিতে
আসিলেন। মানিক একমাসের ছুটি নিয়া আমাদের সঙ্গে
চলিল। বেলা ১২টায় ফয়জাবাদে গাড়ী পৌঁছিল। দলে
দলে কাশ্মিরী স্ত্রী-পুরুষ মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে।
ডিম্বীক্ট জজ, এ্যাডিশনাল জজ, সপরিবারে সবাই আসিয়াছেন।
ইহারা পূর্বে ধর্মের ধারও ধারিতেন না। কিন্তু মার সঙ্গে
দেখা হওয়ার পর কি পরিবর্তন !
জামসেদপুর যাত্রাপথে। আজ এই রৌদ্রের মধ্যে স্টেশনে
লক্ষ্মী ও কানী। আসিয়াছেন। কত মালা, কত ষড়্

করিয়া মার জন্ম তৈয়ার করিয়া আনিয়াছে। তাহাদের এই ভক্তি আবেগ দেখিবার জিনিষ, অনুভব করিবার বিষয়। তাহাদের চোখে জল, মুখে হাসি। কেহ কেহ মার সঙ্গেই চলিয়া আসিতে চায়। বাক, সকলকে বুঝাইয়া মা শান্তি দিলেন। বথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মার চরণ স্পর্শ করিয়া নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া সকলে ছলছল চোখে দাঁড়াইয়া রহিল। মার জন্ম তারিখ ১৯শে বৈশাখ হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ চতুর্থী পর্য্যন্ত ঢাকায় অথগু কীর্তন চলিবে। ইহারা জন্ম-তিথির দিন অথগু কীর্তন রক্ষা করিবে বলিয়া তিথি লিখিয়া লইল। সকলেরই অনুরোধ, ফিরিবার পথে মা যেন একবার এখানে পদার্পণ করিয়া যান। এটার গাড়ী কাশী পৌঁছিল। সেখানেও বাচ্চু, বাচ্চুর মা, নেপাল দাদা, কৃষ্ণা মা, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি ফৈশনে আসিয়াছেন। বাচ্চুর মা, মা গরমে বাইতেছেন বলিয়া, কত যত্নে নানারকম সরবত তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। ইহারা মোগলসরাই পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আবার ছলছল চোখে সব বিদায় নিলেন। এইভাবে জগজ্জননী মা ভক্তদের মনের বাসনা পূর্ণ করিতে করিতে চলিলেন।

১৯শে বৈশাখ, রবিবার।

প্রাতে হাওড়া ফৈশনে গাড়ী পৌঁছিতেই ভীড় জমিয়া গেল। ২১৩ ঘণ্টা ফৈশনে থাকিয়াই মা জামসেদপুর রওনা

হইবেন। আমাদের সঙ্গে আলমোড়া বাসিনী একটা স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। তাহার নাম গোদাবরী। কাহারও কথায় তিনি মার সঙ্গে ছাড়িলেন না। কাশী হইতে শঙ্করানন্দ আসিয়াছেন। স্টেশনে মার জন্ম সকলে জলখাবার আনিয়াছে। মাকে ও সঙ্গীয় সকলকেই খুব যত্ন করিয়া তাহারা খাওয়াইয়া দিলেন। দিলীপ রায় আজ মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মার সহিত কিছু সময় আলাপ করিয়া বিদায় হইলেন। মা ফিরিয়া আসিলে গান শুনাইবেন বলিয়া

গেলেন। যথাসময়ে আমরা জাম-
হাওড়া স্টেশন হইয়া জাম-
সেদপুর আগমন।

যতক্ষণ পারে সকলে মার গায়ের

কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী ছাড়িলেও যতক্ষণ দেখা যায় সকলে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈকালে জামসেদপুর পৌঁছলাম। সমবেত ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনী দিল। আজ ১৯শে বৈশাখ। স্থানে স্থানে মার জন্মোৎসব আজ শুরু হইয়াছে। এখানেও ভক্তেরা মিলিয়া একটা স্থানে মায়ের জন্মোৎসব করিতেছে। মাকে প্রথমে সেখানেই নিয়া গেল। সুন্দর ভাবে উৎসবের স্থান সাজান হইয়াছে। মার নানাভাবের ছবি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মা পৌঁছিতেই স্ত্রীলোকেরা হলুধরী ও শঙ্খধ্বনী করিয়া মাকে বরণ করিয়া নিল। মাকে বসাইয়া সকলে মার ও ভোলানাথের চরণে অঞ্জলি দিতে লাগিল। ভোগের আয়োজন হইয়াছে—বহুলোক প্রসাদ পাইল। মার ভোগ

হইয়া গেল। মা পৌঁছিবার মিনিট ১০।১২ পরই হঠাৎ ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সাজান স্থান ওলাট-পালট করিয়া দিয়া গেল। কিছু পরেই আবার সব পরিষ্কার হইয়া গেল। সকলে বলিল—“মা তুমি আসিতে না আসিতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।” মা হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা সকলে আনন্দ করিতেছ, ঝড়-বৃষ্টিও একটু সেই আনন্দে যোগ দিতে আসিয়াছে।” সন্ধ্যার পর ভোলানাথ কীর্তনে নামিলেন ও মাতিয়া লঠিলেন। খুব কীর্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা কালীবাড়ী গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই গেলেন। মার থাকিবার স্থান তথায়ই স্থির করা হইয়াছে। কালীবাড়ীর পূজারী মহাশয় মাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। মা তথায় যাওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় মা শুইলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। আগামীকাল্য নলিনীদত্তের বাড়ীতে মার ভোগ হইবে। এবং অনেকেই তথায় ভোলানাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

২০শে বৈশাখ, সোমবার।

সকালে উঠিবার পর মাকে নলিনীবাবুর বাসায় নিয়া গেল। তথায় অনেকের দীক্ষা হইল। বেলা প্রায় ৪টায় আমরা কালীবাড়ী ফিরিলাম। একটি কাশ্মিরী পরিবার মার খুব ভক্ত; তাহাঁরাই মাকে কালীবাড়ী নিয়া আসিল। বৈকাল ৫টায় তাহাদের বাসায় মাকে নিবে স্থির হইয়াছে।

কালীবাড়ী আসিয়া মা একটু বিশ্রাম করিলেন। বেলা ৫টায় কাশ্মীরী পরিবার আসিল। দ্বীলোকেরা আসিয়াই মাকে ও সঙ্গীয় সকলকে তাহাদের বাসায় নিয়া গেল। সেখানেও মার ভোগের যথেষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া মা কালীবাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

২১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার।

আজ অশ্বিনীবাবুর বাসায় মার ভোগ হইল। মার আকর্ষণী শক্তিতে সকলেই মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কাশীতে এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে ফেশনে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটির সহিত নৈনিতালেই মার প্রথম পরিচয়। তারপর কাশীতে দেখা। ভদ্রলোকটি মার কাছে বড় আসিতেন না। তিনি ধর্মের বড় ধার ধারিতেন না। গতবার কাশীতে একদিন মার কাছে আসিয়াছিলেন; একটু বসিয়াছিলেন; তখন মা নানা কথা বলিতেছিলেন। কি জানি সে সব কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটির কি পরিবর্তন আসিয়াছে। এবার যখন ফেশনে মাকে দেখিতে আসিলেন, তখন নিজেই বলিতেছেন, “মা, নানা বিষয়ে মনটা বড় চঞ্চল থাকে, ভগবানের ইয়াদ বড়ই কম হয়।” মা বলিলেন, “তোমরা নিয়মিত কাজ করিয়া যাও ফল পাইবে।” যাক অশ্বিনীবাবুর বাসায় ভোগের পর বৈকাল ৪টায় মা কালীবাড়ী ফিরিলেন। আজও অনেকে দীক্ষা নিয়াছেন।

তার মধ্যে একটি শিশু মেয়ে ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় ভোলানাথ তাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন। বৈকালে ৬।০টায় মাকে রাম মন্দিরে হিন্দুস্থানিয়া নিয়া গেল। বাঙ্গালী হিন্দুস্থানি সকলেই তথায় সমবেত হইলেন। খুব কীর্তন হইল। কীর্তনান্তে আবার মাকে নিয়া সকলে কালীবাড়ী ফিরিলেন। অনেক রাত্রি অবধি সকলে বসিয়া বসিয়া মার মুখের বাণী শুনিলেন। আগামীকাল্য প্রাতে দশটার গাড়ীতে মার কলিকাতা ফিরিবার কথা। তাই সকলেরই প্রাণে একটা ব্যথা। আবার কবে মাকে পাইবে এই ভয়। ডাক্তার বতীশবাবুর স্ত্রী রুগ্ম শরীর নিয়া প্রায় সব সময়েই মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন। সেবার সব বন্দোবস্ত করিতেছেন। অত্যাণ্ড অনেকেই মার সঙ্গীয় সকলের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য খুবই যত্ন নিতেছেন। রাত্রি প্রায় তিনটায় আমরা শুইলাম।

২২শে বৈশাখ, বুধবার।

আজও অনেকে দীক্ষা নিবেন। হরিহরবাবুর বাসায় তাহাদের দীক্ষা হইবে। এবং সেখানেই মার ভোগ হইবে। সেখান হইতেই ষ্টেশনে যাওয়া হইবে। ৩।৪ জনের দীক্ষা। পরে তাড়াতাড়ি ভোগের পর মাকে সকলে ষ্টেশনে নিয়া চলিল। সেখানে আসিয়া মা এক কাণ্ড করিলেন। হরিহর-বাবুর বাসার কাছেই আরও ২।৩টি বাসা। তাহারা মার

কাছে আসেও নাই মাকে ডাকেও নাই, কিন্তু মা ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া তাহাদের দরজার গাছতলায়ই দাঁড়াইয়া বলিলেন, “এ জায়গাটিতে বেশ ঠাণ্ডা আছে। এখানেই বসি।” আমরা সেখানেই জায়গা করিয়া দিলাম। নিকটেই একটা পেঁপে গাছ ছিল—সেদিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঐ দেখ একটা পেঁপে রং ধরিয়াছে, এমনি ভিতরে পার্কিলে বাইরেও রং ধরে।” কিছু সময় সেই বাসায় থাকিয়া মা উঠিয়া হরিহরবাবুর বাসায় আসিয়া বাইরেই বসিলেন। একটু পরেই পাশের বাড়ী হইতে গাছের পেঁপে কাটিয়া মার জন্য নিয়া আসিতেছে। মা হাসিয়া বলিলেন—“আমাকে না দিলেও আমি এখনই গিয়া নিয়া আসিতাম। সকলেই যে আমার বাবা; সব নিয়াই আমার একটা বাবা।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাক, স্টেশনে বহু লোক চলিলেন। কাশ্মিরী পরিবারটি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। তাহার একটি মেয়ে, নাম কৃষ্ণা বি, এ পড়ে। সে স্টেশনে মার ও ভোলানাথের এবং আমাদের ফটো নিল। যথাসময়ে মা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু গাড়ী ছাড়েনা, খবর পাওয়া গেল এঞ্জিন খারাপ হইয়া গিয়াছে। সকলেই মাকে বলিতে লাগিল “মা—তোমার কৃপা, তাই একটু বেশী সময় দর্শন দিতেছ।” ভয়ানক রোদ্দ, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে বলিয়া সেই রোদ্দের মধ্যেই মার

জামসেদপুর হইতে
কলিকাতায় আগমন।

আমাদের ফটো নিল। যথাসময়ে মা
গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু গাড়ী
ছাড়েনা, খবর পাওয়া গেল এঞ্জিন

খারাপ হইয়া গিয়াছে। সকলেই মাকে বলিতে লাগিল “মা—
তোমার কৃপা, তাই একটু বেশী সময় দর্শন দিতেছ।” ভয়ানক
রোদ্দ, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে বলিয়া সেই রোদ্দের মধ্যেই মার

মুখের দিকে চাহিয়া সকলে দাঁড়াইয়া আছে। এক ডাক্তারের মা বুদ্ধা। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত ভাবে আদর করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, “তুমি আসিবে শুনিয়াই আমি বলিতেছিলাম,—আবার আসে কেন? জ্বলাইতে আসিতেছে বুঝি? এক একবার আসিয়াত মা শুধু আগুন জ্বলাইয়া দিয়া যাও।” মাও হাসিয়া বলিলেন,—“আগুন যে ভাল করিয়া জ্বলে না মা। ঠিক জ্বলার মতন জ্বললে যে সব ভয় হইবে আর জ্বলা জ্বলির প্রশ্ন থাকিবে না।” এই বলিয়া শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছেন,—“তোমাদের যে জ্বলানই কাজ। সব দেশই জ্বলাইতেছ।” প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ী দেরী হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি হাসিয়া মাকে বলিলাম,—“গাড়ীত দেরী হইল; ইহারা বলিতেছে মার কৃপা, কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছিতেও ত গাড়ী দেরী হইবে—তখন তাহারা বলিবে আমাদের উপর মার কৃপা কোথায়?” মা শুধু হাসিলেন। কিছু বলিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন। যখন গাড়ী হাওড়া পৌঁছিল, তখন শুনিলাম, গাড়ী ৫ মিনিট পূর্বে পৌঁছিয়াছে।” ৫টায় হাওড়া পৌঁছিলাম। অনেকেই ফেশনে উপস্থিত ছিলেন। এখানে যতীশ গুহদের বাড়ীতে মার জন্মোৎসব ১৯শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাকে নিয়া সকলে তথায়ই গেলেন। সন্ধ্যায় আরতি হইল। রাত্রি প্রায় ৮টার কীর্তন আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ১২টার আমরা

বিলার শিব মন্দিরে গেলাম। অনেক লোক সঙ্গে সঙ্গে গেল, রাত্রিতে মার কাছে থাকিবে। শিবের বারান্দা ভরিয়া বিছানা পড়িল। দিল্লী হইতে নরেনবাবু, শ্রীরামপুর হইতে ত্রিগুনাবাবু, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ২১০টার সকলে শয়ন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় :

—: * :—

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকালে যতীশ গুহদের বাড়ী যাকে নিয়া গেল। সেখান হইতে প্রাণকুমার বাবুর বাসায় নিয়া গেল। সেখানে একজনের দীক্ষা হইল। সকলে সেখানেই মিলিলেন। ইং ১০ই, বাংলা ২৭শে রাত্রিতে কলিকাতা ছাড়িবার কথা। দুপুর বেলা সেখান হইতে যতীশ গুহদের বাসায় আসিয়া আসিয়া ভোগ হওয়ার পর আবার মা প্রাণকুমার বাবুর বাসায় গেলেন। কারণ প্রাণকুমার বাবু কি একটা স্বপ্নে

দেখিয়াছেন, মার সঙ্গে একান্তে তাহার মীমাংসা করার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। আমরা ২৩ জন সঙ্গে গেলাম। তথায় কথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাটার ২জন বিশিষ্ট লোককে নিয়া যতীশগুহ মার কাছে গেলেন। তাহারা বহুক্ষণ মার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গতকল্য এক ‘মাকে’ নিয়া (ইনি গেরুয়া বস্ত্রধারী) কয়েকজন ভদ্রমহিলা তাঁহাকে নিয়া আসিয়াছেন। মার স্বাভাবিক স্বভাব বাহ্য তাহাই করিলেন। তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইয়া নিজে প্রায় মাটিতেই বসিলেন। “এষে আমার মা,” বলিয়া সকলকে দেখাইয়া দিতেছেন। মাকে প্রণাম করিতে গেলেই—“আমার মাকে প্রণাম করিলেই হইবে,”— বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছেন। তিনিও খুব যত্নে মাকে জড়াইয়া ধরিতেই মা তাহার কোলে শুইয়া পড়িলেন। এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাসায় তিনি থাকেন (ক্ষেত্রী), সেই বাসায়ই একটা স্থানে সৎসঙ্গ হয়। মেয়েরা মিলিয়া করেন। মাকে আজ তথায় নিয়া বাওয়ার কথা। কাল তাহারা বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন আজ তাহারা মাকে নিতে আসিয়াছেন। আমরা কয়েকজন মার সঙ্গে চলিলাম। গিয়া দেখি প্রকাণ্ড একটা হলে অনেক মেয়েরা বসিয়াছেন। যোগবাশিষ্ট পার্শ্ব হইল পরে ভজন হইল। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া আমরা যতীশ গুহদের বাসায় আসিলাম। আজ সন্ধ্যা ৭টার দীনে ঠাকুর আসিয়া মাকে কীর্তন শুনাইবেন কথা আছে। মা

আসিবার পর দীনেশঠাকুর আসিয়া পৌঁছিলেন। বতীশ দাদাদের হলে লোক ধরেন। বলিয়া জন্মোৎসবের জন্ত তাহারা একটা প্যাণ্ডেল তৈয়ার করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতেই তথায় কীর্তন আরম্ভ হয়। কোনদিন দীনেশ ঠাকুর, কোনদিন মন্থনাথ নাথ, কোনদিন নিবারণ সমাজপতি প্রভৃতি আসিয়া কীর্তন করিতেছেন। রাত্রি ১২টা ১২।০টা পর্যন্ত কীর্তন হয়। তারপর মাকে হলে নিয়া যাওয়া হয়। তথায়ও আনন্দ উৎসবে বহুক্ষণ কাটিয়া যায়। রাত্রি প্রায় ২টা ২।০টায় শিবমন্দিরে ফিরিয়া আসা হয়। আজও তাহাই হইল। সন্ধ্যার সময় বতীশদাদাদের হলে মাকে বসাইলেন। প্রত্যহ ছবির কাছে আরতি হয়। আজ মা স্বশরীরে তথায় উপস্থিত। তাহাদের এতদিনের সাধনা সফল হইল। আজ মাকে দ্বিতীশদাদার মেয়ে আরতি করিল। প্রতিদিনের মত একটু ভজন হইল। দিলীপ রায় তাহার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু নিয়া মার কাছে আসিয়াছেন। মার গলায় মালা স্তম্ভাকার হইলে খুলিয়া সকলকে দেওয়া হয়—আজও তাহা হইতেছে। কখনও কখনও মা নিজ হইতেও কাহাকেও কাহাকেও মালা পরাইয়া দেন। মা দিলীপ রায়কে মালা পরাইয়া দিলেন; তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন। সংজ্ঞাদেবী আসিয়াছেন। দিলীপ রায়কে বলিলেন,—“মাকে একটু কীর্তন শুনাইয়া যাও।” তিনি রাজি হইলেন। আরতির পর লোকের অসম্ভব ভীড় দেখিয়া মাকে প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া

হইল। দিলীপ রায় ২৩টা গান করিলেন। দীনেশঠাকুরও অনেক গান করিলেন। একটা গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া নিবারণ সমাজপতি দীনেশঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলেন। পরে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীও কীর্তন করিলেন। ১২টার কীর্তন শেষ হইলে মাকে ভোগ দিবার জন্য ষষ্ঠীশদাদাদের হলে নিয়া যাওয়া হইল। হলটা বাস্তবিকই যেন “মার মন্দির।” এ বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রত্যহই এখানে মার নাম কীর্তন, মার আরতি, ভোগ ইত্যাদি করিয়া মার স্মৃতিতে ঘরটা যেন পবিত্র দেব-মন্দির করিয়া তুলিয়াছে। তাই বোধ হয় জগজ্জননী আর কোন ঘরে কোন বাসায় না গেলেও এই ঘরটাতে আসিয়া বসেন। গত কয়েকবার আর আসেন নাই। আবার এবার ভক্তবৎসলা ভক্তের আহ্বানে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। রাত্রি ১২টার মার ভোগ হইয়া গেল। ভ্রমর গিয়া এককোণে বসিয়া মেয়েদের নিয়া নাম ধরিল। মাও হলে খরতাল (পাঞ্জাবীরা দিয়া গিয়াছে) বাজাইতে আরম্ভ করিতেই উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আবার নামে মাতিয়া উঠিলেন। আনন্দময় পুরুষ ভোলানাথও এই দলে যোগ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা অবধি চলিল। পরে মন্দিরে ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক। সকলেই শিবের বাঁরান্দায় মার পাশে শয়ন করিবার আশায় আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৩টার সকলে শয়ন করিলেন।

২৪শে বৈশাখ, শুক্রবার।

বেলা প্রায় ৭টার মাকে যতীষদাদাদের বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। কারণ ভোরে তাহারা হলে মার প্রতিমূর্তির কাছে বসিয়া নাম করার পরে মার স্তোত্রাদি পাঠ করা হয়, সেই সময় মা উপস্থিত থাকেন, এই তাহাদের আন্তরিক কামনা। প্রায় ৯টা অবধি তথায় থাকিয়া আবার মা মন্দিরে আসিলেন। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের মেয়ে, নেপালের রাজ-পরিবারের পুত্রবধু মার কাছে আসিয়াছেন। ইহারা স্বামী-স্ত্রী সর্বদাই মার কাছে আসেন। তাহারা মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিতে বসিলেন। তারপর সি আর দাশের স্ত্রী ও কন্যা অপর্ণা দেবী মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসিতেছেন।

প্রফেসার, উকিল, মুন্সেফ কত আসিতেছেন। কেহ কেহ ভাবের আবেগে কাঁদিতেছেন। সকলেই নিজের নিজের মোটরে মাকে নিবার জন্ম কতই না আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহারা সকলেই প্রায় প্রথম প্রথম আসিয়া মার সঙ্গে নানাভাবে আলাপ আরম্ভ করেন; নানা প্রশ্ন করেন। পরীক্ষা করিয়া নিবার ভাবটা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু শেষে আর কাহারও সেই ভাবটা থাকেনা—সকলেই মার কথায় ও দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া মার কাছে শরণ নিয়াছেন। গতকল্য মা যখন রাত্রি ১২টায় যতীষদাদাদের হলে কীর্তন

আরম্ভ করাইলেন, তখন হাইকোর্টের একটি উকিল ভাবাবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে হাতজোড় করিয়া মার দিকে চাহিয়া চণ্ডী হইতে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। মাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন। নরেশবাবু প্রফেসার মার কাছে এইবার প্রথম আসিয়াছেন। তিনিও প্রথম প্রথম অনেক কথা বলিতেছিলেন, আজ ২দিন যাবৎ চোখের জলই পড়িতেছে। আজ বলিতেছিলেন,—“মা! তোমার এইরূপ মানুষ খাওয়া বিছা কবে হইতে হইল?” মা হাসিয়া বলিলেন—“একজন বলেছিল, গুরুমারা বিছা—তুমি আবার বলিতেছ মানুষ খাওয়া বিছা।” আমার দিকে মা চাহিয়া বলিলেন,—“শুনিয়াছ ত কি বলিতেছে? আমার বলে মানুষ খাওয়া বিছা আছে।” আমি বলিলাম,—“কতটা খাইয়াছেন।” ভদ্রলোকটি বলিলেন,—“সবটাই গিলিয়া ফেলিয়াছেন।” মা বলিলেন—“সবটা খাইলে আর কথা থাকিতনা। তখন নীরব হইয়া যায়।” আমি বলিলাম, “মা বলেন মৌল আনা না হইলে কিছুই হয় না। খাওয়া এখনও পুরাপুরী হয় নাই—এতটুকুতে মার হয়না।” সকলেই এ কথায় হাসিলেন, মাও হাসিয়া উঠিলেন। যাক আজ দুপুরে আবার মা ভোগে যতীশদাদাদের বাড়ী গেলেন। উৎসব উপলক্ষে বহুলোক প্রসাদ পাইতেছে। শচীবাবু এই উৎসবে অনেক খরচ দিতেন, অল্প বয়সে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আর

বিবাহ করেন নাই। বুঝা মা আছেন। পরিবারে অনেকেই আছেন। ইনি ইনকমট্যাক্স এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের পদে আছেন। ইনি বলেন—“৪৯ বৎসর বয়সে মার সহিত দেখা হয়—আজ ৫২ বৎসর বয়স। ৪৯ বৎসর বয়সে কত পড়িলাম কত দেখিলাম, তাহাতে জীবনে যে উন্নতি না হইয়াছে, আজ ৩ বৎসর মার সঙ্গ করিয়া তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; মার সঙ্গে যে কত প্রভাব তাহা বলিতে পারি না। আমি তাহা খুবই অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি।” মা সকলের ভাবেই যোগ দিতে পারেন তাই সকলেই মার কাছে রস পায়—সঙ্গ করিতে সকলেই আনন্দ পায়। আজ যতীশদাদাদের বাড়ী ভোগের পর মা বৈকালে সুরেশবাবুদের বাসায় গেলেন। মা যখনই যেখানে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ মোটর ভর্তি লোক যাইতেছে। কারণ অল্প সময়ের জন্তও কেহ সঙ্গ ছাড়িতে রাজি নয়। সুরেশবাবু চৌতালার উপর মার জন্ত একটু স্থান রাখিয়াছেন সেখানেই আনন্দোৎসব চলিল। সন্ধ্যার পর আবার মা প্যাণ্ডেলে আসিয়া বসিলেন। ব্যারিস্টার শরৎবাবু প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বহু লোক একত্র হইয়াছে। ভীড়ের জন্ত দাঁড়াইবার উপায় নাই। মাকে একখানা চৌকির উপর বসান হইয়াছে। সেই চৌকিখানার চারিদিকেই বিশেষ ভীড়। অনেক চেয়ারও সেখান হইতে

লোক সরান যাইতেছে না। ব্রজেন্দ্রবাবু এবং আরও অনেকে কীৰ্ত্তনাদি করিলেন। কীৰ্ত্তনের পর রাত্রি ১১টায় মাকে হলে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে আবার কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। এইভাবে লীলা আনন্দে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত থাকিয়া মা মন্দিরে ফিরিলেন। বহুলোক একখানি চাদর কি একখানি সতরঞ্চি কি একখানি মাদুর নিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সকলেই গিয়া মন্দিরের বারান্দায় মার কাছে স্থান নিল। রাত্রি প্রায় ৪টায় সকলে শয়ন করিল।

২৫শে বৈশাখ, শনিবার।

সকালে ষষ্ঠীশ গৃহদের বাড়ী মাকে নিয়া গেলেন। সেখানে হলে প্রভাতের কার্য—কীৰ্ত্তন ও স্তোত্রাদি পাঠ আরতি হইল। পরে বাল্যভোগ হইল। মাকে আজ ভ্রমর তাহাদের স্কুলে নিয়া যাইবে স্থির হইয়াছে। বেলা প্রায় ৮টায় বহুলোক সঙ্গে মা স্কুলে চলিলেন। সেখানে পৌছিতেই ফুলের মালা প্রভৃতি গিয়া মেয়েরা মায়ের অভ্যর্থনা করিল। পরে কীৰ্ত্তন, স্তোত্র, পাঠাদি হইল। মা মেয়েদের মধ্যে বসিয়া পড়িয়াছেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ মায়ের আগমনে স্কুল ধন্য হইল বলিয়া খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। মেয়েদের একটু কিছু উপদেশ দিয়া যাইবার জন্ম সকলেই মাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মা তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—“আমি ত কিছু জানি না, তবে

আমি ভোমাদের কাছে এই ভিক্ষা চাই, ভোমরা যেমন নিয়মিত লেখাপড়া শিক্ষাকর ভেমন একটু একটু ভগবানের নাম নিও। তাহাতে আনন্দ ও শান্তি বাড়িয়া যায়।” ১০ মিনিটের নামের কথাও একটু বুঝাইয়া বলিলেন। বেলা প্রায় ১০।০টায় আমরা স্কুল হইতে কুমার সুরেশ সিংহের বাড়ী এবং আরও ২।১ বাড়ী হইয়া মন্দিরে ফিরিলাম। আজ বেলা ১১টায় দিলীপ রায় মার সঙ্গে একান্তে দেখা করিতে আসিবেন। মহেন্দ্র সরকারও মার সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলিতে আসিবেন। আমরা মন্দিরে পৌঁছাইবার একটু পরেই দিলীপ রায় ২।১ জনকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। তিনি বলিতেছেন—“আপনাকে দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে।” তিনি সোমবার প্রাতে এই মন্দিরে আসিয়া মাকে গান শুনাইবেন বলিয়া গেলেন। বলিতেছেন—“বাড়ী বাড়ী গান অনেক করিয়াছি। এই সুন্দর স্থানে বসিয়া মাকে একদিন গান শুনাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।” অনেকক্ষণ মার কাছে বসিয়া রহিলেন। তিনি উঠিতেই মহেন্দ্রবাবু সপরিবারে আসিয়া মার কাছে বসিলেন। তার সঙ্গেও অনেক কথা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। মহেন্দ্রবাবু খুবই আনন্দিত হইলেন। আগামীকাল্য আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন। বেলা প্রায় ২টায় মাকে ভ্রমরদের বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। আজ সেই বাড়ী মায়েস ভোগের আয়োজন হইয়াছে। উঠানের মধ্যে একটু ছায়া করা হইয়াছে—মার বসিবার জন্ত। বেলা

প্রায় ৬টার ভোগের পর তথা হইতে মাকে আরও কয়েক বাসায় নিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৮।০টার মা বতীশদাদাদের বাড়ী পৌঁছিলেন। নিবারণ সমাজপতি ও ব্রজেন্দ্রবাবু কীর্তন করিলেন। প্রতিদিনের মত আজও রাত্রি প্রায় ১২।০ টায় কীর্তন শেষ হইল, পরে মাকে হলে নিয়া যাওয়া হইল। আজ মিনু (প্রাণকুমার বাবুর ছোট ছেলে) এবং মেয়েরা একত্র হইয়া ফুলের মুকুট ও ফুলের অগাণ্ড গহনা দিয়া মাকে সাজাইল। পরে চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কীর্তন আরম্ভ করিল। মাও তাঁহার নূতন পাওয়া খরতাল নিয়া “জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ” নাম উঠাইলেন। মহানন্দে সকলে সেই ফুলের সাজে সজ্জিতা দেবীমূর্তির দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইল—আবার সেই মধুর কণ্ঠের নাম শুনিয়া আরও মুগ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে বিভোর হইয়া সকলেই নাম করিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রি ২টা অবধি তথায় কাটাইয়া সেই ফুলের সাজেই মাকে মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল। নরেশ চক্রবর্তী (প্রফেসর) এবং আর একটি বড় ব্যবসায়ী নগেনবাবু এবার নূতন মাকে দেখিয়াছেন। তাহারা মোটর নিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—মাকে নিজের মোটরে নিয়া বাইবে। প্রায় সব সময়ই ইহারা সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

নরেশবাবু বলিতেছেন “দেখুন, আমার খুব অহঙ্কার ছিল—
আমার যে ধর্মের সংস্কার আছে, তাহা কেহ খণ্ডন করিতে

পারিবেনা—কিন্তু মা তাহা সব চুরমার করিয়া দিয়াছেন। আমার যে অবস্থা মা করিয়াছেন, কাজকর্ম করা কষ্টকর। আমি উৎসবে ঢাকা যাইব।” ইনি মার সঙ্গে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এখন চোখে জল লাগিয়াই আছে। আজ রাত্রি প্রায় ৩টায় সকলে বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। উপেন ঘোষের (উকিল) মেয়ে অমলা, ডাক্তার গিরিন্দ্র মিত্রের মেয়ে সাবিত্রী, ইনকম্‌টেক্স কমিশনার, সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা ননী সর্বদাই মার সঙ্গে সঙ্গে আছে রাত্রিতেও তাহারা মায়ের কাছে শুইয়া থাকে। ইহারা কেহই কখনও আত্মীয়দের ছাড়িয়া, নিজেদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া এইভাবে থাকে নাই, মায়ের এতই আকর্ষণী শক্তি। অভিভাবকেরা আজ ইহাদের এইভাবে ছাড়িয়া দিতে কিছুই চিন্তা করেন নাই, মার সঙ্গে দিয়াছে এই তাহাদের আনন্দ। বাস্তবিকইতো কুলের গৌরব নিয়া বসিয়া থাকিলে আর তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

২৬শে বৈশাখ, রবিবার।

পূর্বের মত বহুলোক সকালে মন্দিরে আসিয়াছেন। বেলা প্রায় ৮টায় মাকে ষতীশদাদাদের বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। আরও ২।৩ বাসায়ও মাকে নিয়া গেল। দুপুরবেলা বিশেষ ভোগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আজ রবিবার, তাই অনেকেই উপস্থিত আছেন। সকালে জনার্দন গোস্ঠ

গাহিল। বেলা প্রায় ১২টা অবধি গোর্ভগান হইল। তারপর অনেক চেষ্টায় মাকে একটু একান্ত করিয়া দেওয়া হইল—অনেকে একান্তে কথা বলিবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা সম্পূর্ণভাবে করা যাইতেছেন। এর মধ্যেই সকলে কথা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ২টার ভোগ হইল। কুমারীরা সব স্নানের কাহে হলে খাইতে বসিয়া গেল। অনবরতই একটা এতবড় জনসঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া বিনা কাজেও অনেকে হায়রাণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মা আমার স্থিরা, ধীরা, আনন্দময়ী মূর্তির একটুও পরিবর্তন নাই। ভোগের পর মাকে প্যাণ্ডেলে নিয়া বসান হইল। বেলা প্রায় ৫টার স্কুলের মেয়েরা আসিয়া মাকে মাথুর গাইয়া শুনাইল। মাথুর শেষ হইতেই মাকে ঢাকুরিয়া পিসীমার বাড়ী নিয়া গেল। সেখান হইতে ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাচরণবাবু (প্রিন্সিপাল) গিরি মহারাজের শিষ্য, তিনি এবং তার আরও কয়েকজন গুরুভাই মাকে নিয়া গেলেন। মার এই অনুপস্থিতিতে পেণ্ডেলের জনসঙ্ঘ অস্থির হইয়া উঠিল। দরজায় মোটরে মোটরে ভরিয়া গিয়াছে। এক বিরাট ব্যাপার চলিতেছে। মা রাত্রি ৯৯৯টা ফিরিয়া আসিলেন। আবার কীর্তন আরম্ভ হইল। আনন্দের একদল আছে তাহারা কালী কীর্তন করে। তাহারা একরকম পোষাকে সকলে সাজিয়া কীর্তন করিতে বসিয়াছে। একটি মা আসিয়াছেন। ইনি নাকি শ্মশানে শ্মশানে থাকেন। মা তাহাকে নিজের কাছে

বসাইয়াছেন। তাহার কমণ্ডলু, ত্রিশূল নিয়া কত কৌতুক করিতেছেন, সর্বশেষে আবার ব্রজেন্দ্রবাবু কীর্তন করিলেন। আজও রাত্রি ১২।১২।১০টার পেণ্ডেলের কীর্তন শেষ হইলে মাকে হলে নিয়া যাওয়া হইল। আজ আবার মার নূতন ফুলের সাজ আসিয়াছে। ফুলের মুকুট, ফুলের বালা, ফুলের অনন্ত, ফুলের হার, পায় ফুলের নুপুর পরাইয়া মাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। মা সেই ছোট খরতাল বাজাইয়া বাজাইয়া সমস্ত ঘর ঘুরিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে নাম করিতেছে। মনে হইতেছে দেবী প্রতিমা বুঝি আজ যতীশদাদাদের ঘরময় ঘুরিতেছেন। সম্মুখেই দেয়ালে মার বড় বড় প্রতিমূর্তি ফুল দিয়া, লাইট দিয়া সাজান রহিয়াছে। যতীশদাদাদের এই ঘরখানিতে জপ করিতে বসিয়া অনেক সময় নাকি মা হাটিতেছেন দেখিতে পান। বাড়ীর সকলে মিলিয়া যে একইভাবে এই ঘরখানিতে মার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ যেন তাহা সার্থক হইল। মা ছেলেদের একটু পরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে মেয়েদের নিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিলেন। মা একজনের হাতে, পাখা, একজনের হাতে পঞ্চপ্রদীপ, একজনের হাতে ধূপ, একজনের হাতে ফুল, একজনের হাতে কাপড় দিয়া সকলকে আরতি করিতে বলিলেন। এই আরতি আরও শোভা বাড়াইয়া দিল। মার যে কতই নিত্য-নূতন লীলার ভাব খেলে আমরা দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছিলাম। লীলাময়ীর লীলার কি কেহ

কখনও শেষ করিতে পারিয়াছে? তাহা যে নিত্য নূতন নূতন ভাবে আসিতেছে। কীর্তন শেষ হইতে মেয়েরা মায়ের জয়ধ্বনি দিল। অমনি মা মুখে আঙ্গুল দিয়া ইসারায় সকলকে চুপ করিয়া বসিতে বলিলেন। এতগুলি স্ত্রীলোক চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিয়া গেল। অমনি মা দরজা খুলিয়া ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন—এবার তোমরা আসিয়া দেখ আমাদের কেমন কীর্তন। ছেলেরা এই সময়টুকুর জন্য মার সঙ্গে ছাড়া হওয়ায় খুব দুঃখ করিতেছিল। এবার দরজা খোলা পাইয়া সকলে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় ওটা বাজে। মা তাড়াতাড়ি সকলকে নিয়া মন্দিরে চলিলেন। বাহার মন্দিরে বাইবেন না, তাহার আহার করিতে বসিবেন। খাওয়া দাওয়া যে সকলের কোথায় গিয়াছে—যুম নাই, এই এক নেশায় চলিয়াছে। যে সব মেয়েরা মার সঙ্গে সঙ্গে আছে—মা মন্দিরে গিয়া বলিলেন—“ইহাদের কিছু ফল দেও।” তাহার ২১টি কলা কি কমলালেবু খাইল—বলিল খাইতে কাহারও ইচ্ছা নাই। এই সব সুখে প্রতিপালিত মেয়েরা যে এইভাবে আছে তাহাতেও তাহাদের কোনরূপ ক্লান্তি নাই। দিনরাত মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। এক শক্তিতে বেন সকলকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। মা বলিতেছেন, “যদি বাস্তবিক এই ভাবটা নিয়া বেশী সময় থাকা যায়, তবে শরীরও ভাল হয়, মনেরও একটা স্থায়ী পরিবর্তন আসে।” রাত্রি ওটায় সকলে শয়ন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় :

—: 0 :—

২৭শে বৈশাখ সোমবার ।

আজ মা বাইশারী রওনা হইবেন । ওটার গাড়ীতে
 যাইবেন । কাজেই ভোরবেলা হইতেই বহুলোক মন্দিরে
 আসিয়াছে । সিন্দুরে মাকে পুনঃ
 কলিকাতা হইতে বাইশারী
 ও বরিশাল যাত্রা ।

পুনঃ লাল করিয়া দিতেছে, মধ্যে
 মধ্যে ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া
 দিতেছি । বেলা প্রায় ৮টায় দিলীপ রায় মাকে গান শুনাইতে
 আসিলেন । সঙ্গে তাঁহার সহোদর ভগ্নী, মামাত ভগ্নী, কাকিনার
 রাজকুমারী এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছিলেন ।
 কিছুক্ষণ গান শুনাইয়া গান বন্ধ করিয়া দিলীপ রায় বলিতেছেন,
 “মা এখন আপনি কথা বলুন । আপনার কথা শুনিতেই
 এরা সকলে আমার সঙ্গে আসিয়াছেন । আপনার কথা
 শুনিতে আমার বড়ই মিষ্টি লাগিয়াছে—তাই আমি ইহাদিগকে
 বলিয়াছি । মা হাসিয়া বলিলেন—“তোমাদের কাণ মিষ্টি
 তাই আমার কথা মিষ্টি শোন ।” মা নিজের স্বাভাবিক শিশুর
 মত হাসিয়া হাসিয়া মিষ্টিভাষায় কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন ।

এক একটি কথা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেছে, সকলে যেন একটা আনন্দের স্রোতের মধ্যে। ঢাকার রেণুকা সেনও আসিয়াছে। তাহার ভগিনী বেরিলীর প্রফেসার দাম গুপ্তের স্ত্রী। বেরিলীতেই মার সহিত বিশেষ পরিচিতা হইয়াছিলেন; তিনি কলিকাতা আসিয়াছেন, তাই বোনদের নিশা মার কাছে আসিয়াছেন। দিলীপ রায় বলিলেন, “মা রেণুকা খুব সুন্দর গায়। তুমি একটা গান শোন।” এই বলিয়া তাকে ডাকিয়া গান করাইতে বসিলেন। ২।১টি গান করিল। আরও একটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী বেশ গায়, সেও মাকে গান শুনাইল। সময় হইয়া যাইতেছে, তবুও কেহ অফিসে যাইতে পারিতেছে না। মুঞ্চ হইয়া বসিয়া আছে। মহেন্দ্র সরকারও সস্ত্রীক আসিয়াছেন, মাকে কাপড় ইত্যাদি দিলেন। দীঘাপাতিয়ার রাণী মার জন্য কাপড়, ফল কত কি নিয়া আসিয়াছেন। জিনিষের দামের জন্য লিখিতেছি—তাহাদের যে আগ্রহ দেখিতেছি—কাপড়খানা মাকে পরাইতে পারিবেন কিনা সেজন্য তিনি কতই না ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছেন। সকলেরই যেন প্রাণটা মা কাড়িয়া নিতেছেন। যদিও শত বাধায় তাহা বন্ধ তবুও যেটুকু নিতেছেন তাহাই আশ্চর্য্য। সব সংসারীলোক নিয়াইতো মার বেশীরভাগ কারবার। কিন্তু সাময়িকের জন্য হইলেও মা এই বন্ধ সংসারীদেরও যেন কোন এক প্রেমের রাজ্যে নিয়া যাইতেছেন। শত সাধনায়ও হয়তো তাহা সম্ভব হইত

না। এক ভদ্রলোক তাহার স্ত্রী তাহার কাছে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা দেখাইতে আনিয়াছেন। আমি পড়িলাম। স্ত্রী স্বামীকে লিখিতেছে—“আমি মাকে যদি আর একবার পাই, তবে কিন্তু মার সঙ্গে চলিয়া যাইব। তখন যে কর্তব্যের দোহাই দিবে তা কিন্তু হইবে না। আমি আর সংসারে থাকিতে পারিবনা। তোমাকে বা তোমার ছেলেমেয়ে কাহাকেও আমার আর ভাল লাগিতেছে না। মা বলিয়াছিলেন ধীরে ধীরে মন শান্ত হইবে। কিন্তু একমাস হইল মাকে ছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এখনও যে এই ভাবেই চলিতেছে। আমি খাইতে, শুইতে মাকেই যেন দেখি। রাক্ষুসী মা আমাকে একটু স্থির থাকিতে দিতেছেন—নিজে সরিয়া গিয়া আমাকে এই যন্ত্রনা দিতেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।” তবেই দেখা যায় এক মাসের পরও মার সঙ্গে প্রবল প্রভাব সংসারীদের উপরেই কি ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। যাক্, দিলীপ রায় বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় ১১টায় সি, আর দাসের স্ত্রী এবং কন্যা অপর্ণাদেবী আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া মাকে কীৰ্ত্তন শুনাইতে আসিয়াছেন। জায়গা হয় না। দিলীপ রায়ের সঙ্গে যারা ছিলেন তাহাদের নিয়া মার নিকট হইতে উঠিয়া গেলে মার কাছে আবার অপর্ণাদেবীর দল কীৰ্ত্তন করিতে বসিলেন। বাসন্তীদেবী মাকে বুকে নিয়া বসিলেন। মা কিছুই খান নাই—বাসন্তীদেবী মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলেন। সুন্দর কীৰ্ত্তন হইল। সময় নাই

বলিয়া বেশী সময় হইতে পারিল না। মা ফিরিয়া আসিলে আবার কীৰ্ত্তন শুনাইবেন বলিয়া দিলেন। অপর্ণাদেবীর স্বামী সুধীরবাবুর অন্ত্রখ। অপর্ণাদেবী বলিতেছেন—“যখনই গুঁর অন্ত্রখ হয় আমি মাকে স্বপ্নে দেখি যেন মা সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা দেখিলেই উঁনি ভাল হইয়া ওঠেন। এবারও আমি মাকে দেখিয়াছি, কাজেই আমার বিশ্বাস এবারও ইনি ভাল হইবেন।” এইসব কথাবার্তার পর আমরা উঠিব দেখিয়া তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। আজও কয়েকজন দীক্ষা নিতেছেন, মাকে কাছে বসিয়া থাকিবার জন্য ভোলানাথ ডাকিয়া পাঠাইলেন। মা গিয়া দীক্ষার ঘরের দরজায় বসিলেন। সেখানেও মার কাছে যত লোক পারিল গিয়া দাঁড়াইল।

ধীরে ধীরে দীক্ষার কার্য শেষ হইল। মাকে প্রাণকুমার বাবু বানায় নিতে আসিয়াছেন সেখানে মার ভোগ হইবে। সেখানে মার ফটো তোলা হইল। প্রাণকুমার বাবুর মেয়ে মাকে দুধ দিয়া স্নান করাইল। পরে আমি স্নান করাইয়া দিলাম। ভোগে মা ও ভোলানাথ বসিলে বহুলোক প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি করিয়া সকলে খাওয়া দাওয়া করিয়া স্টেশনের দিকে চলিল। বাইশারী হইতে গিরিজাবাবুর ভাইপো মাকে নিতে আসিয়াছে। গিরিজাবাবু প্রায় ৪৫ বৎসর বাবত তাহাদের গ্রামে মার একটি আশ্রম করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মা এদিকে না থাকায় আর প্রতিষ্ঠা

করা হয় নাই। এবার তাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দলে দলে সকলে ষ্টেশনে আসিয়াছেন। বখা সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কেহ কেহ স্থির ভাবে পাথরের মত দাঁড়াইয়া মার দিকে চহিয়া রহিল। কেহ কেহ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। বহরমপুর হইতে অবনীবাবু প্রভৃতি আসিয়াছেন। আমরা রাত্রি ৮টায় ষ্টীমারে উঠিয়া ২৮শে মঙ্গলবার ভোরে ছলারহাট পৌঁছিলাম। বেলা ৯টা পর্যন্ত তথায় থাকিয়া আবার ষ্টীমারে চলিলাম। মা বেশী সময়ই শুইয়া আছেন। বেলা ১২টায় আমরা ষ্টীমার হইতে নামিলাম। ষ্টীমার যাতে লাগিতেই “আনন্দময়ীর” জয়ধ্বনি উঠিল। ঢাকা হইতে সুবোধ প্রভৃতি আসিয়াছে। ষ্টীমার হইতে নামিয়া নৌকার প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম। নৌকা লাগিতেই ছেলের দল মার আগমনী সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া মাকে উঠাইয়া নিতে আসিল। মা ও ভোলানাথকে সহ আমাদের নিয়া কীর্তনের দল একটু হাঁটিয়া গিরিজাবাবুদের আশ্রমে পৌঁছিল। গিরিজাবাবু বেশ সুন্দর একখানি কোঠা তৈয়ার করিয়াছেন। এত বৎসর যাবত তিনি কতই আগ্রহে মার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, আজ তাহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইল। মাও ভোলানাথকে তিনি মন্দিরে নিলেন। অনেকক্ষণ কীর্তন চলিল। পরে সকলের আহারের ব্যবস্থা করা হইল। মা ও ভোলানাথের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইলেন। আশ্রমটির পাশেই একটি পুকুর, খোলা জায়গা।

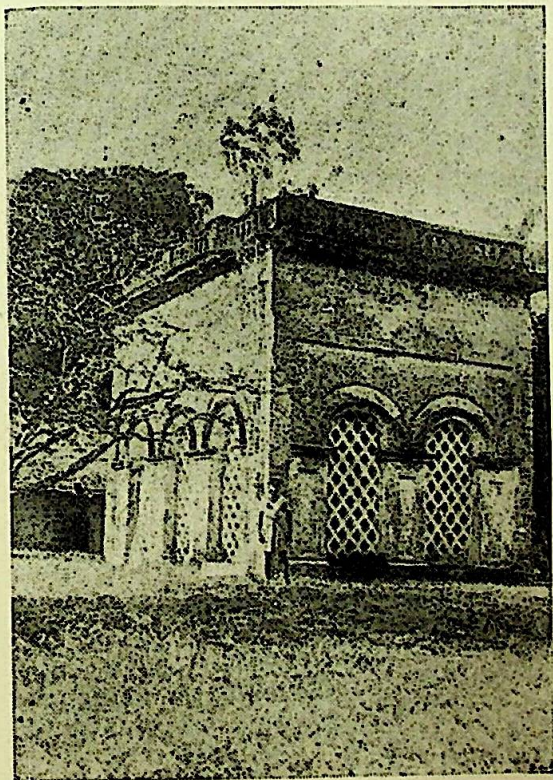
সন্ধ্যার পর আবার কীর্তন আরম্ভ হইবে। দুপুরে মা বসিয়াছেন। ছোট ছোট মেয়ের দল মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কাহারও মার কাছে যাওয়ার উপায় নাই। তাহারা মার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাতে একজন আর একজনকে চুপি চুপি বলিতেছে, “কি সুন্দর কোমল হাত দেখিয়াছ?” মার মাথায় হাত বুলাইতেছে বলিতেছে, “চুল গুলি কি সুন্দর নরম।” সবই যেন তাহাদের কাছে সুন্দর লাগিতেছে।

আমি হাসিয়া মাকে বলিলাম, “তোমার নিকট হইতে ভীড় কমিবে কি করিয়া? তুমি শরীরের স্পর্শ দিয়া, মিষ্টি কথা দিয়া, হাসি দিয়া, চোখের চাহন দিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছ। মানুষ করিবে কি? তবু যে সরিয়া যায় এইতো আশ্চর্য! মা হাসিয়া বলিলেন, “বাঃ, আমি আবার কি করিলাম। আমি কি গায় হাত দিতে বলিয়াছি?” এরপর সকলকে সচ্চিন্দানন্দ খেলায় বসাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময় মা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দলে দলে হিন্দু মুসলমান মাকে দেখিতে আসিয়াছে। কীর্তন হইতেছে, তাই মার সহিত কাহারও কথায় সুবিধা হইতেছেনা—কীর্তনের সময় কথা বলা মা নিষেধ করেন। কীর্তনের পর সকলের সঙ্গে আলাপ হইল। একটি কথা উঠিল, মন ও প্রাণ কাহাকে বলে? মা বলিলেন, “আমিতো বলি গাছ যে বড় হয় এই যে ক্রিয়াশক্তি ইহাই ধর মন—আর যাহাকে আশ্রয় করিয়া

ক্রিয়াশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাই প্রাণ। প্রাণ না থাকিলে ক্রিয়ার প্রকাশ কোথা? মন আছে তাই তোমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে সব দেখিতে পাইতেছ। মনের স্বভাব একটা মেনে নেওয়া আবার না মানা। যা কিছু দেখিতেছ ভোগ করিতেছ—বাসনা কামনা সবই মনের রাজ্যের। স্তব্ধ মনের খেলা। আবার অল্প রকম যেন। প্রাণতো মহাপ্রাণই প্রাণ, তিনিই জ্বরং প্রাণরূপে তিনিই আবার এ সব সর্বরূপে। আমি তো কিছু জানিনা, তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?” কথাবার্তার পর আবার কীর্তন চলিল। গিরিজাবাবু প্রাণপণে মার ও মার সঙ্গীয় সকলের সেবা করিতেছেন। তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন—মার আসিবাব খবর সেই সময়ই পাইলেন। মাকে এই কথা বলায় মা হাসিয়া বলিলেন, “আমরা আসিব বলিয়াই ভগবান তোমাকে বাঁচাইয়া উঠাইয়াছে—নতুবা আমরা আসিব কি করিরা?” খুব আনন্দ চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ১টায় আমরা শয়ন করিলাম।

২৯শে বৈশাখ, বুধবার।

ভোরে মা একটু হাঁটিয়া আসিলেন। আসিয়া আশ্রমের বারান্দায় বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে লোক আসিতেছে। গিরিজাবাবুর ছেলেটি মার কাছে বলিল, “মা, সবইতো ভগবান করেন, তবে আমাদের অপরাধ হয় কেন?” মা বলিলেন, “ভগবানই সব করেন এই কথা বলিবার অধিকার নাই, কারণ,



ঢাকা শাহবাগ আশ্রম ।

বাস্তবিক তো তাহাকে জানো না। তাই কৰ্ম করিতে হয়, কৰ্ম করিয়া করিয়া তাঁহাকে জানিবার অধিকার হয়। যেমন এই শিশু ছেলেকে এম-এ পাশের কথা বুঝাইলে সে কিছুই বুঝিবেনা—শোনা কথা কিছু বলিতে পারে মাত্র।” ছেলেটি বলিতেছে—“আমরা সংকৰ্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও যে পারি না—কি করিব?” মা বলিতেছেন, “এটা সৰ্বদাই খেয়াল রাখিবে। যখন দেখিবে একটা কৰ্ম করিয়া আনন্দ পাইতেছ, তখনই বুঝিবে সেই কৰ্মে আবার কৰ্ম সৃষ্টি করিল। আর যখন দেখিবে একটা কাজ করিতে চাহিতেছনা, হয়তো যে কাজ করিয়া আনন্দ খারাপ বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমাকে সেই কাজ করিতে বাধ্য করিতেছে; তখন বুঝিবে তোমার পূর্বের কৰ্মের এমন কোন সংস্কার ছিল, তাহার ফলে ইহা হইতেছে। সেই কাজে তোমার কোন আনন্দ আসিতেছে না, সেইসব হইল ‘প্রারব্ধ ভোগ’ হইয়া যাইতেছে। ইহা মনে করিয়া ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কৰ্মটি করিয়া যাইবে, সেই কাজে আর কৰ্ম সৃষ্টি করিবেনা।” একদিন নৈনিতালে যতীশদাদা বলিতেছিলেন, “মা এমন কি অবস্থা হইতে পারে যে জাগতিক সম্বন্ধের কিছুই থাকে না। স্বামী, স্ত্রী ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু ধরুন মা, ছেলে, এই সম্বন্ধ কি যাইতে পারে? শরীরতো থাকে।” মা বলিলেন, হাঁ, এমন অবস্থা হয়,—যে

শরীর পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়।” তখন বতীশদাদা বলিলেন, “তা যদি বলেন, তবে হইতে পারে।” আজ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা শরীর বদলাইয়া যায় ইহা কিরূপ?” মা বলিলেন, “যেমন আলুটা সিদ্ধ হইয়া যায়। চাউলগুলি মুড়ি হইয়া যায়। সেই রকম আর কি?” বরিশালের প্রফেসার এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন—মার সঙ্গে কিছু কিছু কথা হইল।

৩০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

আজ উদয়াস্ত কীর্তন চলিল। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পর কীর্তন শেষ হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে বিদায় হইল। আজ মহোৎসব হইল। মা সকলের মধ্যে খাইতে বসিলেন। মাকে মুকুট ও মালা দিয়া একজন সাজাইয়া দিলে মা শিশুর মতো দেখাইয়া দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

৩১শে বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ বরিশাল যাওয়ার কথা। মা সকালে উঠিয়া প্রায় সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া আসিলেন। বেলা ১২টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া আমরা ষ্টীমারে রওনা হইব। সকলেই কাঁদিতেছে,—“আজ আমরা মাতৃহারা হইব। আশ্রমের দিকে যে চাওয়াই দায় হইবে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সকলের মুখেই এই কথা। লোকের ভীড়ে মার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিল। যাওয়ার সময়

হইল—এর মধ্যেই মাকে ২৩টি বাড়ী নিয়া গেল। ভোগের পর যখন মা রাস্তায় বাহির হইয়াছেন, তখন ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ কেহ চরণে লুটাইয়া চীৎকার করিয়া কাদিতেছে। গ্রাম্যলোক সরল প্রকৃতির—তাহাদের এইভাবে অবাক হইতে হয়। তিন দিন তো মার সঙ্গ করিয়াছে। দলে দলে লোক মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একটা দেখা গেল—মা এক চেহারার লোক হইলেই বন্ধুত্ব পাতাইয়া বা ভাই সম্বন্ধ করিয়া দিতেছেন। অথচ বলিতেছেন, ইহা কিন্তু পূর্বের নিশ্চয়ই কোন সংযোগ ছিল। গিরিজাবাবু ও সুবোধের চেহারায় দৃশ্য আছে বলিয়া বলিলেন, “সুবোধও এই বংশের ছেলে। ইহারা ভাই হইল।” আমরা নোকায় গিয়া ঈমার ধরিলাম—বহুলোক সঙ্গে সঙ্গে ঈমারে উঠিল—এক ফৈশন পরে তাহারা নামিয়া যাইবে। অর্থের অভাব তাই বলিতেছে—‘ষেটুকু পারি মার সঙ্গ করিয়া নেই’। জ্যোতিষদাদাদের জ্ঞাতি জমিদার ফিরোদবাবুদের এক ওস্তাদজী সথানাথবাবুর বাড়ী বসিলাল। জ্যোতিষদাদা খবর দেওয়ার তিনি মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। লোকটা বড় স্পষ্টবক্তা—চেহারায় ও ভাবে সে যে কাহাকেও গ্রাহ্য করে মনে হয় না। সে মাকে দেখিয়াই সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া বলিতেছে—“দাড়াও দেখি তোমার মূর্তি দেখি।” কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিতেছে, “বাঃ, দেবী-মূর্তিই বটে, আমি অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক সাজ-সজ্জার সহিত দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর মূর্তি আমি আর দেখি

নাই।” আমরা রাত্রি প্রায় ৯টার বরিশাল পৌঁছিয়া ষ্টীমার ঘাটেই গাছতলায় মার সঙ্গে বসিলাম। কেহ মার আসিবার খবর জানেনা। ভোলানাথ চিন্তাহরণবাবুর ভাই মনোরঞ্জনবাবুকে খবর দিতে তাহাদের বাড়ী গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—দেখিতে দেখিতে মার চারি দিকে লোকের ভীড় হইয়া পড়িল। সকলেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। স্টেশনের

সুপারীন্টেন্ডেন্টও কয়েকটি দল লইয়া বরিশাল আগমন।

মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। যখন

মনোরঞ্জনবাবু ভোলানাথের সহিত মাকে নিতে আসিলেন, তখন সেখানে অনেক লোক। মার সঙ্গেও অনেক লোক আছেন। আমরা কয়েকজন মার সহিত চিন্তাহরণবাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার মণ্ডপঘরে স্থান নিলাম। সঙ্গীয় কয়েকজন মার পুরাতন ভক্ত পূর্ণ সরকারের সহিত তাহার বাসায় গেলেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

বরিশালে মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় আছি। খুব বেশী লোক মার আসার খবর পায় নাই। আজই রাত্রি ২টার ষ্টীমারে আমরা চাঁদপুর বাইতেছি। তথা হইতে মার জন্মস্থানে যাওয়ার কথা। একজন জিজ্ঞাসা করিতেছে,—“মা, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি কি নিত্য? আর তাহার একটা স্থান আছে ইহাও কি সত্য?” মা বলিলেন,—“নিশ্চয়ই, সবই সত্য, নিত্য।”

অতুলঠাকুর বলিলেন,—“মা এ কেমন কথা হইল—শ্রীকৃষ্ণের
মূর্তি নিত্য ?” মা বলিলেন,—“সত্যইতো
শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিত্য ও
সত্য। তাই। তিনি বলিলেন,—“মূলে যে ইহা
সত্য নয়, তাহাত বলা উচিত।” মা
বলিলেন,—“যখন মূল বলিতেছে, কথা হইতেছে—তখন এ
সবই সত্য। তুমি যে নিজের কথা বলছ, শুনতে চাইছ,
কথা হচ্ছে,—এই মূল অমূলের কোন প্রশ্ন নাই। তখন
ভাষাই থাকিবে না।” আবার কথায় কথায় বলিতেছেন,—
“জগত মানে গতাগতি, যতক্ষণ দৃষ্টি, ততক্ষণ সৃষ্টি,—বেদন্ত
হইয়া শিশুটি ছিলে, আবার পরে বেদন্ত ; মধ্যে কয়দিনই
দন্ত নিয়া মারামারি, কি বল বাবা ?” এইসব কথা বলিয়া
শিশুর মত হাসিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা কীৰ্ত্তন হইল। অগ্নিনী
দন্তের ভাতুপুত্র এবং ভোলাগিরি আশ্রমের কয়েকজন মার
সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। গিরি মহারাজের আশ্রিত
ভদ্রলোকেরা বলিতেছেন—“মা, আমরা কি তোমার সন্তান
নই, এত অল্প সময় এখানে থাকিয়া কেন চলিয়া বাইতেছ ?

আমরা এইমাত্র খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। এত অল্প
সময় মাকে পাইয়া কি কাহারও তৃপ্তি হয় ? মা আবার কবে
আসবে বলিয়া যাও।” মা শিশুর মত হাসিয়া বলিতেছেন,—
“বাবার কি মেয়েকে দেখিয়া তৃপ্তি হয় ? তোমরা যখনই
শরীরটাকে আনিবে তখনই আসিব। তোমাদের উপরই ত
ভার। এই মেয়েটাত ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকে, কখন আসিয়াছি,

—বাবা খবর না নিলে কি করিব ? তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। অনেকেই আসিয়াছেন। বাই বাই করিয়াও কেহ বাইতে পারিতেছেন। আমরা রাত্রি ২টার ষ্টীমারে টাঁদপুর রওনা হইলাম।

২রা জ্যেষ্ঠ, রবিবার।

আজ বেলা ১২টার টাঁদপুর পৌছিয়া কসবা রওনা হইলাম। ৩০টার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ৮টার আমরা কসবা পৌঁছিলাম। রাস্তায় কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে টাঁদপুর আসিয়া কসবা অনেক লোক মা এই ট্রেণে কসবা হইয়া খেওড়া যাত্রা। বাইতেছেন, খবর পাইয়া মার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বৃষ্টি নামিল, আমরা সেই রাত্রি ফেঁশনেই রহিলাম।

উনবিংশ অধ্যায় :

—: 0 :—

৩রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ।

ভোরে আমরা খানা পাকি ও খানা ডুলি নিলাম এবং অনেকে হাঁটিয়াই খেওড়া মার জন্মস্থান দেখিতে রওনা হইলাম । প্রায় মোইল পথ । আমরা ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই খেওড়া গ্রামে পৌঁছিলাম । কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি আসিল । তবুও গ্রামের লোক মাকে দেখিতে একত্র হইল । মার জন্ম ও বিবাহ এই গ্রামেই হয় । বিবাহের দুই বৎসর পর বিছাকুট যাওয়া হয় । কাজেই প্রায় ১৫বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা এই গ্রামেই কাটাইয়াছেন । মা যে স্থানে

জন্মস্থান খেওড়ায় খেলা করিয়াছেন যে পুকুরে স্নান আগমন ও বাল্যজীবনের করিয়াছেন, সব দেখাইতে লাগিলেন । স্নেহ-ভালবাসার স্বতি । ছোট বেলার লীলার সঙ্গীরা সব জুটিয়া পূর্ব কথার সব বলিতে লাগিলেন । একটা বিশেষ কথা ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিলাম । গ্রামের সকলেই প্রায় বলিতে লাগিলেন, “নির্মলা আমাদের বাড়ীতেই বেশী থাকিত কত খেলা করিয়াছি।” কেহ বলিতেছে “নির্মলা আমাদের

কত পাক করিয়া দিয়াছে—সর্বদাই আমাদের বাড়ী আসিত। সকলের স্নেহেই যে মার বাল্যজীবন কাটিয়াছে—তাহা বুঝিলাম। মা ও সকলকেই মিষ্ট ভাষায় কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং কাহার সঙ্গে কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া তাহাদের আনন্দ দিতে লাগিলেন। যাহারা উপস্থিত নাই, তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় বৃদ্ধা আত্মীয়ারা ও চরণে পড়িয়া মাকে প্রশংসা করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। বলিতে গেলে মার এই অবস্থায় এই প্রথম তাহারা মাকে দেখিলেন।

একবার আমরা অল্প সময়ের জন্য গিয়াছিলাম সেবার কাহারও সহিত দেখা হয় নাই। প্রথম জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইয়া অল্প বাড়ী যাওয়া হইল। জন্মস্থান দেখা হইল, স্মৃতি মার ফটো নিল। সেখান হইতে ফিরিয়া ভোলানাথ তখনই কসবা ফিরিতে চাহিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি জল খাইয়া নিব ভাবিলাম। মা বলিলেন, “চল জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, সেখান হইতে রওনা হওয়া যাইবে।” আমরা সে বাড়ী গেলাম গিয়া শুনিলাম জগদানন্দের ভগ্নী বলিতেছেন, “তুমি আসিয়াই চলিয়া গেলে তাই আমি নারায়ণের নিকট মাথা কুটিয়া বলিতেছিলাম—“চণ্ডী ঘরে আসিয়াই চলিয়া গেল আমি একটু সেবা করিতে পারিলাম না।” আমি বলিলাম, “দেখুন আরও ২১ বাড়ী

খাকিবার কথা হইয়াছিল কিন্তু মা আপনার বাড়ীই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।” সে বাড়ীতে জল খাওয়া হইল। মা বলিলেন, “যখনই এই বাড়ীতে আসিতাম ইনি (জগদানন্দের ভগ্নী) দুধ চিড়া না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিত না।” আশ্চর্য্যের বিষয় আজও তাহার ঘরে দুধ ও অল্প চিড়া ছিল, তাহা দিয়াই জল খাইতে দিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে স্ত্রীলোকেরা মার জন্ম মুড়ি, আম, নাডু নিয়া আসিতে লাগিলেন। মেয়েরাই কীর্তন করিতে লাগিলেন। খাইতে বসিয়াছেন পর মার বিশেষ পরিচিতা লক্ষীচরণ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে ভোলানাথকে খাকিবার জন্ম বলায় তিনি তখনই একদিন খাকিবার জন্ম রাজি হইলেন। এই বিষয়ের একটু ইতিহাস আছে। প্রথম হইতেই ভোলানাথ এখানে থাকিতে রাজি ছিলেন না, তারপর হইতে তিনি গিয়াই চলিয়া আসিবেন এইরূপই বলিতেছিলেন। এখানে গিয়া ও সেই ভাষাই প্রকাশ পাইতেছিল—তিনি তখনই চলিয়া আসিবেন বলায় আর রান্নার বন্দোবস্ত করা হইল না। জগদানন্দের বাড়ী জল খাইয়া আমরা রওনা হইয়া আসিব স্থির হইল, জগদানন্দের বাড়ী যাইয়া সকলে বসিলেন। কিন্তু অনেকেরই ইচ্ছা একদিন তথায় থাকিয়া আসে কিন্তু বাবাজী কিছুতেই রাজী না হওয়ার আর কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইতেছেননা; পাগলবাবার যখন কোঁক ওঠে তখন আর কেহ কিছু বলিতে সাহস পায় না। আমি সকলের ইচ্ছা দেখিয়া মাকে বলিলাম,

“মা—পাগল ভোলানাথের ঘোঁক উঠিয়াছে বাইবেই—তাই কেহ কিছু বলিতেছেন, তুমি একটু বাবাজীর মতটা ফিরাইয়া দেও না, তবেইত হয়।” আমিও হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়াছি। কার্য্যত কিছু হইবে সে বিশ্বাস ও বাস্তবিক আমার ছিল না। কথার কথা বলা মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটু পরেই মা ও বাবাজী জল খাইতে বসিয়াছেন।

গ্রামস্থ লোকেরাও থাকিবার জন্য অনেকবারই বলিতেছিল কিন্তু কিছুতেই থাকা হইবেনা স্থির হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখি জল খাইতে খাইতে বাবাজী আমার আঙ্গুল দিয়া ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন—একদিন থাকিবেন। এত যে কথাবার্তা হইতেছে মা কিন্তু একেবারে সেই বিষয়ে চুপ, বাহা হইবে তাহাতেই তিনি রাজী। যাওয়া স্থির হইয়াছে তাই তাড়াতাড়ি জল খাইতে বসান হইল—তাই করিলেন। হঠাৎ বাবাজীর এই মত পরিবর্তন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার তখনও কিছু খেয়াল হয় নাই। পরে আমার প্রার্থনার কথা মনে পড়িয়াছে। বাবাজীই আবার তখন উল্টা বলিতেছেন,—“জন্মোৎসবের সময় এখানে আসিয়া এখনই চলিয়া বাইব?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “বেশতো দেখি, আপনিই এখন একেবারে উল্টা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।” বাবাজীর সরল প্রাণ, তখন আবার সকলকে নিয়া বেশ আনন্দ করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকেরাও

হঠাৎ এই পরিবর্তনে আশ্চর্য ও আনন্দিত হইল। লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে গিয়া তাহাদের বাড়ী ভোগের বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। কিছু পরেই ভয়ানক বৃষ্টি আসিল। শুনলাম এখানে বৃষ্টির জন্য একটা হাহাকার উঠিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল, “মা পা দিতে না দিতেই সকলকে ঠাণ্ডা করিলেন।” সব স্থানেই এইরূপ ঘটনা। জামসেদপুরেও ভয়ানক গরম—বৃষ্টি নাই। ভক্তেরা এত করিয়া মার আসন সাজাইয়াছে। মা গিয়া ভক্তদের দেওয়া আসনে বসিলেন—কীৰ্ত্তন হইল। পরে যেই মাকে ভোগের জন্য উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে অমনি ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে সব ওলট পালট করিয়া দিল। কলিকাতায় সকলেই গরমে অস্থির, তাহারা মনে করিতেছিল, মা ঠাণ্ডা স্থান হইতে আসিতেছেন, এখানে যদি বৃষ্টি হইত একটু ঠাণ্ডা হইত, তবে বড়ই ভাল হইত। কলিকাতা পা দিতেই বৃষ্টি হইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইল।

বাইশারীতেও তাই। সকলেই বলিতে লাগিল, “মার পাদস্পর্শে সব দেশ ঠাণ্ডা হইতেছে।” বাক্, আমরা জগদানন্দের বাড়ী হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর মণ্ডপে মাকে নিয়া গেলাম। মা বলিতে লাগিলেন, “এ বাড়ীতে পূজা হইত, আমাকে পূজার ৪ দিনের জন্য প্রত্যেক বছরই নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিত। ছোটবেলায় প্রতি পূজাতেই ৪ দিন এই বাড়ীতে থাকিতাম।” আজও এই বাড়ীতে

থাকা স্থির হইল। কীৰ্ত্তনাদি হইল; মেয়েরাও মিলিয়া কীৰ্ত্তন করে, তাহারা কীৰ্ত্তন করিয়া মাকে শুনাইল। বাড়ী বাড়ী মাকে নিয়া গেল। মা এতবছর পরও সকলকেই চিনিতে পারিতেছেন—বলিতেছেন, “বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।” এই গ্রামের ইটের কারবারই ছিল না—এখন দালান উঠিয়াছে, টিনের ঘরতো প্রায় কয় বাড়ীতেই দেখিতেছি। গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি দেখিতেছি।” আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা মার চরণ স্পর্শ করিল। গুরুজন ব্যক্তি বলিয়া মার চরণ স্পর্শ করিতে কেহই দ্বিধাবোধ করিল না। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা আসিয়া মাকে পূর্বকথা সব বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। মাও সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের আনন্দ দিতে লাগিলেন। মার বাল্যজীবনের সব স্মৃতি দেখিয়া আমরাও আনন্দ পাইতেছিলাম। রাত্রি প্রায় ২৥০টা পর্য্যন্ত সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

মার মিস্ট ব্যবহারে সকলেই আনন্দ পাইতেছেন। “পূর্বের কত খাতির এঁর সঙ্গে ছিল, ওঁর সঙ্গে কত খেলিয়াছি, এঁর বাড়ীতে ঠেকা হইলে আমাকে রাঁধিবার জন্ম নিয়া আসিত”—এইসব পূর্ব কথা বলিয়া বলিয়া সকলকেই আনন্দ দিতে লাগিলেন। কারণ, সকলেই দেখিতেছেন আজ মা এতবড় হইয়াও তাহাদের কথা ভুলিয়া যান নাই। মার সঙ্গে ১৪।১৫ জন এত পাকি, ডুলি করিয়া কেহ কখনও হয়তো

এক ছোট্ট গ্রামখানিতে আসে নাই। বাহারা মার আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছু বোঝেননা তাহারাও ভাবিতেছেন—এত ঐশ্বর্য্য বাহার তিনি আমাদের সঙ্গে এইভাবে মিলিতেছেন— তাহাতেও তাহারা কৃতার্থ হইতেছে। এইভাবে লীলাময়ী জন্মস্থানে একদিন কাটাইলেন। আগামী কল্য ভোরে আমাদের রওনা হইবার কথা স্থির হইল।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

ভোরেই আমরা কসবার দিকে চলিলাম ; ৮টায় ট্রেন ধরিতে হইবে। গ্রামের লোক অনেকদূর অবধি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যখন আমরা কসবা পৌঁছিলাম, তখনও ট্রেনের দেবী ছিল। মার সঙ্গে সকলেই কসবার কালীবাড়ী চলিলাম। এই সেই স্থান যেখানে মার পিতামহী পৌত্রের কামনা করিতে গিয়া পৌত্রীর প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছিলেন। সে প্রার্থনায়ই মার জন্ম। আমরা কিছু সময় কালীবাড়ী কাটাইলাম। পরে স্টেশন মাস্টারের বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। যথাসময়ে ট্রেন আসিলে আমরা চাঁদপুর রওনা হইলাম। বেলা প্রায় ১২টায় চাঁদপুর পৌঁছিলাম। গিরিজা থেওয়া হইতে চাঁদপুর দাদা (ভোলানাথের ভাগিনের) হইয়া ঢাকা যাত্রা। তাঁহার বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। মাকে ডাক্তারখানায় রাখিলেন। ইনিও মার খুব ভক্ত। মার ভোগের পর প্রচুর পরিমাণে সকলে প্রসাদ পাইলেন।

মেহের কালীবাড়ী বাওয়ার কথা হইয়াছিল—কিন্তু মা আরও ২৩ বার তথায় গিয়াছেন, আর যাইবেন না। ভক্তেরা মাকে ছাড়িয়া বাঁহিতে চাহিলেন না—তাই আর কাহারও বাওয়া হইলনা। বৈকালে নোকায় পূর্ণ সেনের বাসায় বাওয়া হইল। সেখান হইতে ফিরিয়া ডাক্তারখানায়ই বসা হইল। অনেকেই মার দর্শনে আসিলেন। রাত্রি ১০টায় আমরা ঢাকা ষ্টীমারে উঠিলাম।

এই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

ভোর ৫টায় ষ্টীমার ছাড়িয়া বেলা ১০টায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিল। ষ্টীমার ভিড়িবার পূর্বে মুসলধারে রুষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা অনেকক্ষণ ষ্টীমারেই অপেক্ষা করিলাম। মায়ের সঙ্গীদের মধ্যে (গোদাবরী, আলমোড়া নিবাসী শ্রীলোকটী) এবং খরাস (করাচীর একটি ছেলে জামসেদপুরে কাজ করে, সে ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নিয়া, কয়েকদিনের ছুটি নিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে) এই প্রথম ঢাকা দেখিবে—তাহাদের তাহাতেই আনন্দ। ভূপতিদাদা নারায়ণগঞ্জে মাকে নিতে আসিয়াছেন। রুষ্টি একটু কমিলেই আমরা গাড়ীতে উঠিয়া ঢাকা রওনা হইলাম। যথাসময়ে গাড়ী স্টেশনে পৌঁছিতেই ভক্তবৃন্দ মার ও ভোলানাথের জয়ধ্বনি দিল। মাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া নিয়া ফুলের মালায় মালায় ভরিয়া দিল। এত বছর পর জন্মোৎসবে মাকে পাইয়া

ঢাকা বাসীর আনন্দ ধরে না। প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী তাহার গাড়ীতে মাকে উঠাইয়া নিলেন। সত্যেন ভদ্রের মোটরে অগ্ন্যস্ত সকলে চলিল। শুনিলাম গতকল্য আমরা পৌঁছিব কথা ছিল, তাই গতকল্য বহুলোক ষ্টীমার ঘাটে ছিল, কারণ, বরিশাল হইতে মা আসিবেন স্থির ছিল। হঠাৎ যে আমরা খেওড়া গিয়াছি, তাহা কাহারও জানা ছিলনা—কাল রাত্রিতে টেলিগ্রাম পাইয়াছে। মার মোটর ধীরে ধীরে চলাইয়া সকলে আশ্রমে আসিলেন। মঙ্গলঘট দরজায় বসান হইয়াছে।

মা আসিতেছেন—তাই জটু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কত যত্ন করিয়া আশ্রম সাজাইয়াছে। নাম ঘরের চারিদিকে “মা” নাম লিখিয়া দিয়াছে। মার এক আসন “মা, মা” লিখিয়া তৈয়ার করিয়াছে। মাকে নিয়া নাম ঘরে বসান হইল। আনন্দে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি দিল। অথও নাম চলিতেছে—২৫দিন চলিবে। লোকে লোকারণ্য। মার ভোগ হইল—প্রসাদ বিতরণ হইল। রাত্রি প্রায় ২টায় মা মেয়েদের নিয়া নাম

ঘরের এক পাশেই শুইয়া পড়িলেন।

ঢাকা আগমন।

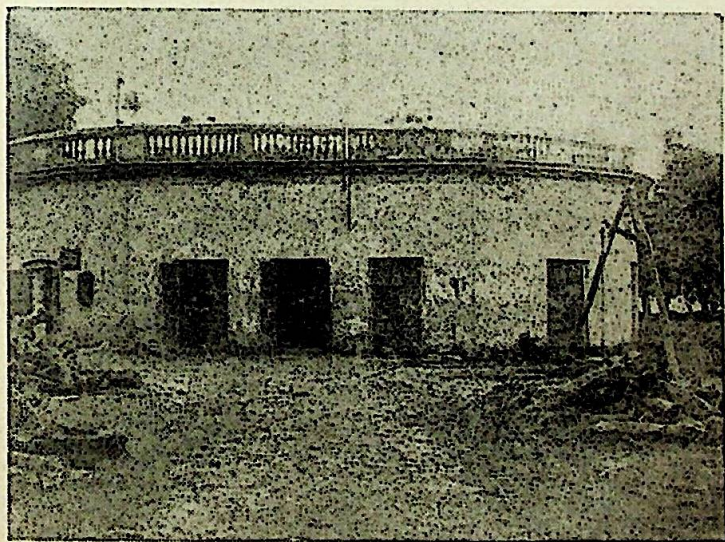
কলিকাতা হইতে গিরীন ডাক্তারের

মেয়ে সাবিত্রী, যতীশ গুহের মেয়ে লতিকা, যুথিকা ও ছেলে গৌর, প্রাণকুমারবাবুর মেয়ে অগ্ন ও ভাগিনেয়ী স্মৃতিকে নিয়া প্রাণকুমারবাবুর ছেলে মিনু আসিয়াছে। মানিকও কলিকাতায় ছিল সেও এই সঙ্গে আসিয়াছে। এইসব বড়

বড় মেয়েদের যে এইভাবে পাঠাইয়াছে দেখিয়া সকলেই, মার প্রতি মায়েদের বাপ মায়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কোন মান অপমানের দিকে না চাহিয়া তাহারা মার সঙ্গ করিবার জন্যই মেয়েদের এইভাবে পাঠাইয়া দিয়াছে। মাও ঢাকাবাসীদের বলিলেন—“দেখ ঢাকার মেয়েদের ওরা দেখাইল যে তাহারা যাইতে পারে না, উহারা আসিতে পারিয়াছে। বাস্তবিকইতো কুলের গরব না ছাড়িলে তাঁকে পাওয়া যায় না। আমরা যে সব বজায় রাখিয়া মার কাছে বাই, তাই কিছুই পাই না বলিয়া দুঃখ করি। যতটুকু খালি করি ততটুকু মা ভরিয়া দেনই, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে দিতেই বসিয়া আছেন আমরা নেই কই?”

৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

বিশেষ লিখিবার কিছুই নাই—আনন্দোৎসব চলিতেছে। বেলা প্রায় ৭টার মা মাঠে বাহির হইলেন। গাছতলায়ই বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—“এই স্থানই বেশ। তোমরা মাকে আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও। শুধু মন্দিরেই প্রণাম কর—যেন আর কোথাও তিনি নাই।” এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। কিছুদিন হইতেই মার শুষ্ক চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে—এখন যেন রূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে—শুষ্ক চেহারা আর নাই। আবার যেন পূর্বের মত ঢলঢল চেহারা হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর সেই অমুখেরপর



ঢাকা শাহবাগের আশ্রম ।

মার আর এমন চেহারা হয় নাই। শুকনা চেহারা ছিল। আমি দুঃখ করিলে অনেক সময়ই বলিতেন—“রাখনা আবার মোটা হইব।” আমি অনেকদিন দেখিয়া দেখিয়া বলিতাম—“আর হইয়াছ তুমি মোটা।” মা আবারও বলিতেন, “দেখনা হই কিনা।” বাস্তবিকই এখন যেন পূর্বাপেক্ষাও ভাল চেহারা হইয়াছে। খাওয়া কিন্তু একদিন পর পর খাইয়াও পরিমাণে ষেটুকু ছিল তাহাও নাই। এখন কখনও ২।১ গ্রাস ভাত, কখনও স্নুজি সিদ্ধ করিয়া ২।৩ খানা রুটি, কখনও আটার রুটি ২।১ খানা তরকারী দিয়া খান। নিজের শরীর দেখাইয়া নিজেই কতবার বলেন, “দেখ, কত মোটা হইয়া গিয়াছি।” হাত পায়ের তলা লালই থাকে। এখন বলিতেছেন, “দেখ, কত রক্ত হইয়াছে, হাত লাল টকটক করিতেছে।” এই বলিয়া নিজেও হাসেন উপস্থিত সকলেও

হাসে। সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময় উৎসবে কীৰ্ত্তনও আনন্দ।

মা গিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন— মেয়েরাও গিয়া মাকে ঘিরিয়া বসিল। আরতির পর মা আমাকে বলিতেছেন, “ও দেশ (U P) হইতে যেসব গান লিখিয়া আনিলে তাহাকি বাস্তবদ্ধ করিবার জ্ঞান? আরতির গানটা এখনই গিয়া আন।” আমি তাই করিলাম। মা হিন্দি গান তাহাদের সুরে গাইতে লাগিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও ধরিল। আজ রাত্রিতে মা মন্দিরের ভিতর শুইবেন বলিলেন। মাকে মন্দিরে কম্বল বিছাইয়া দিলাম। আমাকে

বলিতেছেন, “তুমি মেয়েদের নিয়া, কাল আমি যেখানে সকলকে নিয়া শ্বইয়াছিলাম, সেখানে গিয়া শোও।” অল্প বয়সের মেয়েদের খবর করিতে বলিতেছেন। আবার বলিতেছেন—“অন্নদাবাবুর বিধবা মেয়েটি—কিন্তু আছে দেখ সে কোথায়? তহাকে তোমার কাছে শোওয়াইও—তাহাকে জল খাইতে দেও গিয়া।” জগজ্জনীর কোন দিকেই ত্রুটি নাই, সব দিকেই লক্ষ্য আছে। সাবিত্রী ও যুথিকাকে ঘরে শুইতে বলিলেন। অণু মেয়েরা তাহাদের আত্মীয়ের বাসায় গিয়াছে, সব ব্যবস্থা বেন নিপুণ, নিখুত। রাত্রি প্রায় ১২টার শুইয়া পড়িলেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

ভোর ৫টার উঠিয়া মা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া শুইলেন। ব্রহ্মচারীদের বলিলেন, “তোমরা এখন মন্দির পরিষ্কার করবেতো? আমি বারান্দায় বসি।” একটু পরেই উঠিয়াই মাঠে বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে ভূপতিদাদার স্ত্রী একান্তে কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, বলিলেন, “এখনই চল।” তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়া অখন্দানন্দজীর কুটীরে মা শুইয়া পড়িলেন। দর্শনার্থীরা সেই দরজায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মা কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। আজ নবাব বাড়ীর ইসমাইল আসিয়া মাকে দর্শন করিল। বলিল, “আমি আজ খুবই ধন্য হইলাম।” শুনিলাম সে নাকি এক

ফকিরের কাছে গিয়াছে, “তোমরা ঢাকার আনন্দময়ীর কাছে বাইতে—তিনি খুব উচ্চ স্তরে আছেন, আমার কাছে আসিয়াই কেন?” এই কথা'র পর যোগেশ ঘোষের নিকট খবর করিয়া ইসমাইল মিঞা আসিয়াছে। আজই রাত্রিতে মেয়েদের কীৰ্ত্তন সারারাত চলিবে। মা ফুল ও চন্দনের যোগাড় করিতে বলিয়াছেন। মা মন্দিরে কিছুক্ষণ পড়িয়া ছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার মেয়েদের কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। লীলাময়ী কত লীলা আরম্ভ করিলেন। মাকে সকলে কৃষ্ণ সাজাইল। মাও কুমারীদের একধারে আনিয়া সকলকে সাজাইতে বসিলেন। পরে কুমারীদের নিয়া মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত ভাবে কীৰ্ত্তনানন্দ করিতে লাগিলেন। অপূৰ্ব ভাবের খেলা চলিল। শেষে কুমারীরা হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল—মা মধ্যখানে ঘুরিতেছেন। বলিলেন, “সধবা, বিধবা সকলকে এক এক করিয়া আন।” মা কুমারীদের নিয়া আনন্দ করিতেছেন। বোধহয় তাহাতে বিবাহিতাদের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল—তাই করুণাময়ী এক এক করিয়া তাহাদের নিয়া ও আনন্দ করিলেন। সকলে কৃতার্থ হইল।

এইভাবে লীলাচ্ছলে সকলকে কৃপা করিলেন। কোন কোন স্ত্রীলোকের মার স্পর্শে ভাব পরিবর্তন হইয়া পড়িল। কি আনন্দে যে নেশাখোরের মত হইয়া পড়িল। পুরুষ সকলকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সব দিকেই মার বিশেষ লক্ষ্য।

সারারাত বসন্ত কীর্তন চলিল। রাত্রি তটা অবধি মা কাঁহাকেও বসিতে দিলেন না। খুবই আনন্দ হইল। সকালে কীর্তন শেষ করা হইল। পরে ভোগ হইল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া মা একটু শুইয়াছেন। একটু পরেই প্রমথবাবু আসিয়া মাকে ডাকিতেছেন। মা চোখ বুজিয়াই বলিতেছেন, “আমি এখন কিছুতেই উঠিব না। আমি যখন বসিয়া থাকি তখন আসোনা, আর শুইলেই আসিয়া উপস্থিত।” প্রমথবাবু বলিলেন, “তুমি এত অল্প সময়ের জন্য আস কেন? বেশী দিন থাক তোমাকে শুইয়া থাকিতে খুব বেশী করিয়া দিব।” এই শোয়ার কথার উত্তরে মা পরে বলিয়াছেন, “তোমাদের সঙ্গে যেমন কথাবার্তা বলি শুইয়াও আমি কিন্তু কথাবার্তা বলি, তবে তাহাদের তোমরা দেখিতে পাও না।” একটু পরেই মা উঠিয়া নামঘরে গেলেন। কারণ মেয়েরা মাকে কিছুতেই শুইয়া থাকিতে দিলেন না। দুপুরে ভোগের পর মা গিয়া মন্দিরে পাড়িয়া রহিলেন। বৈকালে লোকের ভাড়ের জন্য মাকে নিয়া মাঠে বসান হইল। বিশেষ কোন উপদেশ বাহির হইল না। আনন্দময়ী সকলের সঙ্গেই নানাকথা বলিয়া আনন্দ করিতেছেন। অনেক রাত হওয়া হইতে কেহই সেই মিষ্টি কথা ও নেই অপক্লপ রূপ দেখিয়া

ফেলিয়া বাইতে পারিতেছে না। ১০টার পর মা ভিতরে আসিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। রাত্রি প্রায় ২১০টার মন্দিরে শুইতে গেলেন। কিন্তু অহরহ নাম চলিতেছে, কাহারও শুইবার উপায় নাই।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজও সেই রকমই চলিতেছে। আজ রাত্রিতে বুদ্ধেরা নারারাত নাম রক্ষা করিলেন। ভূদেববাবু প্রশ্ন করিলেন, “আপনি ভগবতী তবে আপনার স্পর্শে আমরা মুক্ত হইব না কেন?” মা বলিতেছেন, “মেয়েকে এইরূপ বলে নাকি? আমি তোমাদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে, খাই, দাই, ঘুরি, ফিরি।” তাহার পুনঃ পুনঃ ঐ প্রশ্ন করায় মা বলিলেন, “এই শরীরটার কথা ছাড়িয়া দেও মায়েরা সকলেই ভগবতী।” নরেশবাবু (প্রফেসর) বলিতেছেন, “তবে আমরা কি?” মা বলিলেন, “তোমরা শিবজী।” নানা কথার পর মা বলিলেন, “এই শরীরটার কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু বাস্তবিক যে ফল পাওনা তাহার কারণ সেই বিশ্বাস কই? যতটুকু বিশ্বাস ততটুকু কাজ ও হয়। তবে তোমরা বলিতে পার ‘আগুন না জানিয়া ধরিলেও তাহার জ্বিয়া একই হয়।’ একথার উত্তরে এই বলা যায়—এত ঠাণ্ডা, যে ভিতরে গরম প্রবেশ করিতে সময় লাগে। তবে ফল নিশ্চয়ই হয়। বৃথা কিছু যায় না; তাই সাধু সন্ন ইত্যাদি করা দরকার।”

১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজ ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা সারারাত্রি কীর্তন করিল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

আজ সারারাত্রি মা মেয়েদের নিয়া কীর্তন করিলেন। অমূল্যদাদার স্ত্রী হঠাৎ কেমন হইয়া পড়িল। মা তাকে বুকে জড়াইয়া নিয়া স্থির করিলেন। মার যেন সমস্ত শরীর দিয়া আনন্দ বাহির হইতেছে, সকলে তাহা দেখিয়া আনন্দে ভরপুর। কাহারও বিশেষ খেয়াল নাই। আরও ২৩টি স্ত্রীলোকের ভাবের পরিবর্তন হইল। ভূদেববাবুর স্ত্রীও নাম করিতে করিতে কেমন হইয়া পড়িয়াছিল। মা অমূল্যদাদার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় কন্মল পাতিয়া শোওয়াইয়া দিতে বলিলেন। সেই কন্মল তাহাকে দিয়া দিলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

ভোরে গত রাত্রির কীর্তনান্তে অখিলবাবুর বাসার কাছে বাগানের পুকুরে গিয়া মা মহানন্দে মেয়েদের নিয়া স্নান করিলেন। দলে 'দলে স্ত্রীলোকেরা যখন মার সঙ্গে সারারাত্রির কীর্তনের পর স্নান করিতে চলিল এবং স্নান করিয়া ফিরিল—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পরে আশ্রমে আসিয়া

বালাভোগ হইল। ১টার সময় মাকে ভক্তদের বাড়ী বাড়ী
 নিয়া গেল। চাকেশ্বরীবাড়ীর পূজারীরা আসিয়া মাকে
 মায়ের মন্দিরে নিয়া গেল। সেখানে একটি ঘটনা হইল।
 একজন মার কাছে নিজের অমুখের জগ্ন কাতর প্রার্থনা
 জানাইতেছে। মার হাত দুইখানি ধরিয়াছে, মার হাতে একটা
 গোলাপফুল ছিল, সকলের অলক্ষিতে আপনা হইতেই সেই
 ফুলটি মার হাত হইতে সেই স্ত্রীলোকটির হাতে পড়িল—
 কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে তাহা দেখিয়াও দেখিলনা—ফুলটি
 মাটিতে পড়িয়া গেল আমি দেখিয়াছিলাম। হঠাৎ বলিয়া
 উঠিলাম—“কি আশ্চর্য্য।” মা আমার দিকে চাহিয়া একটু
 হাসিলেন। পরে আমি ফুলটি কুড়াইয়া আনিলাম। বাড়ীতে
 ফিরিবার সময় মা বলিলেন, “দেখিলেত, দিলেও নিতে
 পারে না, কাজেই আমি বলি বাহা হইবার হইবেই, তোমরা
 অনর্থক পীড়াপীড়ি কর।” আমিও একথার সত্যতা অনুভব
 করিলাম। তবে অহেতুক কৃপার ফল প্রাপ্তি যায় সত্য।
 আশ্রমে ফিরিয়া মা মন্দিরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বৈকালেও ভক্তদের বাড়ী বাড়ী মাকে নিয়া গেল। ২৭দিন
 অখণ্ড নাম চলিবে—মার জন্ম তারিখ হইতে জন্ম তিথি
 পর্য্যন্ত। লোকের ভীড়ে মার শরীর রক্ষা করা দায়। আজ
 সকলে মিলিয়া সারারাত্রি খুব জোর কীর্ত্তন চালাইল। রাত্রি
 প্রায় ২টায় মা একটু বিশ্রাম করিলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

ভোরে ছেলেদের নিয়া মা পুকুরে স্নান করাইতে গেলেন। পরে দই ইত্যাদি দিয়া বাল্যাভোগ হইল। মনমোহন ঘোষ আশ্রমে কখনও যান না। কিন্তু প্রাণটা ভাল, আশ্রমের বথাসাধ্য সাহায্য করেন। আজ মাকে মনমোহন ঘোষের বাড়ী নিয়া গেল। তিনি মাকে রুদ্রাক্ষের মালা দিলেন। শুনলাম, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—মা বলিতেছিলেন “তুই আয়, তুইতো আমাদেরই লোক।” আজ রাত্রিতে মনমোহনবাবু আশ্রমে আসিলেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ প্রভাতবাবু মাকে ভোগ দিবার জন্য আনন্দ আশ্রমে নিয়া গেল। তথায় চারুশীলা দেবী (আশ্রমের কর্ত্তী) মাকে চন্দন দিয়া সাজাইয়া দিলেন। কীর্ত্তন হইল। সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ করা হইল। তথা হইতে সুরেন মুখার্জির বাসায় গেলেন—তথায় কীর্ত্তনাদি হইল। তথা হইতে সত্যেন ভদ্রের বাসায় গেলেন—সেখানে সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ হইল। তথা হইতে আশ্রমে ফিরিলেন। মাকে ধানকোড়ার বাসায় নিয়া গেলেন। আরও ২১ জন ভক্তের বাড়ী ঘুরিয়া মা আশ্রমে ফিরিলেন। অনেকেই ভোলানাথের কাছে দীক্ষিত হইতেছেন। রোজই প্রায় ২১০ জন দীক্ষা

নিতেছেন। আজ গহবরের কালীপূজা, রাত্রি ১২টার সময় হইবে। পরে মার তিথি পূজা হইবে। আজ দৈনিক পূজার পর মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সর্বসাধারণের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আজ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর দরজা বন্ধ করা হয়। তখন কালীর দরজা খোলা হইল। অভিষেকাদি করিয়া রাত্রি ১২টার পূজা হইল। পরে রাত্রি ৩টার মার তিথি পূজা হইবে। দুপুরে ভোলানাথ যজ্ঞ করিলেন। বাহারা ১০ মিনিটের ব্রত নিয়াছেন তাহাদের আত্মার উন্নতির জন্ত আজ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল। লোকের ভীড় দিনে দিনে বাড়িতেছে।

মাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। একজনের উপর সকলের সমান দাবী হওয়াতে মতের পার্থক্য ও একটু আধটু মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক তাহাও হইতেছে। আবার বাহাদের সঙ্গে কোনও পরিচয় ছিলনা, মার কাছে আসিয়া তাহাদের শুদ্ধ ভাবের মিলনও খুব চমৎকার ভাবে হইতেছে; তাহাও দেখিবার জিনিষ। মাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আরতি কীর্তন চলিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ভাই-বোন, ভাস্কর-ভাদ্রবো, বাপ-ছেলেমেয়ে, মা-মেয়ে সব মিলিয়া হাততালি দিয়া কীর্তন করিতেছেন। অনেকেই নাম করিতে করিতে অসাড় হইয়া পড়িতেছে। কি একটা ভাবের নেশায় সব ভরপুর।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ মাকে অনেকে বাসায় নিয়া গেল। আমাদের আগামী সোমবার মার সহিত ঢাকা ছাড়িবার কথা হইয়াছে। দিন রাত সকলের কোথা দিয়া যাইতেছে খেয়াল নাই। কলিকাতা হইতে প্রফেসার নরেশবাবু, নগেনবাবু, নবতরুবাবু সব আসিয়াছেন। গুহ পরিবারের, ও প্রাণকুমারবাবুর মেয়েরা, গিরীন ডাক্তারের মেয়ে সব কলিকাতা হইতে গিয়াছে। বাপ, মা, কাহারও সঙ্গে নাই, মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। মা আমাকে বলিতেছেন, “মেয়েদের কিন্তু সর্বদা দেখিয়া রাখিও।” মার আমার কোনদিকেই ত্রুটি নাই। আজও রাত্রিতে মা মেয়েদের নিয়া কীৰ্ত্তনে কাটাইলেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

ভোরে মেয়েদের নিয়া মা স্নান করিলেন, পরে বাল্যভোগ হইল। আজও মাকে বাড়ী বাড়ী নিয়া গেল। আশ্রমে এত ভীড় যে লোক মার বাওয়ার অবস্থা। মাকে মধ্যে মধ্যে মাঠে নিয়া বাওয়া হইতেছে। আজ মহোৎসব। মা মন্দিরে আছেন। ভীড়ের জন্ত মধ্যে মধ্যে মাকে বাহিরে নিয়া যাইতে হইতেছে। মা মন্দিরের ভিতরে বসিয়া সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। কখনও বা শুইয়া পড়িয়া আছেন। দুপুর বেলা হইতেই ভয়ানক বৃষ্টি। কিছু কিছু লোক

খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর আর বসান গেলনা। লীলাময়ী আর এক লীলা করিলেন। আমাকে বলিলেন, “চল একটু বাহিরে বেড়াইয়া আসি।” আমি বলিলাম, “এত বৃষ্টিতে বাইবে, দরকার নাই।” একটু পরে মা বলিলেন, “চল স্নানের ঘরে বাইবা।” আমি মাকে নিয়া স্নানের জায়গায় গিয়া দেখি সেখানে কয়েকজন ভগ্নীরা মিলিয়া কীর্তন করিতেছে। মা কিছু পরে তাহাদের বলিলেন, “তোমরা এখানে থাক আমি একটু আসি।” এই বলিয়া আমাকে নিয়া মাঠের দিকে চলিলেন। ভয়ানক বৃষ্টি। মাঠে বাহির হইয়া দেখি পূর্বোক্ত মনমোহনবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন।

মা বলিলেন, “বাবা, তোমার জন্মই এখানে আসিয়াছি।” মা সমস্ত মাঠ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রমে ঢুকিলেন। দলে দলে লোক মাকে ভিজিতে দেখিয়া বৃষ্টিতে নামিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মাও মহানন্দে হাততালি দিতেছেন। ছোট্ট শিশুটির মত আনন্দে জলে খেলিতেছেন। আশ্রমে ঢুকিতেই ভোলানাথও নামিলেন। ভাবের আবেগে ভোলানাথ কাদার ভিতর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া নিয়া গেল। কিছু স্থস্থির হইয়া আবার তিনি নামিলেন। স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের ভুলিয়া নাম-কীর্তনে মাতিয়া উঠিল। মাকে মাঝখানে বসিবার জন্ম চারিদিকে সকলে

হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও খাওয়া হয় নাই। মা খিচুড়ী বাহির করিয়া যেই নিজের হাতে ২।১ জনকে দিয়াছেন, অমনি মার হাতের খিচুড়ী নিবার জন্ত এমন ঠেলাঠেলি শুরু হইল যে আর মার দেওয়া সম্ভব হইল না। ভোলানাথকে দিতে বলিলেন। খিচুড়ী তরকারী সব মাঠে নিয়া যাওয়া হইল। মা বলিলেন, “সকলে আঁচল পাতিয়া খিচুড়ী নেও।” তাই হইল। সকলে মার এই কথা শুনিতে পায় নাই। ভূদেববাবু প্রভৃতি ২।১ জন কাপড়ে খিচুড়ী নিতে একটু আপত্তি করিতেই মা আমাকে বলিলেন, কোঁচা খুলিয়া দিয়া দেও।” মার আদেশ জানিয়া ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলিয়া আঁচল পাতিয়া খিচুড়ী নিল এবং রুপিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহা খাইতে লাগিল।

অপূর্ব দৃশ্য। মা ভূদেববাবুকে বলিলেন, “এই ভিক্ষার স্মৃতি রাখিবার জন্ত এই কাপড়খানি রাখিয়া দিও।” বহুক্ষণ এইভাবে কাটিল। সন্ধ্যার পূর্বে মা ভোলানাথের সহিত ছেলেদের স্নান করিতে কালীবাড়ীর পুকুরে পাঠাইয়া দিলেন— পরে মেয়েদের নিয়া মা পুকুরে স্নান করিলেন। স্নানের পর মন্দিরে বসিয়া মা সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজ মা কলিকাতা রওনা হইবেন। সঙ্গে সুরেশবাবুর স্ত্রী, যতীনবাবুর স্ত্রী, সাধনা ও নগেনদাদার মেয়েটি কলিকাতা চলিল। আরও অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সকলেরই মন খারাপ—মা বাইতেছেন, আবার

কবে আসিবেন কে জানে, এই চাক। হইতে কলিকাতা।
যাত্রা।

আশঙ্কায় সকলেরই প্রাণ কাঁদিতেছে।
মাকে সকলে কত মালা পরাইতেছে।

কত ভাল ভাল খাবার আনিয়া মার কাছে দিতেছে, মা একটু মুখে দিয়া দিতেছেন—পরে বিতরণ হইতেছে।

সকলেই নিজ নিজ ভাবে মায়ের সেবা করিতেছেন—মাকে আদর করিয়া বেন তাহাদের তৃপ্তি হইতেছে না। মা আনন্দময়ী হাসিতেছেন—অনেকেই চোখ মুছিতেছে। মা তাহাদের আদর করিয়া বলিতেছেন, “আচ্ছা দেখতো, যে হানে তাহার জন্ম তোমরা কাঁদ কেন বলিতে পার ?” এইরূপে নানা ভাবে নানা কথায় মা সকলের প্রাণে এই বিষাদের মধ্যেও আনন্দ দিতেছেন। মা যে কিছু পরেই চলিয়া যাইবেন, একথা সকলেই ভুলিয়া যাইতেছে। মার সঙ্গ জনিত আনন্দে তখনও সকলে ভরপুর। মা বলিতেছেন, “দেখ সৎসঙ্গের গুণ কি জান ? যেমন একটা পাখী অনেক দিন খাঁচার বন্ধ থাকিতে থাকিতে উড়িতে ভুলিয়াই গিয়াছে,

খাঁচার দরজা খুলিলেও সে আর উড়িয়া যায় না। হঠাৎ একদিন একদল পাখী আসিয়া জুটিল। অমনি দেখা গেল, সেই পাখীটিও তাহাদের সঙ্গে উড়িয়া পালাইল। সেই রকম যদিও জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া আছে,—কিন্তু যদি সে একজনকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া মনে করে—অমনি তার ঐ ভাবের সাময়িক দেখাইলেও একটা উন্মাদনা হয়, কিন্তু সাময়িক যদিও দেখায়, কিন্তু ছাপ রেখে যায়। বৃথা কিছুই যায় না। ইহাও সৎসঙ্গের গুণ, সৎসঙ্গে বিণেষ লাভ মনে রেখো।” আবার বলিতেছেন, “দেখ যে জিনিষের স্বাদ যে কখনও পায় নাই সে জিনিষ পাইবার জন্য সে কখনও ইচ্ছুক হইতে পারে না। এই যে সকলে স্থায়ী একটা আনন্দ পাইতে চায়, তাহার কারণই হইল, স্থায়ী আনন্দ তাহার আছেই, তার উপর চাপা পড়িয়াছে তাই ছট্‌কট করিতেছে তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার পূর্ণশান্তি আসিতেছে না।”

সিক্বেথরীর ফণিবাবু জজের স্ত্রী বলিতেছেন, (ইনি এবারই মার কাছে আসিয়াছেন) “আমি মাকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু মায়ের ছবি পূজা করিতাম। একদিন দেখি মা হাসিতেছেন। আমি বলিলাম, (ছবির নিকট) মা, আমি বুঝি না—আর ছবি ভাল লাগেনা—এখন যদি শরীর নিয়া দেখা না দেও—তবে ছবি সব ছিঁড়িয়া ফেলিব।” তার কয়েকদিন পরই একজন আসিয়া খবর দিল—মা রাজমোহন

বাবুর বাসায় আসিয়াছেন—চলুন দেখিতে যাইবেন। মা সেবার একদিনের জন্ত ঢাকা গিয়া সিদ্ধেশ্বরীতে রাজমোহন বাবুর বাসায় অল্প সময়ের জন্ত গিয়াছিলেন। আরও অনেকেই কেহ স্বপ্নে, কেহ জাগ্রহ অবস্থায় জপ করিতে করিতে মার কি আদেশ সব পাইয়াছে—বলিতে লাগিল।

আমরা সকলের উপর মার এই সব কুপার কথা জানিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। ফণিবাবুর স্ত্রী ভীড় পছন্দ করেন না—তিনি রোজই বলিতেন, “মা, আমি তোমার এই হুজুকে ষোগ দিতে কিন্তু আসিব না—নির্জনে পূজাই আমার ভাল লাগে।” কিন্তু রোজই আবার আসিয়া উপস্থিত হইতেন। বলিতেন, “এই কি মা, আমি ত কখনও এমন ছিলাম না—আমাকে তুমি এমন নাচাইতেছ কেন? আমি যে ঘরে থাকিতে পারি না।” যাক্ সকলের কাছে বিদায় নিয়া মা কলিকাতা চলিলেন। মা কিন্তু বলেন, “আমিত তোমাদের ছাড়িয়া যাই না—আমি ত তোমাদেরই কাছেই আছি।” নারায়ণগঞ্জ দ্বিগেন্দ্রবাবুর বাসায় মা অল্প সময়ের জন্ত গিয়াছিলেন, সেখানে এর মধ্যেই সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। কি করিয়া খবর হইল জানি না। অনেকেই নারায়ণগঞ্জ হইতে মার আশ্রমে গিয়া উৎসবে ষোগ দিয়াছিলেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

আমরা আজ কলিকাতা পৌঁছিতেই ভক্তেরা মাকে
 কৈলাশ যাত্রার পথে নিবার জন্ত স্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে
 কলিকাতায় আগমন। দেখিলাম। মাকে নিয়া বিলার মন্দিরে
 যাওয়া হইল। বিলার নিজেও মার
 কাছে সর্বদা আসেন। আজ রাত্রিতে ৩টা অবধি নগেন-
 দাদা যজ্ঞাদি করিয়া ছাদে একান্তে মার পূজা করিলেন।
 পূজান্তে কেমন যেন হইয়া গেলেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

আজ ত্রিগুণাদাদার আহ্বানে শ্রীরামপুর বেলা ১২টার
 যাওয়া হইল। বৈকালে মা সকলকে নিয়া গঙ্গার পার
 বসিলেন। সন্ধ্যার পর সকলকে নিয়া মা কলিকাতা
 ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত মার কাছে ভীড় চলিল।
 তারপর অনেকে বিদায় নিলেন। বহুলোক মার চারিপাশে
 মন্দিরের বারান্দায়ই পড়িয়া রহিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

মা বিলার মন্দিরেই আছেন। কথায় কথায় মা
 বলিতেছেন, “অখণ্ড নাম না হইলে অখণ্ড দর্শন হয় না।”
 আজ অপর্ণা দেবীর বাড়ীতে মাকে কীৰ্ত্তনে নিয়া গেলেন।

মেয়েদের নিয়া অপর্ণা দেবী মার কাছে কীৰ্ত্তন করিলেন।

আসিবার সময় ভয়ানক বৃষ্টি। মাকে নিয়া বাসন্তী দেবী

ও অপর্ণা দেবী ভিজিয়া কীৰ্ত্তন
অগু নাম না হইলে

অগু দর্শন হয় না। করিতে চাহিলেন—মাও প্রস্তুত।

ভোলানাথ বাধা দেওয়ায় মা আর
নামিলেন না। আমরা মন্দিরে ফিরিলাম। রাত্রি প্রায়
১টায় মেয়েদের নিয়া মা ছাদে শয়ন করিলেন।

১১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ নৈনিতাল রওনা হইব। সকালেই সকলে
আসিয়াছেন, বাসন্তী দেবী, অপর্ণা দেবীও আসিয়াছেন।
মা বাসন্তী দেবী ও অপর্ণা দেবীকে খরতাল দিলেন।
তাহারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। অপর্ণা
দেবী বলিলেন, “আমি আজ হইতে কীৰ্ত্তনের সময় এই
করতাল নিজের হাতে রাখিব।” কীৰ্ত্তন চলিতেছে। রাত্রি
১০টার গাড়ীতে আমরা বেরিলী চলিলাম। তথা হইতে
নৈনিতাল, আলমোড়া হইয়া কৈলাশ যাওয়ার কথা।
গারবিয়ানের মেয়েরা গতবার মাকে কৈলাশ নিয়া যাইবার
জন্ম বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। ভোলানাথের খুবই
আগ্রহ। তাই কথা হইয়াছে কৈলাশ যাওয়া হইবে।
পাহাড়ী মেয়েরা বলিয়াছে, “মা আমাদের দেশে একবার
চল। তুমি না পারিলে আমরা তোমাকে পিঠে করিয়া

নিয়া যাইব। বরফ সরাইয়া রাস্তা করিব।” মা কৈলাশ যাইবেন। খুব উত্তোগ চলিতেছে। অনেকে সঙ্গে যাইবার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু রাস্তার ভয়ে সকলকে নিষেধ করা হইয়াছে। ভক্তদের জয়ধ্বনি ও চোখের জলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ কান্ধী, ফয়জাবাদ, লক্ষ্মী প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের দর্শন দিয়া রাত্রি ১১টার মা বেরিলী পৌঁছিলেন। ভক্তরা মাকে নিবার জন্ত সব স্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। মার গাড়ী আসিতেই, জয়ধ্বনি দিল। ফুলের মালায় মালায় মাকে ভরিয়া দিল—বারবার মার চরণ স্পর্শ করিল। সকলে মাকে নিয়া স্টেশনের নিকটের ধর্মশালায় চলিল। রাত্রি প্রায় ২টা অবধি সকলে আনন্দ করিয়া বাসায় ফিরিল।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজ দিল্লী হইতে নরেনবাবু সপরিবারে, দেবদাস হইতে হরিরাম, নরসিং, মনোমোহন সব আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কীৰ্ত্তন চলিতেছে। মা রাত্রিতে ছাদে ছিলেন। মা উঠিবার পূর্বেই মালা ও ফুল নিয়া সকলে হাজির। কখন মা উঠিবেন. সেই আশায় বসিয়া আছেন। সারা দুপুর মা সকলকে নিয়া কত আনন্দ করিলেন। কত ভাবে ফটো

তোলা হইল। আজ সন্ধ্যায় মাকে নিয়া মোটরে আমি মহারতন ও বেহারীবাবুর স্ত্রী কৈলাসের পথের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া লইলাম। অনেক রাত অবধি বাজারে কাটাইলাম।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজও সমস্তদিন মাকে নিয়া সকলে আনন্দ করিলেন। রাত্রি ১২টায় গাড়ীতে মা নৈনিতাল চলিলেন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

ভোরে মা কাঠগুদাম পৌঁছিলেন। পরে মোটরে ২ঘণ্টায় নৈনিতাল পৌঁছলাম। মা জননী পাহাড়ের ভক্তদের নিয়া কীর্তন ও কথাবার্তায় খুব আনন্দ করিতেছেন। বেরিলী হইতে পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদের স্ত্রী মায় সঙ্গে আসিয়াছেন। ইনকমট্যাক্স অফিসার অবতার কিষণ বেরিলীতে মাকে দেখিয়াছিলেন, মাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তাহারা সম্প্রতি নৈনিতাল আছেন। সকলেই মাকে পাইয়া মহা আনন্দ করিতেছেন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

বেলা ১২টায় মা আলমোড়া রওনা হইলেন। কিন্তু
• মোটরের গোলমালে রাত্রিতে রাণীক্ষেত পৌঁছিয়া অপেক্ষা

করা হইল। সঙ্গে অনেক স্ত্রী পুরুষ। সকলে মাকে নিয়ে
একটা বড় ঘরে শুইলেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

প্রাতে ৭টার আলমোড়া রওনা হইয়া বেলা ১০টায়
পৌঁছিয়া নন্দাদেবীর মন্দিরে মার অবস্থান। কৈলাস যাত্রার
বন্দোবস্ত করিতে সকলেই ব্যস্ত। পাহাড়ী মেয়েরা এখান
হইতে সঙ্গে যাইবে। দুর্গম রাস্তা, বাঙ্গালী ভক্তেরা মাকে
পাঠাইতে খুবই নারাজ। আনন্দে দিন কাটিয়া গেল।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

মা সকালে একটু হাঁটিয়া আসিলেন। কৈলাস যাত্রার
কথাই চলিতেছে। আগামী রবিবার কৈলাস যাত্রার দিন
স্থির হইয়াছে। আজ রবিঠাকুরের পুত্রবধু মার সঙ্গে দেখা
করিতে আসিয়াছেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজও যাত্রারই আয়োজন চলিতেছে। মা নিজে বসিয়া
আমাকে দিয়া সব ঠিক করাইলেন। এতদিন আমি এত
জিনিস ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না—আজ মা

সব ঠিক করাইলেন। আগামী রবিবার আমরা রওনা হইব স্থির হইয়াছে।

কৈলাস যাওয়ার পূর্বের যখন কলিকাতা হইয়া যাই, তখন ভ্রমর ও ননী আমাদের সঙ্গে কৈলাস যাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাদের যাওয়া হয় নাই। ভ্রমর বিশেষতঃ ননী (রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ননীর ভিতর বেশ একটা ত্যাগের ভাব আছে; মা কলিকাতা গেলে ননী দিনরাতই প্রায় মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে); খুব দুঃখিত হইল।

মা আলমোড়া আসিয়া কৈলাস রওনা হইবার পূর্বদিন রাত্রিতে আমাকে বলিতেছেন, “ননী ও ভ্রমরকে লিখিয়া দাও তাহারা স্মৃতিরূপে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।” আমি তাহাই লিখিয়া দিলাম। আমার সেই পত্র পাইবার পূর্বেরই নাকি ননী পূজার ঘরে বসিয়া দেখিয়াছে—মা বলিতেছেন, “তুমি কৈলাস যাইতে চাহিয়াছিলে, যাইতে পার নাই বলিয়া দুঃখ হইয়াছে। আমার ডাণ্ডির মধ্যে চূপ করিয়া বসিয়া চল আমার সঙ্গে কৈলাসে”—এই বলিয়া মার বুকের কাপড়ের মধ্যে তাহাকে জড়াইয়া লইলেন।

এরপরে ননৌ আরও একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বপ্নটির কথা সে বাহা বলিয়াছে, তাহা এই—“বায়স্কোপের মত স্পর্শ দেখিতেছি—প্রথম দেখিলাম, উজ্জ্বল একটা আলো—সেই আলোর ভিতর মা বসিয়া আছেন,—কোলে একটি ছোট শিশু; ধীরে ধীরে দেখিতেছি, সেই মূর্তিতে গণেশের মূর্তিতে পরিণত হইল। মা গণেশ-জননীরূপে গণেশকে কোলে নিয়া বসিয়া আছেন। আবার ধীরে ধীরে গণেশের মূর্তি পূর্বের মত শিশুর মূর্তি হইল; ধীরে ধীরে আলোর মধ্যে মার ও শিশুর মূর্তি মিলাইয়া গেল।”



চতুর্থভাগ সমাপ্ত :

আনন্দময়ী আশ্রম

- ১। কিশোরপুর, দেবাহন
- ২। রায়পুর „
- ৩। ডোঙ্গা „
- ৪। উত্তর কাশী, টেইরি, গাড়ওয়াল
- ৫। পাতালদেবী, আলমোড়া
- ৬। অষ্টভূজা পাহাড়, বিষ্ণাচল
- ৭। বি ২১৪ ভদৈনী, বেনারস
- ৮। ভীমপুরা, নন্দদাতীর, চান্দোদ, গুজরাট
- ৯। ৪৭ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
- ১০। স্বর্গদ্বার—সমুদ্রতীর, পুরী
- ১১। রমণা, ঢাকা
- ১২। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা
- ১৩। খেওড়া, ত্রিপুরা

—শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থাবলি—

সদ্বাণী, (বাংলা)—ভাইজী	১
ঐ (গুজরাট অনুবাদ)	১
ঐ (ইংরাজী অনুবাদ)	১
মাতৃদর্শন,	২
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, (১ম ভাগ)—গুরুপ্রিয়া দেবী	২
(৩য় ভাগ)	১০
(৪র্থ ভাগ)	৩
(২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম ভাগ)	(যন্ত্রস্থ)
ঐ হিন্দি অনুবাদ—ডাঃ পান্নালাল	২
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ,—শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত	
১ম ভাগ, ২য় ভাগ প্রত্যেকটি	১
মা আনন্দময়ীর আগমনে,—শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়	১৮
মা আনন্দময়ীর বাণী,—অভয়	১০
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লীলা-কথা, ১ম খণ্ড,—অভয়	১১০
মা আনন্দময়ীর কথা	১০
Ma Anandamayee—by Devotees	৩১০
মা—(মায়ের ৬খানি দুই বর্গ চিত্র সম্বলিত বাংলা এলবাম)	২
MA— ৬খানি দুই বর্গ চিত্র সম্বলিত ইংরাজী এলবাম)	২

প্রাপ্তিস্থান :—ব্রহ্মচারী কুশুমকুমার,
আনন্দময়ী আশ্রম, বি ২১০৪ ভট্টদানী, বেনারস ।

Sri "Rambhadracharya"
Gangotri, Uttarakhand